প্রতিচিন্তা

খতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

ষষ্ঠ বর্ষ ● তৃতীয় সংখ্যা ● ঢাকা ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ২০১৬

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
নজরুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
হাসান ফেরদৌস, জাতিসংঘে কর্মরত
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্ ও গোলাম মুস্তাফা

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.protichinta.com, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
July-September Issue, 2016; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

অর্থনীতি

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ১১
হায়দার আলী খান

রাজনৈতিক অর্থনীতি

নব্য উদারনীতিবাদের ত্রুটিগুলো কীভাবে সারাই করা সম্ভব ৩৯
জেসন হিকেল

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব

বাংলাদেশে গণতন্ত্র : এলিট বনাম জনগণ ৫১
বদরুল আলম খান

সমাজ

সেক্যুলারিজমের রূপ ও রূপান্তর ৮৭
আলী রীয়াজ

সাক্ষাৎকার

অজয় রায়ের সাক্ষাৎকার
যদি কোনো মতবাদে বিশ্বাস থেকে থাকে মার্ক্সবাদের ওপর বিশ্বাস অবশ্যই আছে ১০৭

সংস্কৃতি অধ্যয়ন

বিশ শতকের প্রথমার্ধে দক্ষিণ এশিয়ায় চলচ্চিত্রের দেশীয়করণ : আন্তর্দেশীয় থেকে স্বদেশীয় জনপরিসর ১৩৭
জাকির হোসেন রাজু

বই আলোচনা

আইএসের উত্থান ও বিশ্বরাজনীতি ১৫৯
আইরিন খান

লেখক পরিচিতি ১৭৯



জ্ঞানচর্চার সংকট কাটিয়ে ওঠার প্রত্যাশা নিয়ে প্রতিচিন্তার সূচনা হয়েছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি 'তৃতীয় পন্থা বা 'মধ্যপন্থার' খোঁজ করা। এটা স্বীকৃত যে নতুন এই পন্থার উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে প্রয়োজন ছিল সমষ্টির সাহস, মতবিনিময়, তর্ক-বিতর্ক ও ভিন্নপথ খোঁজা। কিন্তু সে কাজে সমষ্টিকে যে জ্ঞান পাটাতন ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন ছিল তার অনেক অভাব বাংলাদেশে বিদ্যমান। সে রকম একটা জ্ঞান পাটাতন গড়ার স্বপ্ন নিয়ে প্রতিচিন্তার পথচলা শুরু হয়েছিল। গত পাঁচ বছরে সে প্রত্যাশা পূরণের কত কাছাকাছি প্রতিচিন্তা যেতে পেরেছে তা পাঠকের বিচার্য।

ভিন্নপথ খোঁজার উদ্দেশ্যে ভাববিনিময়, তর্ক-বিতর্ক ও জ্ঞানচর্চার খাতিরে বিদ্যমান লেখকদের সক্রিয় করার পাশাপাশি অনেক নতুন লেখককে উদ্যমী করতে প্রতিচিন্তা সর্বদা সচেষ্ট ছিল। সে চেষ্টায় ভুল হয়তো ছিল, কিন্তু গাফিলতি ছিল না। প্রতিচিন্তাকে নিয়মিত প্রকাশ করা এবং নতুন লেখক তৈরির প্রচেষ্টা থেকে তা বোঝা যায়। এই আত্মমূল্যায়ন সামনে চলার পথকে সমৃদ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

জ্ঞান পাটাতন সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজন ছিল দেশে-বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি পাঠক ও লেখকের কাছে প্রতিচিন্তাকে নিয়ে যাওয়া। একটি সক্রিয় ওয়েবসাইট তৈরির মাধ্যমে সে প্রত্যাশা অনেকটাই পূরণ হয়েছে। নতুন-পুরোনো লেখকদের প্রতিচিন্তায় সক্রিয় করার লক্ষ্যে তাঁদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগই শুধু নয়, তাঁদের মূল্যবান মতামত যাচাই-বাছাইপূর্বক তা গ্রহণে চেষ্টা করেছে প্রতিচিন্তা।

আমরা কথা দিয়েছিলাম বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভিন্নপথ খোঁজার। সেখানে হয়তো দার্শনিক বিমূর্তায়নের বলয় ছিল না, কিন্তু ছিল আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতার মূর্তায়ন। দেশীয় ও বৈশ্বিক নতুন নতুন বাস্তবতাকে সামনে রেখে প্রতিচিন্তার এই অবিরাম এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত আছে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ আপেক্ষিক পতন পর্যায়ে থাকার ফলে ক্ষমতার এক শূন্যতা তৈরি হয়েছে, যা চীন, ভারত ও ব্রাজিলের মতো উদীয়মান শক্তিগুলো তাদের ক্রমবর্ধমান উত্থান সত্ত্বেও পূরণ করতে এখনো সক্ষম নয়। যার ফলে এই শূন্যতাকে ঘিরে তৈরি হওয়া নতুন নতুন হুমকি এবং তা মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার পরিবর্তে স্বার্থের প্রতিযোগিতাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তবে বর্তমান বিশ্বে ক্ষমতার কেন্দ্র পরিবর্তনের একটি ঝোঁক বিদ্যমান, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে বিজয়ী শক্তিগুলোর একরকম চাপিয়ে দেওয়া প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল। জাতিসংঘের কাঠামো বিচারে বলা যায়, এর মাধ্যমে সরকারগুলোর স্বার্থসংরক্ষণই শুধু সম্ভব, যা বৈশ্বিক জনস্বার্থের পরিপন্থী। যার ফলে পৃথিবী এবং মানুষের ওপর ক্রমবর্ধমান হুমকিগুলো রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও জনতা উভয়ই ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করছে। পৃথিবীব্যাপী মানবাধিকারের ক্রমাগত লঙ্ঘন এবং গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ হুমকি মোকাবিলার চেয়ে সরকারগুলোর শুধু ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টার প্রতিফলন।

প্রকৃত হুমকি মোকাবিলায় দেশে দেশে ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর উদাসীনতা নগ্নভাবে চোখে পড়ে। যার ফলে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম চ্যালেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি রাজনৈতিক সচেতনতা থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখা এবং একই সাথে তা বেসরকারি খাতের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়ার হুমকি মোকাবিলার মুনাফাসর্বস্ব এক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে বৈশ্বিক রাজনীতির বিশ্বায়িত জনপরিমণ্ডলে ধর্মের 'অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন' খুব আশ্চর্যজনক কিছু নয়। পশ্চিমে সেক্যুলারিজমের প্রতি ঝোঁক একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। এটা শুধু যে অপশ্চিমা দেশ, যেখানে সেক্যুলারিজমকে বিদেশি আরোপণ হিসেবে দেখা হয়, সেখানেই প্রযোজ্য তা নয়। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতেও অনেক নাগরিক মনে করেন যে সেক্যুলারিজম তাদের চূড়ান্ত মূল্যবোধের ক্ষয়সাধন করে চলেছে, যার ফলে তারা আরও উগ্রবাদী বিশ্বাসে প্রবোধ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর এই সুযোগে দেশে দেশে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ধর্মোন্মত্ততাকে তাদের বক্তৃতা এবং অনেক সময় কাজেও অপব্যবহার করছে। যার ফলে আজকের বিশ্ব সেক্যুলার-ধার্মিক পরিচয়ে বিভাজিত হওয়ার হুমকিতে পড়েছে। এটা স্বীকার করতেই হবে যে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' এই অবস্থাকে আরও শোচনীয় করেছে।

বৈশ্বিক এসব পরিবর্তন ও ঘটনা থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন নয়। এর প্রায় সবগুলো বিষয়ই বাংলাদেশকে শুধু প্রভাবিতই করছে না, বরং এখানেও বিদ্যমান। সার্বিক এই চিত্রটিকে সামনে রেখে সঠিক নীতি অবস্থান গ্রহণ সময়ের দাবি। এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞানচর্চার এক সংস্কৃতি গড়ে তোলা, যেখানে যুক্তি দিয়ে জাতীয় স্বার্থ ও বৈশ্বিক মানবতাবোধকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট এক নতুন জনপরিমণ্ডল সৃষ্টি হবে। প্রতিচিন্তা সে লক্ষ্যে কাজ করতে বদ্ধপরিকর। আগামী দিনে প্রতিচিন্তার লক্ষ্য পরিবর্তিত জাতীয় ও বৈশ্বিক বাস্তবতার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম এক জনপরিমণ্ডল তৈরি করা। জ্ঞানচর্চা ও চর্চিত জ্ঞান সঠিকভাবে প্রয়োগই আমাদের মুক্তির পথ। প্রতিচিন্তা আগামীর বাংলাদেশের জন্য জ্ঞানচর্চার এক পাটাতন হিসেবে কাজ করতে সচেষ্ট।

২.

বিশ্বায়ন এখন শুধু একটি ধারণা নয়, বরং এটি আমাদের নিত্যদিনের বাস্তবতার অংশ। একই সময়ে নানা বিতর্ক ও বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়া। সমালোচকদের মতে, মানুষের সক্ষমতা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধির পরিবর্তে বিশ্বায়ন মানুষকে নতুন নতুন বাধার মুখোমুখি

করছে। এসব বাধা এবং সেখান থেকে উত্তরণের পথগুলোর তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন হায়দার আলী খান। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার'। লেখকের মতে, বিশ্বায়নের বর্তমান চিড় ধরা প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত একটি চিড় ধরা আঞ্চলিকতাবাদ বা জাতীয় সংরক্ষণবাদ এবং দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হতে পারে। এই অবস্থায় বাণিজ্য, আর্থিক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পরিবেশগত, নারী এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার শাসনব্যবস্থা তৈরির বিষয়টি বৈশ্বিক, জাতীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচ্যসূচিতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অন্যদিকে, বিশ্বায়নের এই যুগে অর্থনৈতিক জোরই আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যেকোনো রাষ্ট্রের অবস্থান নির্ধারণ করে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির মূল আদর্শ হিসেবে গোটা দুনিয়ায় এখন নব্য উদারনীতিবাদের রমরমা অবস্থা। তবে নব্য উদারনীতিবাদের লাগামহীন ব্যবহারের ফলে বিশ্বজুড়ে নেমে এসেছে নানা অর্থনৈতিক বিপর্যয়। নব্য উদারনীতিবাদের এসব ত্রুটি এবং তা থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাব্য পথগুলো জেসন হিকেল আলোচনা করেছেন 'নব্য উদারনীতিবাদের ত্রুটিগুলো কীভাবে সারাই করা সম্ভব' শীর্ষক প্রবন্ধে। নব্য উদারনীতিবাদ-সংক্রান্ত চলমান আলোচনা ও বিতর্কে এটি রসদ জোগাবে বলে আমাদের ধারণা।

সর্বজনীন শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। তবে রাষ্ট্রপরিচালনার পদ্ধতি হিসেবে গণতন্ত্র সব দেশে একই মাত্রায় সফল হয়নি। উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পেলেও, অধিকাংশ উন্নয়নশীল ও দরিদ্র রাষ্ট্রে গণতন্ত্র এখনো কাগজে-কলমেই টিকে আছে। এসব রাষ্ট্রে গণতন্ত্র কেন টেকসই হচ্ছে না, তার বিশ্লেষণ করেছেন বদরুল আলম খান। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিচিন্তার এই সংখ্যায় ছাপা হলো 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র : এলিট বনাম জনগণ' শিরোনামের প্রবন্ধটি। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে রাষ্ট্রের এলিট শ্রেণি ও সাধারণ জনগণের মধ্যকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন লেখক। লেখকের মতে, এলিট শ্রেণি স্বেচ্ছায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে না, জনগণকেই গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করে নিতে হয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি বা দলীয় নেতৃত্বের প্রচেষ্টা ও সফলতা আশাব্যঞ্জক নয়। ফলে এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের বড় মাপের সংস্কার প্রয়োজন।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে প্রথম রচিত সংবিধানে সেক্যুলারিজমকে রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম মূল ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। একই সময় ধর্মভিত্তিক সব ধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে সেক্যুলারিজমের নীতি বাদ দেন এবং হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ 'ইসলাম'কে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ২০১১ সালে সেক্যুলারিজমকে পুনরায় রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে ফিরিয়ে আনা হয়। এই পুরোটা সময় ধরেই সেক্যুলারিজম বাংলাদেশে একটি অন্যতম আলোচিত বিষয়। অন্যদিকে, ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামিক বিপ্লব, ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন এবং বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় ও ডানপন্থী দলগুলোর উত্থানের ফলে সেক্যুলারিজম নতুন মাত্রায় আলোচনার মঞ্চে হাজির হয়। এই বিষয়টি সামনে রেখে প্রতিচিন্তার এই সংখ্যায় 'সেক্যুলারিজমের রূপ ও রূপান্তর' শিরোনামের প্রবন্ধটি ছাপা হলো। প্রবন্ধটি লিখেছেন আলী রীয়াজ। এই প্রবন্ধে লেখক সেক্যুলারিজম ধারণাটির বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গির একটি তুলনামূলক আলোচনা হাজির করেছেন, যা আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সেক্যুলারিজম ধারণাটিকে তুলনামূলকভাবে বুঝতে এবং এর বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা অনুধাবনে সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

অজয় রায়, বাংলাদেশে বাম ধারার রাজনীতির একজন সক্রিয় নেতা। আজীবন আপসহীন একজন রাজনৈতিক কর্মী। আপাদমস্তক রাজনীতিক এই মানুষটি নানা রাজনৈতিক মামলায় কারাগারে কাটিয়েছেন প্রায় ১৫ বছর। তারপরও রাজনীতির মাঠ থেকে পিছিয়ে আসেননি। বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের স্বপ্নে বিভোর থাকা এই রাজনীতিবিদ এখনো মার্ক্সবাদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন মতিউর রহমান। এই আলাপচারিতায় উঠে এসেছে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, ষাটের দশকের আন্দোলন-সংগ্রাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামসহ পরবর্তী পরিস্থিতি। মার্ক্সবাদের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা ও ভবিষ্যৎ নিয়েও কথা বলেছেন অজয় রায়।

চলচ্চিত্র সংস্কৃতির এক শক্তিশালী মাধ্যম। চলচ্চিত্র পশ্চিমা আবিষ্কার হলেও, খুব দ্রুতই চলচ্চিত্র দক্ষিণ এশীয় জনপরিসরে জায়গা করে নেয়। ভিনদেশি সংস্কৃতির একটি মাধ্যম কীভাবে দেশীয় অন্যান্য বিনোদন মাধ্যমের সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং গণমানুষের রুচি এবং রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষায় পরিবর্তন সাধন করেছিল তা অনুধাবন জরুরি। তাই এই সংখ্যায় 'বিশ শতকের প্রথমার্ধে দক্ষিণ এশিয়ায় চলচ্চিত্রের দেশীয়করণ : আন্তদেশীয় থেকে স্বদেশীয় জনপরিসর' শিরোনামে সংস্কৃতি অধ্যয়নের এই প্রবন্ধটি ছাপা হলো, লিখেছেন জাকির হোসেন রাজু। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে, উৎপাদন থেকে গ্রহণ পর্যায়ে, চলচ্চিত্র কীভাবে এ দেশের হয়ে উঠেছে, তা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

৯/১১ হামলার পর থেকেই জঙ্গিবাদ বিশ্বব্যাপী বহুল আলোচিত বিষয়। একটা সময় পর্যন্ত আল-কায়েদাকে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী হুমকি হিসেবে দেখা হলেও, ২০১৪ সালের প্রথম থেকে ইসলামিক স্টেট বা আইএস সন্ত্রাসবাদ-সম্পর্কিত আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করে। অন্যদিকে, ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলো আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। আইএসের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকেই সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশকে আইএসের সম্ভাব্য টার্গেট হিসেবে বিবেচনা করা শুরু করেন। বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ হয় গত ১ জুলাই রাতে গুলশানের হলি আর্টিজান হামলার পর। এরপরই হামলা হয় ৭ জুলাই ঈদের দিন কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠে। এই পরিস্থিতিতে আইএসের উত্থান, আদর্শ, কৌশল এখন জাতীয় আলোচনার বিষয়। এই বিষয়টি মাথায় রেখে প্রতিচিন্তার এই সংখ্যায় বই আলোচনা অংশে ছাপা হলো প্যাট্রিক ককবার্নের বহুল আলোচিত বই *দ্য রাইজ অব ইসলামিক স্টেট : আইসিস অ্যান্ড দ্য নিউ সুন্নি রেভল্যুশন*-এর আলোচনা। এর মাধ্যমে পাঠক আইএস সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে পারবেন। বই আলোচনাটি করেন আইরিন খান।



একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার

হায়দার আলী খান

সারসংক্ষেপ

এশীয় অর্থনৈতিক সংকট এবং সাম্প্রতিক কালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার পর, করপোরেট-চালিত প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্বায়ন ন্যায়সংগতভাবেই বিস্তর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এই প্রবন্ধে সমালোচনাসমূহের মতাদর্শগত নির্মাণকে পাশ কাটিয়ে, স্বতন্ত্রভাবে সমালোচনাসমূহকে বিশ্লেষণাত্মকভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর অমর্ত্য সেনের সক্ষমতা পরিপ্রেক্ষিত এবং খান, নুসবম এবং অন্যদের সম্প্রসারিত ব্যাখ্যার আলোকে বিশ্বায়নের একটি নৈতিক-নিয়মাত্মক (নরম্যাটিভ) ব্যাখ্যার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতাকেন্দ্রিক এই নৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ন্যায়-নীতি এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর জোরারোপ করে, যা বৈশ্বিকভাবে এবং স্থানীয়ভাবে স্বাধীনতাকে বর্ধিত করে। এটা দেখানো হয়েছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক দক্ষতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বচ্ছ মূলনীতিভিত্তিক একটি বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার কাঠামোই কাম্য। তবে বিশ্বায়নের বর্তমান চিড় ধরা প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত একটি চিড় ধরা আঞ্চলিকতাবাদ বা এমনকি জাতীয় সংরক্ষণবাদ এবং দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হতে পারে। তাই এখানে প্রদত্ত কার্যকাঠামোর ভিত্তিতে বহুপক্ষীয় সহযোগিতা একটি আশু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এমতাবস্থায় বাণিজ্য, আর্থিক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পরিবেশগত, নারী এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার শাসনব্যবস্থা তৈরির বিষয়টি বৈশ্বিক, জাতীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক আলোচ্যসূচিতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নিচ থেকে গড়ে তোলা আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন এই সমাজব্যবস্থার দিকে আমাদের অগ্রসর করবে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

বিশ্বায়ন, বৈশ্বিক ন্যায়বিচার, সক্ষমতা, আর্থিক সংকট, বৈশ্বিক আর্থিক কাঠামো, বৈশ্বিক সমাজ।

ভূমিকা

বর্তমানে এশীয় অর্থনৈতিক সংকট এবং সাম্প্রতিক কালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার পর, করপোরেট-চালিত প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্বায়ন ন্যায়সংগতভাবেই বিস্তর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এই প্রবন্ধে সমালোচনাসমূহের মতাদর্শগত নির্মাণকে পাশ কাটিয়ে, স্বতন্ত্রভাবে সমালোচনাসমূহকে বিশ্লেষণাত্মকভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে গৃহীত স্বাধীনতাকেন্দ্রিক পরিপ্রেক্ষিত ন্যায়-নীতি এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর জোরারোপ করে, যা বৈশ্বিকভাবে এবং স্থানীয়ভাবে স্বাধীনতাকে বর্ধিত করে। এটা দেখানো হয়েছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক দক্ষতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বচ্ছ মূলনীতিভিত্তিক একটি বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার কাঠামোই কাম্য। তবে বিশ্বায়নের বর্তমান চিড় ধরা প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত একটি চিড় ধরা আঞ্চলিকতাবাদ বা এমনকি জাতীয় সংরক্ষণবাদ এবং দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হতে পারে।

তাই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি ধাঁধা ব্যাখ্যা করা এবং সমাধানের এমন কৌশল বাতলে দেওয়া, যা স্বাধীনতা-বর্ধক। ধাঁধাটি হচ্ছে বিশ্বায়নের বাগাড়ম্বর, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (আইএফআই) কাঠামোগত সংস্কার নীতিমালা এবং নিয়মভিত্তিক বৈশ্বিক ব্যবস্থার অনুসরণ সত্ত্বেও কেন আঞ্চলিকতাবাদ এবং এমনকি জাতীয়তাবাদী সংরক্ষণবাদের দিকে একটি ঝোঁক লক্ষ করা যাচ্ছে? এর পেছনে এই প্রবন্ধে প্রধান যে যুক্তিটি দেওয়া হয়েছে তা হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতৃত্বে চলমান বিশ্বায়ন প্রকল্পের ভিত্তিমূলে একটি অসংগতি রয়েছে, যা বাস্তব পৃথিবীতে অসমতার প্রভাবগুলো অনুধাবনে প্রতীয়মান প্রত্যাখ্যান থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। অধিকন্তু, এটা তাদের বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের কিছু মূল্যবান মূলনীতিকে অগ্রাহ্য করার পথ করে দিয়েছে। ন্যায্যতার বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করার মাধ্যমে বিশ্বায়নের বর্তমান নেতারা অর্থনৈতিক দক্ষতাকে ক্ষতির সম্মুখীন করার ঝুঁকি নিচ্ছেন। তাই আমার লক্ষ্য হচ্ছে 'বিশ্বায়ন এবং এর অসন্তুষ্টিগুলো'কে বোঝার চেষ্টা করা (স্টিগলিৎস ২০০২, ২০০৬; খান ১৯৯৪, ১৯৯৫ক, ১৯৯৫খ, ১৯৯৬, ১৯৯৭ক, ১৯৯৭খ, ১৯৯৭গ, ১৯৯৮, ১৯৯৯ক, ১৯৯৯খ, ২০০৪ক, ২০০৪খ, ২০০৫, ২০০৭; খান এবং লিউ ২০০৮, খান ২০১৩ক, ২০১৩খ, ২০১৪) এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার কিছু দিকনির্দেশক মূলনীতি প্রস্তাব করা।

বারবার ব্যবহারের ফলে বিশ্বায়ন শব্দটি ইতিমধ্যে একাডেমিক ক্লিশেয় পরিণত হয়েছে। অনেকের মতে, উৎপাদনের বিশ্বায়ন এবং নতুন আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের উৎপত্তি, এই দুটি প্রবণতা বৈশ্বিক অর্থনীতির কাঠামোগত গভীর রূপান্তরকে চিহ্নিত করে। কিছু ক্ষেত্রে এই দাবিটি নির্ঘাত সত্য। কিন্তু সম্প্রতি কয়েকজন পর্যবেক্ষক (হ্যারিস ১৯৯৮, খান ১৯৯৮) উল্লেখ করেছেন যে সাধারণ ব্যবহারে বিশ্বায়ন শব্দটি ব্যাপক অর্থে বর্ণনাত্মক শ্রেণির, বিশ্লেষণাত্মক শ্রেণির নয়। অধিকন্তু, বর্ণনাত্মক শব্দ হিসেবে এটার যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্বায়নসংক্রান্ত সুবিশাল এবং ক্রমবর্ধমান রচনাবলিতে প্রায়ই এটি অনুপস্থিত থাকে। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে এটা প্রতীয়মান হয় যে বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক একীভূতকরণের একটি পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়া; যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, মহামন্দা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছিল। ব্রেটন উডস কাঠামোর উৎপত্তিকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বকে একীভূতকরণ এবং একই সঙ্গে ব্যক্তিগত মূলধনের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণের একটি পন্থা হিসেবে দেখা যেতে পারে। ব্রেটন উডস কাঠামোর পতন ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট উদারীকরণের পথে গতি সঞ্চার করে, যা সাধারণত বিশ্বায়নের সবচেয়ে দৃশ্যমান দিক। তবে, এমনকি এই প্রক্রিয়াও অস্থিতিশীলতায় পরিপূর্ণ। এটি মেক্সিকোর এবং আরও সাম্প্রতিক এবং এমনকি আরও নাটকীয় এশীয় অর্থনৈতিক সংকট এবং অতি সাম্প্রতিক একুশ শতকের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। এমনকি আদর্শ নব্যধ্রুপদি হেকসার-ওলিন-স্যামুয়েলসন মডেলের মধ্যেও একই সময়ে বাণিজ্যের একীভূতকরণের ফলে উত্তরের অদক্ষ শ্রমিকদের বেতন হ্রাস পেতে পারে; ফলে সেখানে বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে (ক্রুগম্যান ১৯৯৬, উড ১৯৯৪)। বাণিজ্যের মাধ্যমে দক্ষিণে আরও অধিক সমতা বিধান হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে এমনটা ঘটার খুব কম প্রমাণই দেখা যাচ্ছে। সুতরাং, বিশ্বায়নের বাগাড়ম্বরকে সতর্কতার সঙ্গেই মোকাবিলা করা প্রয়োজন। বড় জোর, আমরা একটি 'চিড় ধরা' বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি (হ্যারিস, ১৯৯৮)।

যদিও কয়েক দশক ধরে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে কাঠামোগত পরিবর্তনগুলো ঘটেছে, তা আন্তসীমান্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করেছে এবং বলতে গেলে একটি বৈশ্বিক অর্থনীতি তৈরি করেছে। বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারগুলোর বিধিব্যবস্থার হ্রাসকরণের সহায়তায় ঘটা বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের আন্তর্জাতিকীকরণ অর্থনৈতিক একীভূতকরণ এবং আঞ্চলিক জোট গঠনকে ত্বরান্বিত করেছে (কুক এবং ক্যার্কপ্যাট্রিক, ১৯৯৭)। এক নতুন ধরনের শ্রম বিভাজন এবং গুণগতভাবে একটি ভিন্ন ধরনের সম্পদ ব্যবহার, উৎপাদন এবং মূলধন সঞ্চয়ের উৎপত্তি ঘটেছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হচ্ছে বৈশ্বিক আন্তনির্ভরশীলতা এবং একটি অসম বৈশ্বিক অর্থনৈতিক গ্রামের সৃষ্টি।

বৈশ্বিক অর্থনীতির এই অসম একীভূতকরণ নতুন কোনো বিষয় নয়। এই কাঠামোগত পরিবর্তনসমূহ বৈশ্বিক বাজার সংগঠনের মধ্যে একটি গুণগত রদবদল নিয়ে এসেছে। যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক পুঁজি এবং মানসিক শ্রমভিত্তিক ব্রেইন-পাওয়ার শিল্পের আধিপত্য (থরো, ১৯৯৬)। যেমনটা কুক এবং ক্যার্কপ্যাট্রিক (১৯৯৭) উল্লেখ করেছেন :

> অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আন্তর্জাতিকায়ন নতুন কোনো ধারণা নয়...তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আগেকার বিস্তারের চেয়ে আন্তর্জাতিক একীভূতকরণের সাম্প্রতিক মাত্রা গুণগতভাবে ভিন্ন। কারণ এর বৈশিষ্ট্য হলো অর্থনৈতিক যোগসূত্রসমূহকে বর্ধিত করা, যা মাঠপর্যায়ে প্রায়ই জাতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে (পৃষ্ঠা, ৫৫)।

অর্থনৈতিক একীভূতকরণের বিগত বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ কমিয়ে আনা বৈশ্বিক অর্থনীতিকে একীভূতকরণে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে বর্তমানের বৈশ্বিক বাণিজ্যে বহুজাতিক করপোরেশনগুলো, ক্রমবর্ধমান অর্থ ও পুঁজিবাজার এবং তথ্য ও কম্পিউটার প্রযুক্তি প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

১৯৮০-এর দশকের প্রথম থেকে বহুজাতিক করপোরেশনগুলো শুধু সংখ্যাগত দিক থেকেই বৃদ্ধি পায়নি, বরং বৈদেশিক বিনিয়োগে তাদের অংশও বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে বহুজাতিক করপোরেশনের সংখ্যা ছিল ৩৭,০০০ এবং এই করপোরেশনগুলো ১৭০,০০০ অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করত। করপোরেশনগুলোর সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলার (কুক এবং ক্যার্কপ্যাট্রিক, ১৯৯৭)। বর্তমানে কোনো কোনো বহুজাতিক করপোরেশনের মোট লেনদেনের পরিমাণ কিছু কিছু উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিএনপি) চেয়েও বেশি।

বৈশ্বিক অর্থনীতি সম্পর্কে প্রভাব বিস্তারকারী পুঁজিবাজার এবং পুঁজি লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কারণে বিশ্বায়ন ক্রমশ প্রবলতর হচ্ছে। পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় নীতির উদারীকরণের ফলে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পুঁজিপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি একীভূত হয়েছে।

পৃথিবীর প্রতিটি অংশে বিশ্বায়ন এবং আঞ্চলিকায়নের প্রভাব অনুভূত হওয়ার পর থেকেই সমাজবিজ্ঞানীরা এই দুটি ধারণা, সেগুলোর আন্তসম্পর্ক এবং প্রক্রিয়াগুলো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের প্রবৃদ্ধি ও কল্যাণসাধনে কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা শুরু করেছেন। এটি নানা

বিতর্কেরও জন্ম দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিরোধের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞ, যেমন হার্স্ট (১৯৯৫) বিশ্বায়িত অর্থনীতির মতো কোনো বিষয় আছে কি না সে বিষয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। অন্যদিকে থরো (১৯৯৬), ওহমা (১৯৯৬) বিশ্বাস করেন যে অর্থনৈতিক একীভূতকরণের গুণগতভাবে নতুন একটি রূপ বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিকায়নের আবির্ভাবের পরিবেশ তৈরি করেছে। অধিকন্তু, বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিকায়ন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের কল্যাণকামিতা বৃদ্ধি করছে, না খর্ব করে আঞ্চলিক ও আর্থসামাজিক বৈষম্য চিরস্থায়ী করছে, সমাজবিজ্ঞানীরা এই বিতর্কে লিপ্ত আছেন।

এই প্রবন্ধে আমি বিশ্বায়ন এবং আঞ্চলিকায়নের অন্তঃসার, তাদের সম্পর্ক এবং বিশেষত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের ওপর তাদের যে প্রভাব পড়তে পারে তা বিশ্লেষণ করব। মূলধনের বৈশ্বিক প্রবাহ এবং স্থানীয় প্রয়োজন ও সংবেদনশীলতার মধ্যকার অসংগতিসমূহও এখানে আলোচনা করা হবে। সবশেষে আমরা দেখব যে এই অসংগতি বিশ্বায়নকে কাঠামোগত এবং নিয়মাত্মক উভয় দিক থেকে বোঝার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে; বিশেষত যখন তা উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে।

চিড় ধরা বিশ্বায়ন : একটি নিয়মাত্মক বিশ্লেষণ কাঠামো

যেমনটা শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বায়ন ছিল ১৯৯০-এর দশকের একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্বায়ন রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে গিয়ে বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং জীবনাচরণেও নিজের ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে (গ্রিফিন এবং খান, ১৯৯২)। প্রকৃত অর্থে, বিশ্বায়ন একটি 'বহুমাত্রিক ধারণা যা সামাজিক কর্মের নানা রূপে, যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনগত, সংস্কৃতি, সামরিক ও প্রযুক্তিগতভাবে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন পরিবেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়' (প্যারেটন এবং অন্যান্য, ১৯৯৭ : ২৫৮)।

বিশ্বায়নের সংজ্ঞার বিষয়ে বা আমাদের জীবন ও আচরণে এর প্রভাব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা একমত নন। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বিশ্বায়নকে একটি রাজনৈতিক ধারণা হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন (গিলস, ১৯৯৭)। অন্যদিকে অন্যরা এই বিষয়টিকে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের কাঠামোর আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন (ম্যাকগ্রু, ১৯৯২)। কেউ কেউ বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাবগুলোর ওপর জোরারোপ করেছেন। অন্যদিকে অন্যরা আয়, সামাজিক বৈষম্য, নারী এবং দরিদ্রদের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাবগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন (সেন, ১৯৯৭; গিলস, ১৯৯৭)। অন্য একদল বিশেষজ্ঞ,

জাতিরাষ্ট্রসমূহের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব তুলে ধরেছেন এবং যুক্তি দেখিয়েছেন যে 'আজকের সীমান্তহীন বিশ্বের বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করার মতো গুরুত্ববহ কর্মক (actor) হিসেবে জাতিরাষ্ট্রসমূহ ইতিমধ্যে তাদের ভূমিকা হারিয়েছে' (ওহমা, ১৯৯৬: ১১)। একই সঙ্গে অন্যরা একটি উত্তরাধুনিক পৃথিবীতে একীভূতকরণ এবং খণ্ডায়নের পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলোর ওপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন (খান, ১৯৯৮, অধ্যায় ৬ ও ৭, ২০০২ক, ২০০২খ, ২০০৩, ২০০৪ক, ২০০৪খ, ২০০৭)।

যেহেতু অসংখ্য জাতি, ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের ওপর বিশ্বায়নের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে, ফলে বিশ্বায়নকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা এবং এর প্রভাবগুলোকে খতিয়ে দেখা অপরিহার্য। এর অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে প্রপঞ্চটিকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা। এই প্রবন্ধে বিশ্বায়নকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে একটি আন্তসংযুক্ত অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক এবং যোগাযোগমূলক প্রক্রিয়া হিসেবে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছে। সহজভাবে বলতে গেলে বিশ্বায়ন দ্বারা বৈশ্বিক অর্থনীতির এমন একীভূতকরণকে বোঝায়, যার ফলে পৃথিবীর এক স্থানে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা, অন্য স্থানের ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক পরিবেশ ও জীবনাচরণের ওপর সুস্পষ্ট, টেকসই এবং লক্ষণীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যেমনটা ম্যাকগ্রু উল্লেখ করেছেন, বিশ্বায়ন হচ্ছে 'রাষ্ট্র এবং সমাজসমূহের মধ্যকার যোগসূত্র এবং আন্তসম্পর্কগুলোর একটি প্রাচুর্য নির্মাণ, যা আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা তৈরি করেছে। একই সঙ্গে এটি একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা পৃথিবীর এক অংশে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা, সিদ্ধান্ত এবং কর্মকাণ্ড; যা তার থেকে অনেক দূরের অন্য কোনো স্থানের ব্যক্তিবর্গ এবং সম্প্রদায়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে' (১৯৯২, পৃষ্ঠা ২৬২)। যা হোক, প্রপঞ্চটির সত্যিকার বিশ্লেষণাত্মক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে হলে, এটিকে অবশ্যই বিশ্বায়নের একটি তত্ত্বের অংশ হতে হবে। অধিকন্তু, গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রভাব বুঝতে হলে, তত্ত্বটিরও অবশ্যই একটি নিয়মাত্মক দৃষ্টিকোণ থাকতে হবে। উত্তরাধুনিক বিশ্বের বাস্তবতার ভিত্তিতে খান (১৯৯৮) এমনই একটি তত্ত্ব প্রস্তাব করেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, বৈশ্বিক অর্থনীতির কাঠামোগত শক্তিগুলো বাজার ও অঞ্চলগুলোকে একীভূতকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তবে অনেক বাজার জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এবং মানুষের জীবনের বাজারবহির্ভূত এমন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকও রয়েছে, যা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে, আমরা ম্যাকওয়ার্ল্ড এবং জিহাদের মতো পরস্পরবিরোধী ধারণাসমূহের মোকাবিলা করছি (বারবার, ১৯৯৫)। তাহলে বিশ্বায়নের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা যেতে পারে, এমন একটি নিখাদ বৈশ্বিক সমাজ গড়ে তুলতে হলে বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের

প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। খান (১৯৯৮) কমপক্ষে ৫টি ক্ষেত্র (অন্যগুলোর মধ্যে) উল্লেখ করছেন, যেখানে বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের আদর্শগুলো অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে:

১. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং মুদ্রা শাসনব্যবস্থা:** বর্তমান পরিশোধব্যবস্থা অপ্রতিসম। এই ব্যবস্থায় শুধু ঘাটতি রাষ্ট্রগুলোকেই মুদ্রামান সমন্বয়ের দায় নিতে বাধ্য করার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়। এটিকে একটি বৈশ্বিক দায় ভাগাভাগীকরণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। একইভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার ঐতিহাসিক অসমতাগুলোকে স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন। যেমন স্থির প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অনুসারে বিশেষায়িতকরণের ফলে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো বিকাশমান বৈশ্বিক শ্রম বিভাজনে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে যেতে পারে।

২. **আন্তর্জাতিক মূলধনপ্রবাহ:** উন্নত অর্থনীতির অনেক মানুষের মতে, এলডিসিগুলোতে মূলধনের প্রবাহ (মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বা বাইরে) তাদের মঙ্গলের পথে ন্যূনত পক্ষে স্বল্প মেয়াদে হলেও একটি বাধা তৈরি করতে পারে। একই সঙ্গে এলডিসিগুলোতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে শুধু নিম্ন-বেতন, প্রান্তিক কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে (উড, ১৯৯৪)। একটি ন্যায়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় অঞ্চলেই সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রভাবসমূহ বিবেচনা করতে হবে এবং তা অবশ্যই আত্মনির্ধারণের ভিত্তিতে হতে হবে। পারিশ্রমিক এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষিণে মূলধনের একটি নিয়ন্ত্রিত প্রবাহই সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত সমাধান হতে পারে।

৩. **আন্তর্জাতিক পরিবেশগত বিবেচনাসমূহ:** এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আন্তনির্ভরশীলতা ক্রমবর্ধমান হারে স্বীকৃতি পাচ্ছে। তবে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে সম্পর্ক বিবেচনায় ন্যায়বিচারের দাবিগুলো সুনির্দিষ্ট নয়। অন্য সব বিষয় সমান ধরলে পরিবেশগত আদর্শ মাপকাঠিগুলোর কঠোর বাস্তবায়নই ন্যায়সংগত বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে এরূপ আদর্শগুলো দক্ষিণের কিছু মানুষের জীবন-জীবিকা ধ্বংস করে দিতে পারে। বৈশ্বিক পরিবেশগত আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক কর এবং স্থানান্তর পরিকল্পনা পূর্বশর্ত হিসেবে ধরা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের পূর্বশর্ত হচ্ছে ধনী রাষ্ট্রগুলো থেকে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিব্যবস্থার হস্তান্তর।

৪. **সম্পদের পুনর্বণ্টন এবং মানব উন্নয়ন:** চলমান আলোচনা অধিকাংশ মানুষকে প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রদানের কথা বলে, যাতে করে তারা তাদের

সামাজিক সক্ষমতাগুলোর উন্নয়ন করতে পারে। অধিকাংশ গবেষণায় (যেমন অ্যাডেলম্যান এবং রবিনসন, ১৯৭৮; খান, ১৯৮৫; জেমস এবং খান, ১৯৯৩) দেখা গিয়েছে যে, দরিদ্রদের সম্পদের পুনর্বণ্টন না করায়, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে বাজার সক্ষমতা অর্জন করে সে জন্য সম্পদের পুনর্বণ্টন এবং মানব মূলধনের উন্নয়ন আমাদের নিয়মাত্মক কাঠামোতে একটি জরুরি প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ জন্য পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে প্রান্তিক নীতিগত হস্তক্ষেপের পরিবর্তে সত্যিকার অর্থে মানব উন্নয়নমুখী কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন হবে।

৫. **জেন্ডার-সম্পর্কিত ন্যায়বিচার :** নারীদের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করতে হবে। জেন্ডারবৈষম্য-সম্পর্কিত চমৎকার নথিভুক্ত তথ্যগুলো থেকে দেখা যায় যে নারীদের সক্ষমতাসমূহ নেতিবাচকভাবেই প্রভাবিত হচ্ছে। ফলে দ্ব্যর্থহীনভাবে এই দাবি উঠেছে যে নারীদের সক্ষমতাসমূহ বৃদ্ধি (বা কমপক্ষে হ্রাস না করতে) করতে নীতিনির্ধারকদের সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। নারীদের অপুষ্টি থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণের মতো সামাজিক সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করতে বিশ্বায়ন কি সাহায্য করবে? দুর্ভাগ্যবশত উত্তরটি পরিষ্কার নয়। এখন পর্যন্ত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অনেক নারীই বৈশ্বিক বাজারব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ধারণ করেন না, ফলে বিশ্বায়ন ইতিমধ্যেই তাদের ক্ষতি করছে (বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য, খান ২০১৪)।

এই পাঁচটি উদাহরণ শুধু দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করা হলো। একটি ন্যায়ভিত্তিক বৈশ্বিক অর্থনীতি গড়ে তোলার পথে এগুলো কোনোভাবেই সব বিষয়কে ধারণ করে না। (উদাহরণস্বরূপ বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলা গ্রাম/নগরের বৈষম্য এবং ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে এর প্রভাবের বিষয়টি আমরা যুক্ত বা দৃষ্টিগোচর করতে পারি।) কিন্তু বিষয়গুলো অবশ্যই বিশ্বায়নের যুগে ন্যায়বিচারের সমস্যা এবং সম্ভাবনাগুলোকে তুলে ধরে। যে অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক সমস্যাটি আমরা এখন পর্যন্ত আলোচনা করিনি, তা হলো জাতীয় সার্বভৌমত্বের ক্ষয়। এটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার দাবির একটি অনিবার্য ফল। ন্যায়বিচারের নীতিসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি বৈশ্বিক উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার সঙ্গে সহমত হওয়ার অর্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিক চুক্তি, নিয়মাবলি এবং চূড়ান্তভাবে সম্ভবত নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর কাছে উল্লেখযোগ্য কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়া। এটা মনে রাখা উচিত যে এমনকি ন্যায়বিচারের নিয়ন্ত্রণধর্মী নিয়মাবলি ছাড়াও, বিশ্বায়ন-প্রক্রিয়া জাতীয়

সার্বভৌমত্বকে, এমনকি উন্নত শিল্পায়িত রাষ্ট্রসমূহেরও (যেমন নাফটা) দুর্বল করে দিচ্ছে। সুতরাং, ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতির দাবিকে অবশ্যই যুক্তিসংগত নীতিমালার ভিত্তিতে এর (একই সঙ্গে অন্যান্য বিষয়, যেমন জীবনধারণের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির ক্ষয়) মুখোমুখি হতে হবে। মূল বার্তাটি হচ্ছে এই যে ব্যক্তির যুক্তিসংগত স্বশাসন হিসেবে স্বাধীনতার নীতিটি এসব নীতির মধ্যে প্রধান হতে হবে। এটি একটি (সম্ভবত একমাত্র) যুক্তিসংগত দৃষ্টিকোণ, যদি আমরা জিহাদের *স্কিল* এবং ম্যাকওয়ার্ল্ডের *ক্রিবডিসকে* আমাদের হিসেবে না ধরি।

ম্যাকওয়ার্ল্ড বিশ্বায়নকে অর্থনৈতিক, পুঁজিসংক্রান্ত এবং প্রযুক্তিগত চিড় ধরা কিন্তু বাস্তব একীভূতকরণ হিসেবে দেখেন। ১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকে ব্রেটন উডস চুক্তির পতনের পর পুঁজিবাজারের (সুদের হার এবং মুদ্রা বিনিময় হারসমেত) নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা হয়, ফলে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মূলধনের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। তখন পর্যন্ত বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থা ১৯৪৫ সালের ব্রেটন উডস চুক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতো, যা মুদ্রাগুলো একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হার প্রদান করত এবং মুদ্রাগুলোর মূল্য ডলার ও স্বর্ণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। নিক্সন প্রশাসন ১৯৭১ সালে এই ব্যবস্থা বাতিল করে এবং এর পরিবর্তে নিয়ত পরিবর্তনশীল মুদ্রা বিনিময় হার চালু হয়। এর মাধ্যমে বিশ্ববাজারের ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়।

এটি উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের নব্য উদার মুক্তবাজার মতবাদের পুনরুত্থানের মাধ্যমে জোরদার হয় এবং রাজনৈতিক রক্ষণশীলদের উত্থানের পর—যুক্তরাষ্ট্রে রিগান এবং যুক্তরাজ্যে থেচার—একমাত্র নীতিতে পরিণত হয়। ভূতপূর্ব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতন এবং একটি প্রভাবশালী ও অবিসংবাদিত চিন্তাপদ্ধতি হিসেবে নব্য-উদারতাবাদের আবির্ভাবের পর এটি আরও জোরদার হয় (ফক, ১৯৯৭)। এসব বিষয় মূলধনি যন্ত্রপাতিসহ পণ্য, সেবা এবং পুঁজির মুক্ত প্রবাহের একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে একটি একীভূত বৈশ্বিক অর্থনীতি তৈরি করছে। খান (২০০৩) এই ধরনের চিড় ধরা ও পরস্পরবিরোধী, কিন্তু তা সত্ত্বেও একীভূত বৈশ্বিক অর্থনীতিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে যদি আমরা বিশ্বায়নের প্রভাবগুলো আমলে নিয়ে প্রশ্ন করি, যেমনটা এর প্রবক্তারা দাবি করেছিলেন, প্রক্রিয়াটি তেমনটা কাজ করছে না কেন। উন্নত বিশ্বে এর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য স্টিগলিৎস (২০০৬) একটি ভালো উৎস।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য একটি সামাজিক সক্ষমতা নীতিতত্ত্ব

বিশ্বে নব্য-উদারতাবাদের সমস্যাগুলো বুঝতে স্টিগলিৎস এবং অন্যরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। যেমনটা এই প্রবন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা

এখানে এসব ইতিবাচক বিশ্লেষণকে বিশ্বায়ন এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের নিয়মাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একীভূত করার চেষ্টা করেছি। সেন এবং অন্যদের মতে, কার্ডিনাল বা অর্ডিনাল উপযোগবাদের কিছু ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি খুবই সংকীর্ণ। রউলীয় প্রাথমিক পণ্য দৃষ্টিভঙ্গি বেশ বিস্তৃত হলেও, বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ধারার এই পৃথিবীতে ইতিবাচক ও নিয়মাত্মক ধারণাগুলোর সর্বাঙ্গীন একীভূতকরণে এটার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে (সেন ১৯৯২, খান ১৯৯৮)। বিকল্প হিসেবে সক্ষমতা দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তাব করা যেতে পারে। নুসবম (১৯৯৫) সক্ষমতার তালিকাসমেত একটি 'অ্যারিস্টটলীয়' দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তাব করেছেন। তবে সেন কোনো একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা অনুমোদন করতে ততটা উৎসুক নন। খান (১৯৯৮, ২০০৩) সমর্থিত 'হেগেলীয়' সামাজিক সক্ষমতা দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি নির্দিষ্ট সমাপ্তহীন তালিকা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে একটি গতিশীল ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সরলীকরণের অযোগ্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে সক্ষমতার ওপর জোরারোপ করা হয়েছে।[১] এসব বৈশিষ্ট্য আমলে নিয়ে করা একটি ব্যাখ্যামূলক তালিকা সক্ষমতা নীতিশাস্ত্র-সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আলোচনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

বিশেষত অর্থসংস্থানের বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পরিকল্পিত একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে যুক্তিসিদ্ধ অর্থসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একসঙ্গে চলতে পারে। তবে প্রবৃদ্ধির ফলাফল অবশ্যই মানব মঙ্গলের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে। আদর্শ উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা করার জন্য একটি যথার্থ সামাজিক কল্যাণ ক্রিয়া (এসডব্লিউএফ বা Social Welfare Function) বাছাই করা যেতে পারে, যেখানে উপার্জনের মাত্রা এবং উপার্জনের বণ্টন উভয়ই আলোচিত হবে। একটি নির্দিষ্ট মাত্রার উপার্জনের ক্ষেত্রে সমতাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য কৌশলগতভাবে নির্দিষ্ট এসডব্লিউএফগুলোই গ্রহণীয়।[২]

অ্যাডাম স্মিথের পরিজ্ঞানগুলোর ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন তাত্ত্বিক কল্যাণের একটি অধিক বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রস্তাব করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে 'সক্ষমতা দৃষ্টিভঙ্গি'র প্রবর্তক হচ্ছেন অমর্ত্য সেন। উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির তাত্ত্বিক সমালোচনা করতে গিয়ে সেন, নুসবম এবং অন্যরা বলেছেন যে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সব গুণকেই উপযোগের বাক্সে বন্দী করা হয়েছে। এটিই এই দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা। নুসবম-এর একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদ এবং বিষাদ-জর্জরিত বাবা মি. গ্রেডগ্রাইন্ড এবং তার ছাত্র বিটজারের মধ্যে একটি ঘটনাকে উদ্ধৃত করে। উপযোগবাদী যৌক্তিকতার কঠোর নিয়ম অনুসরণের ক্ষেত্রে বিটজার তার গুরুকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, এ ক্ষেত্রে একজন

বাবার বিষাদ হৃদয়ঙ্গম করার কোনো স্থান ছিল না। আমিও আমার সাম্প্রতিক কিছু প্রবন্ধ এবং আমার বই *টেকনোলজি, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডিমোক্রেসি*তে[৩] একই ধারার সমালোচনার উল্লেখ করেছি। এই দৃষ্টিভঙ্গি সক্ষমতাকে স্পষ্টভাবে সামাজিক বিষয়ে পরিণত করে এবং প্রশ্ন করে : অর্থনৈতিক (বাস্তব এবং অর্থনৈতিক) এবং অন্যান্য (যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠানের কোন শ্রেণিপরম্পরা সক্ষমতাকে একই সঙ্গে গড়ে সুস্থিতভাবে বৃদ্ধি পেতে এবং বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্তির মধ্যে সেগুলোকে সমকক্ষ হতে দেবে? কার্যত আমরা জিজ্ঞেস করি : আমরা কীভাবে ব্যক্তির জন্য বাস্তব ও ইতিবাচক স্বাধীনতা বৃদ্ধি এবং সমতা আনয়ন করতে পারি এবং নিচের আলোচনা তা আরও স্পষ্ট করবে।

তাই বিশেষত সুস্থির বৈশ্বিক আর্থিক সংস্থানের এবং সাধারণভাবে বিশ্বায়নের মঙ্গলজনক প্রভাবগুলো আলোচনা করতে আমি সামাজিক সক্ষমতা দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রকরণ বেছে নিয়েছি। এখানে কল্যাণের বিস্তারিত অভিজ্ঞতালব্ধ সূচকগুলো এবং এগুলো কীভাবে একটি সংকট এবং তার পরবর্তী অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয় তা উপস্থাপন করা আমার লক্ষ্য নয়। এটা ভবিষ্যতে কোনো এক প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে। এখানে আমি শুধু স্পষ্টভাবে সংস্কারের ফলাফলগুলো মূল্যায়নের ধারণাগত সমস্যাগুলো আলোচনা করতে চাই। এখানে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং পরিবর্তনগুলো প্রস্তাব করা হলো বা বিশেষজ্ঞরা অন্য যেসব বিকল্প কাঠামো প্রস্তাব করেছেন, সেগুলো অবশ্যই সক্ষমতা বৃদ্ধিকারী হতে হবে বা কমপক্ষে সক্ষমতা হ্রাসকারী হবে না। কিন্তু এখনো প্রথমে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে : মূর্ত এবং বিমূর্তভাবে সক্ষমতা বলতে কী বোঝায়?

সক্ষমতাকে মানবদেহ এবং মনের সাধারণ শক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যা অর্জন, রক্ষণাবেক্ষণ, লালন এবং উন্নত করা যায়। এগুলো খর্ব করা বা একেবারে হরণ করাও যেতে পারে (বিশেষ পরিস্থিতিতে যেমন অপুষ্টি বা দুঃসহ কারাবাস)। আমি অন্যখানে এসব মানব সক্ষমতার সামাজিক (শুধু শারীরবৃত্তীয় নয়) অমোচনীয়তার বিষয়ে জোরারোপ করেছি। সেন নিজেই 'কর্মক্ষম হওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট ধরনের সম্ভাবনা বা সুযোগের' ওপর জোরারোপ করেছেন।

সক্ষমতা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থনৈতিক সংস্কার এবং কাঠামো মূল্যায়ন করতে আমাদের আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে এবং কিছু মৌলিক সক্ষমতা কী হতে পারে তা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে। ডেভিড ক্রোকার সাম্প্রতিক এক প্রবন্ধে নুসবম এবং সেন উভয়েরই সক্ষমতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রশংসনীয় সংক্ষিপ্তসার প্রদান করেছেন। প্রধানত নুসবম হলেও অন্য আরও কিছু উৎসের ওপর নির্ভর করে তিনি একটি তালিকা তৈরি করেছেন, যা এখানে পুনরায় উল্লেখযোগ্য :

মৌলিক প্রায়োগিক মানব সক্ষমতাসমূহ (ন দ্বারা নুসবম এবং স দ্বারা সেন বোঝানো হয়েছে। উদ্ধৃতি চিহ্নযুক্ত অংশ নুসবম থেকে নেওয়া এবং অন্যগুলোর উৎস উল্লেখ করা হয়েছে)।

১.	**নৈতিকতা বিষয়ে সক্ষমতা**
১.১.	ন এবং স : যতদূর সম্ভব মানব জীবনের সম্পূর্ণ শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারা
১.২.	ন : সাহসী হতে পারা
২.	**শারীরিক সক্ষমতা**
২.১.	ন এবং স : ভালো স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সক্ষম হওয়া
২.২.	ন এবং স : যথেষ্টভাবে পুষ্টি অর্জনে সক্ষম হওয়া
২.৩.	ন এবং স : প্রয়োজনীয় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারা
২.৪.	ন : 'যৌন পরিতৃপ্তি অর্জনের সুযোগ পাওয়ায় সক্ষম হওয়া'
২.৫.	ন এবং স : এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতে সক্ষম হওয়া
৩.	**পরিতোষ**
৩.১.	ন এবং স : অপ্রয়োজনীয় এবং অনুপকারী যন্ত্রণা এড়িয়ে যাওয়ায় এবং আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হওয়া
৪.	**জ্ঞানীয় গুণাবলি**
৪.১.	ন : 'পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহারে সক্ষম হওয়া'
৪.২.	ন : 'কল্পনা করতে সক্ষম হওয়া'
৪.৩.	ন : 'চিন্তা করতে এবং যুক্তি প্রদর্শনে সক্ষম হওয়া'
৪.৪.	ন এবং স : গ্রহণযোগ্যভাবে ওয়াকিবহাল হওয়া
৫.	**অন্তর্ভুক্তি-১ (সহানুভূতি)**
৫.১.	ন : 'নিজেদের বাইরে অন্য বিষয় এবং ব্যক্তির সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে সক্ষম হওয়া'
৫.২.	ন : 'ভালোবাসতে, শোকার্ত হতে, স্পৃহা এবং কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে সক্ষম হওয়া'
৬.	**বাস্তব যুক্তিবৃত্তির গুণ (ক্রিয়া)**
৬.১.	ন : ভালো সম্পর্কে ধারণা তৈরিতে সক্ষম হওয়া স : 'বেছে নেওয়ার সক্ষমতা'; লক্ষ্য, প্রতিশ্রুতি এবং মূল্যবোধ নির্ধারণে সক্ষম হওয়া
৬.২.	ন এবং স : একজনের নিজের জীবনের পরিকল্পনা সম্পর্কে সমালোচনামূলক ভাবনা প্রদানে সক্ষম হওয়া

৭.	**অন্তর্ভুক্তি-২ (বন্ধুত্ব এবং ন্যায়বিচার)**
৭.১.	ন : 'অন্যের সঙ্গে এবং অন্যের জন্য বাঁচাতে, অন্য মানুষকে স্বীকৃতি প্রদানে এবং তার জন্য বিচলিত হতে, বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সক্ষম হওয়া'
৭.১.১.	ন : বন্ধুত্ব স্থাপনে সক্ষম হওয়া স : বন্ধুদের দেখতে যেতে এবং তাদের বিনোদিত করতে সক্ষম হওয়া
৭.১.২.	স : গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণের সক্ষমতা
৭.১.৩.	ন : রাজনৈতিকভাবে অংশগ্রহণের এবং ন্যায়বিচারের সক্ষমতা
৮.	**পরিবেশগত গুণ**
৮.১.	ন : 'জীবজন্তু, গাছপালা এবং পরিবেশের সঙ্গে বসবাস করতে এবং এগুলোর প্রতি সংস্রব রাখতে সক্ষম হওয়া'
৯.	**অবসর**
৯.১.	ন : 'হাসতে, খেলতে এবং বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড উপভোগ করতে সক্ষম হওয়া'
১০.	**বিচ্ছিন্নতাবোধ**
১০.১.	ন : নিজের জীবন নিজের মতো করে বাঁচতে সক্ষম হওয়া
১০.২.	ন : 'নিজস্ব পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকাতে সক্ষম হওয়া'
১১.	**আত্মসম্মান**
১১.১.	স : 'আত্মসম্মান থাকার সক্ষমতা'
১১.২.	স : 'লজ্জা ব্যতিরেকে প্রকাশ্যে উপস্থিত হওয়ার সক্ষমতা'
১২.	**মানব সমৃদ্ধি**
১২.১.	ন : 'স্বাভাবিক সম্ভাবনাগুলোর সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত একটি বৈচিত্র্যময় এবং পরিপূর্ণ মানবিক জীবনযাপনের সক্ষমতা'
১২.২.	স : 'মূল্যবান কর্মক্ষমতা অর্জনের সক্ষমতা'

এই ক্রমধারা বজায় রাখতে অন্য গুণাবলিতে বাস্তবিক যৌক্তিকতা এবং সংসর্গ সঞ্চারিত করা প্রয়োজন। তবে বিন্যস্ত না করাই তুলনামূলকভাবে ভালো হতে পারে। ক্রোকার, সেনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নুসবমের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে সেন ও নুসবমের তালিকার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। সেনের কাছে শারীরিক সক্ষমতা এবং কর্মক্ষমতা (২) অন্তর্নিহিতভাবেই ভালো এবং অন্য

ভালো (উচ্চতর) কিছুর জন্য শুধু সহায়কমাত্র নয়; যেমনটা ভালো জীবনের কিছু দ্বৈতবাদী তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়। অ্যারিস্টটলকে ব্যাখ্যা করে নুসবম শারীরিক কর্মক্ষমতা যেগুলো মনোনীত ও ইচ্ছাকৃত, যেমন 'নিজের পুষ্টিবিধান এবং প্রজনন কাজ, যা যুক্তিচালিত জীবনের একটি অংশ তৈরি করে'—এবং অন্যান্য কাজ যেগুলো ইচ্ছাকৃত নয়, যেমন হজম এবং অন্যান্য 'ঘুমের মধ্যকার শারীরিক ব্যবস্থার কাজ' (আসন্ন)—তার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি সম্ভবত বলতে চেয়েছেন যে ইচ্ছাকৃত শারীরিক কর্মকাণ্ডগুলো যা পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যকর অবস্থার দিকে পরিচালিত করে, তা অন্তর্নিহিতভাবেই ভালো। কিন্তু স্বাস্থ্যবান হওয়া বা ভালো পরিপাকব্যবস্থা থাকা কর্মদক্ষতা নয় (কারণ তা ইচ্ছাকৃত নয়) এবং তা শুধু মূল্যবান এ কারণে যে তা আমাদের অন্য কতগুলো কাজ করতে সক্ষম করে। তার জন্য আরেকটি পথ খোলা থাকতে পারে, তা হলো সেনের অভিমত গ্রহণ করা। সেনের মতে, শারীরিক অবস্থা এবং প্রক্রিয়াগুলো—ইচ্ছাকৃত হোক বা না হোক—অন্তর্নিহিতভাবে এবং সহায় হিসেবে ভালো; কিন্তু অন্যান্য সহজাত ভালো সক্ষমতা/কর্মক্ষমতাগুলোর চেয়ে কম মূল্যবান।

অধিকন্তু, নুসবম ৫ এবং ৮-১০ নম্বর বিষয় যোগ করেছেন, সেনের কাছে যার কোনো পরিপূরক নেই। এই বিষয়গুলো সমাদৃত বৈশিষ্ট্য। বিষয়-৮, যেটিকে আমি 'পরিবেশগত গুণ' বলেছি, নুসবমের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্ত হওয়া একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটা এমন একটা সময় যখন অনেকে পরিবেশগত নৈতিকতা এবং উন্নয়ন নৈতিকতার মধ্যকার একাভিমুখিতাকে প্রভাবিত করার পথ খুঁজছেন। তাই অন্যান্য প্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য মানবকেন্দ্রিক নৈতিকতার একটি ক্ষেত্র তৈরি করা প্রয়োজন। নুসবমের 'পরিবেশগত গুণ' যথেষ্ট শক্তিশালী কি না তা বিবেচনাযোগ্য। হয়তোবা এটাকে এমনভাবে পাঠ করা যেতে পারে: 'অন্তর্নিহিতভাবে মূল্যবান হিসেবে জীবজন্তু, গাছপালা এবং পরিবেশের সঙ্গে বসবাস করতে এবং এগুলোর প্রতি সংস্রব রাখতে সক্ষম হওয়া'। বেশ আন্তরিকভাবে তৈরি করা এই তালিকায় ৯ নম্বর বিষয়টি কিছুটা কৌতুকপ্রবণতার অবতারণা করেছে। নুসবমের তালিকায় এই বিষয়গুলোর উপস্থিতি এবং সেনের তালিকায় সেগুলোর অনুপস্থিতি এবং আরও সাধারণভাবে, নুসবমের ব্যাখ্যায় প্রায়ই দেখতে পাওয়া অধিক মূর্ত বয়ন কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? একটি প্রস্তাব হচ্ছে, এই পার্থক্যগুলোর কারণ হচ্ছে তার লেভেল-১-এ সীমাবদ্ধতা, ভঙ্গুরতা এবং মানব অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার ওপরে নুসবমের অধিক গুরুত্ব দেওয়া। অন্যদিকে এমনটা হতে পারে যে মানবজাতি সম্পর্কে নুসবমের সমৃদ্ধতর ধারণা, বৈজ্ঞানিক ধীশক্তি থেকেও অনেক বেশি গল্প-বলিয়ের কল্পনা কাজে লাগানো থেকে তৈরি। অন্যদিকে, সেন আত্মসম্মানের ভালো দিকটি যোগ

করেছেন, একটি গুণ যা তাকে রউলসের অভিন্ন অবস্থানে এনেছে। এটি তাকে কান্টিয় নৈতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম করেছে, যেখানে নৈতিক কর্তাদের নিজেদেরসহ অন্য সবাইকে শ্রদ্ধা করার বাধ্যবাধকতা ছিল।

তবে সেন ও নুসবম উভয়ই একমত হন যে এই সক্ষমতাগুলো স্বতন্ত্র এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তির পক্ষে এর কোনো একটির বিনিময়ে অন্যটি অর্জন করা সহজ নয়। খুব বেশি হলে, একজন ব্যক্তি খুবই সংকীর্ণ পথে এমনটা করতে পারে। এ বিষয়গুলোকে কখনো উপযোগের মতো সংকীর্ণ করা যায় না। অর্থাৎ প্রতিটি সক্ষমতাই গুণগতভাবে স্বতন্ত্র। টাকা কিংবা অন্য কোনো সাধারণ মাপকের ভিত্তিতে এগুলোকে সামগ্রিকভাবে একীভূত মাপজোকে প্রকাশ করা অসম্ভব।

যেমনটা ক্রোকার উল্লেখ করেছেন, সাধারণ আয় বণ্টন বিবেচনার বাইরে গিয়ে স্বাধীনতা, অধিকার এবং ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে 'সক্ষমতা নৈতিকতা'র প্রভাব রয়েছে। যদি কেউ সক্ষমতা দৃষ্টিভঙ্গিকে মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে মেনে নেয়, তাহলে অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রভাব পুরোপুরি মূল্যায়নের জন্য বণ্টনভিত্তিক ন্যায়বিচারকে ছাড়িয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্থা এবং জাতীয় অর্থনৈতিক নীতিমালাগুলোকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা শুধু দক্ষতার প্রশ্নটিই তুলতে চাই না, বরং মানব মুক্তি-সম্পর্কিত সব প্রশ্ন উত্থাপনের ইচ্ছা রাখি। বিশেষত কিছু কাজ করার জন্য ইতিবাচক মানবমুক্তির বিষয়টি। সুতরাং, একটি ভারসাম্যহীন লাভ বণ্টনব্যবস্থার দিকে নিয়ে গেলেও, বাজার তৈরি এবং দক্ষ উৎপাদন নিজে থেকে খুব কম অর্থই বহন করে। রীতিমতো ভয়াবহ হচ্ছে, যদি বাজার এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো আয়ুষ্কালের হ্রাস, বেকারত্ব বৃদ্ধি, অনেকের জন্য ভোগের মাত্রা হ্রাস, কিছু গোষ্ঠী যেমন নারী ও সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত করার মতো ধারণাগুলোর দিকে চালিত করে, তবে এগুলো এমনকি দুর্বলভাবেও ন্যায়সংগত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো হিসেবে গণ্য হবে না। বিপরীত দিকে, এমন পরিস্থিতিতে সক্ষমতা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বৈশ্বিক বাজার এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান দৃঢ়ভাবে অন্যায্য হয়ে উঠবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাজার এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যাসমূহের পূর্বেকৃত ইতিবাচক বিশ্লেষণকে একটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ 'সামাজিক সক্ষমতা' কাঠামোতে ফেলতে হবে। এ রকম কাঠামোটি সম্পূর্ণ নিয়মাত্মক। এটি পশ্চাদপদদের তাদের সক্ষমতাগুলোকে বৃদ্ধিতে সাহায্য করার মাধ্যমে তাদের সক্ষমতার সমতা অর্জনের দিকে চালিত করতে একটি দৃঢ় নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে। তাই যেকোনো প্রস্তাবিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে বৈশ্বিক অর্থনীতির দরিদ্র জাতিগুলো এবং দরিদ্র মানুষেরা একটি বিশেষ নৈতিক মনোযোগের যোগ্য। যেমনটা নব-প্রবর্তিত কাঠামোর বর্ধিত উৎপাদনের আলোকে খান (১৯৯৮)

দেখিয়েছেন, শেষতক যেকোনো উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য হতে হবে মানুষের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা। সেনের (১৯৯৯) মতে, এ রকম স্বাধীনতার একটি সহায়ক এবং একটি চূড়ান্ত মূল্য আছে। সামাজিক সক্ষমতা হিসেবে স্বাধীনতা আরও উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে ধাবিত করতে পারে। সুতরাং এমনকি দৃঢ়সংকল্প, দক্ষতানির্ভর বিশ্লেষণেও একটি প্রায়োগিক বিষয় হিসেবে এগুলোকে অবশ্যই আলোচনায় আনতে হবে।

এখন পর্যন্ত এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হচ্ছে, কীভাবে মন্দ তত্ত্ব খারাপ নীতিমালার দিকে পরিচালিত করে তা দেখানো। তত্ত্বগুলো বাম, ডান বা মধ্যবর্তী যে মতাদর্শীই হোক না কেন। একইভাবে, সবার জন্য ন্যায্যতা এবং কল্যাণের মতো গুরুতর নৈতিক বিষয়গুলো নিশ্চিত করা না গেলে, তা একটি বিক্ষুব্ধ সমাজের দিকে চালিত করতে পারে। যখন আমরা এমন একটি বৈশ্বিক সমাজ নির্মাণের দিকে ধাবিত হব, যেখানে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আচরণের পার্থক্যগুলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে আমরা কল্যাণের দিকে চালিত হব এবং এসব বিষয়কে সমানভাবে সম্মান জানানো হবে; তখন আমরা পুরোনো অর্থনৈতিক কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে বৈশ্বিক নাগরিকত্বের একটি স্পষ্ট নৈতিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে নতুন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান তৈরির বাস্তবিক চেষ্টা করতে পারব। দক্ষতা ও ন্যায্যতা দুটিই গুরুত্বপূর্ণ এবং মাঝে মাঝে দুটো একসঙ্গেই অর্জন করা যেতে পারে। অন্য সময়ে স্বল্পমেয়াদে হলেও এগুলোর মধ্যে ছাড় দেওয়ার বিষয়টি অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক তত্ত্বের অগ্রগতি, ইতিবাচক এবং নিয়মাত্মক উভয়ই একটি পরিমিত কিন্তু উপকারী ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং, সংকট নিবারণ ও ব্যবস্থাপনার জগতে যেকোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই ব্যয় কমানো ও লাভ বাড়ানোর ক্ষেত্রে তা অবশ্যই ইতিবাচক অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং অর্থনৈতিক নৈতিকতার অগ্রগতি উভয়ের দ্বারাই চালিত হতে হবে। নিচের দুটি অংশে সাধারণভাবে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য এবং এশীয় অর্থনৈতিক সংকটের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচিত হবে। সাধারণ এবং বিশেষ উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রধান প্রস্তাব অর্থাৎ অকপট নব্য-উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপদসমূহ এখানে প্রতিপাদিত হয়েছে। অধিকন্তু, (সামাজিক) সক্ষমতা বৃদ্ধিকারক নীতিমালার প্রয়োজনীয়তাও এখানে প্রতিপাদিত হয়েছে।

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের জন্য প্রভাবসমূহ

উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর বিশ্বায়নের প্রভাববিষয়ক সনির্বন্ধ আলোচনাগুলো পাঠের সময় একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবশালী হিসেবে প্রতীয়মান হয়। দৃষ্টিভঙ্গিটি হচ্ছে, প্রগাঢ় অর্থনৈতিক একীভূতকরণের ফলে উৎপাদনের নিয়ামক হিসেবে পণ্য এবং সেবাসমূহের প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে; ফলে

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জনগণের কল্যাণ অগ্রসর হবে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে বিশ্বায়নের ফলে একটি উন্নততর শ্রম বিভাজন তৈরি হবে। ফলে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো (যেখানে প্রচুর শ্রমিক রয়েছে) শ্রমঘন পণ্যগুলোতে বিশেষায়িত হবে এবং উন্নত রাষ্ট্রগুলো তাদের শ্রমিকদের অধিক উৎপাদনশীল খাতে নিয়োজিত করতে পারবে (দ্য *ইকোনমিস্ট*, ১৯৯৭ক)। আরও যুক্তি দেখানো হয় যে বিশ্বায়নের ফলে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ সুযোগ অনুসারে মূলধনের প্রবাহ নিশ্চিত হবে, ফলে মূলধনের বিপরীতে লাভের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে।

অন্যরা (ফক, ১৯৯৭; খান, ১৯৯৬; সেন, ১৯৯৭, ১৯৯৯; স্টিগলিৎস, ২০০২, ২০০৬) এই যুক্তি নাকোচ করে দেন এবং বলেন যে বিশ্বায়ন এবং আঞ্চলিকায়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী অর্থনৈতিক সত্তাদের লাভবান করছে, ফলে দুর্বল রাষ্ট্র এবং অঞ্চলগুলোর প্রান্তিকায়ন ঘটছে। এটা বলা হয় যে বিশ্বায়ন সেবা খাতসমূহের এবং দক্ষ শ্রমিকের গুরুত্ব বৃদ্ধি করলেও একই সঙ্গে প্রাথমিক পণ্য এবং অদক্ষ শ্রমিকদের গুরুত্ব হ্রাস করছে। জীবপ্রযুক্তি, মাইক্রোইলেকট্রনিকস এবং এ রকম খাতে ঘটে যাওয়া বিপ্লবগুলো কাঁচামালের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে। ফলে, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর যে রাষ্ট্রসমূহকে একসময় সমৃদ্ধিশালী হিসেবে গণ্য করা হতো, এখন তারা আর ধনী রাষ্ট্রের তালিকাতে স্থান পাচ্ছে না। এটা বিস্ময়ের বিষয় নয় যে আজকের বিশ্বের সবচেয়ে ধনী মানুষ হচ্ছে মাইক্রোসফটের মালিক বিল গেটস। প্রযুক্তির উন্নয়ন শুধু জোগান কাঠামোতেই পরিবর্তন আনেনি, এটা তাদের গুরুত্বেরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আধুনিক কলকারখানাগুলো কম প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে, ফলে প্রতিযোগিতামূলক সূচকে প্রাকৃতিক সম্পদের মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে। আধুনিক অর্থনীতিতে প্রযুক্তি, জ্ঞান ও দক্ষতা তুলনামূলক প্রাধান্যের একমাত্র উৎসে পরিণত হয়েছে (থরো, ১৯৯৬)। এ রকম পরিস্থিতি প্রধানত প্রাথমিক পণ্য এবং অদক্ষ শ্রমিক রপ্তানিকারক উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে অসুবিধাজনক অবস্থানে *ঠেলে* দিয়েছে।

অন্যদিকে, বিশ্বায়ন ইতিমধ্যে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে বৈশ্বিক বাজারের নিয়মনীতি অনুসারে চলতে বাধ্য করছে। ফলে তাদের জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার গুরুত্ব সীমাবদ্ধ হচ্ছে (খান, ১৯৯৮, ২০০৪ক, ২০০৪খ; চেঙ, ২০০৭; বনভিন, ১৯৯৭)। অর্থনীতিবিদেরা দীর্ঘ সময় ধরে এটা জানেন যে যখন মূলধন অবাধে আন্তসীমান্তে প্রবাহিত হয়, তখন জাতীয় অর্থনৈতিক নীতিমালার স্বতন্ত্রতা এবং গুরুত্ব বিলীন হয়ে যায়।

অধিকন্তু, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাজার এবং উচ্চমাত্রার সঞ্চরণশীল ব্যক্তি খাতে পুঁজির প্রবৃদ্ধি, মুদ্রা বিনিময় হার এবং কার্যকর ও সুস্থির সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে রাষ্ট্রসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয় (খান, ২০০৪খ; আঙ্কটাড, ২০০৬, ২০০৭)।

সুতরাং, প্রবৃদ্ধি ও বণ্টনের দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বিকভাবে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ হেরে যাচ্ছে। চীন এবং এর পূর্বে পূর্ব এশীয় অর্থনীতিগুলোর সাফল্য ছিল কৌশলগত একীভূতকরণনির্ভর, যেখানে জাতীয় বাণিজ্য, শিল্প ও আর্থিক নীতিমালাগুলো তুলনামূলকভাবে স্বতন্ত্র ছিল। উচ্চপ্রবৃদ্ধির সময় অসমতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা মজুত ব্যবহারের মাধ্যমে বাড়ানো যেত। মজার বিষয় হচ্ছে, চীন এখন প্রচুর পরিমাণে মার্কিন সরকারের স্বল্প-প্রদায়ী বন্ড কেনার মাধ্যমে, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশের খুব ধনীদের অপব্যয়ী ব্যয়ের ধরনকে অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে সহায়তা করছে। এর পেছনে পদ্ধতিগত কারণ রয়েছে। কিন্তু এটা অস্বীকার করা যাবে না যে এই ব্যবস্থা বৈশ্বিক অর্থনীতিকে সার্বিকভাবে একটি সংকোচননির্ভরতা দিয়েছে এবং চীনের অভ্যন্তরে জীবনমান নিম্ন রেখেছে। ফলে তুলনামূলক অধিক দরিদ্ররা প্রায় এই তিন দশকের প্রবৃদ্ধি থেকে সমানভাবে উপকার ভোগ করতে পারেনি। যখন ১৯৯০-এর দশকে পূর্ব এশীয় অর্থনীতিগুলো সাফল্যের সঙ্গে তাদের আর্থিক বাজারকে উদারীকরণ করেছিল, পশ্চিমা করপোরেট স্বার্থচালিত বিশ্বায়নের আসল বিপদ তখন ঘরে প্রবেশ করে। এরপরই তারা সবচেয়ে তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয় (খান, ২০০৪; স্টিগলিৎস, ২০০২, ২০০৬)। প্রধানত নিজেদের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট উদারীকরণ করতে অস্বীকার করার মাধ্যমে চীন ও ভারত এই সংকট থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিল।

বিশ্বায়নের অসংগতিসমূহের একটি উদাহরণ : এশীয় আর্থিক সংকটের সময় এশীয় মিরাকল থেকে এশীয় বিপর্যয়

বিশ্বে বিকাশমান অর্থনৈতিক একীভূতকরণের অন্তর্নিহিত অস্থিরতাগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকট, যা প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে শুরু হয় এবং পরে কোরিয়াকেও আক্রান্ত করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং কোরিয়াতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর ফলে জাপানের মন্দা এবং ঋণ ঘনায়মান হওয়াও কিছুটা খারাপ মোড় নেয়। এই সংকট এবং এর প্রভাব আলোচনা করতে হলে এশীয় মিরাকল এবং বিশ্বায়ন সম্পর্কে একটি অনুত্তেজিত দৃষ্টিভঙ্গি রাখা প্রয়োজন।

সংকটটির সংক্ষিপ্ত পুনঃস্মরণ করলে দেখা যাবে যে ২ জুলাই ১৯৯৭ সালে শুরু হওয়া থাই সংকট এবং পরবর্তী সংক্রমণ প্রভাবগুলোর জন্য আক্রান্ত অর্থনীতিতে বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান কয়েকটি ফ্যাক্টর জড়িত। এ ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে মার্কিন ডলারের ভিত্তিতে একটি কার্যত স্থির মুদ্রা বিনিময় হার, গৃহায়ণের মতো অস্থিতিশীল খাতে স্বল্প সময়ে ঋণ দেওয়া ও নেওয়া ইত্যাদি। ১৯৯৬ সালের রপ্তানি

হ্রাস ইতিমধ্যেই ব্যালেন্স অব ট্রেডে ঘাটতি সৃষ্টি করেছিল। যখন বাথ, রিঙ্গিত এবং রুপিয়ার মতো মুদ্রাগুলোর বিরুদ্ধে ফাটকামূলক আঘাত শুরু হয়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো দীর্ঘ মেয়াদে তা আর সামাল দিতে পারেনি। কিন্তু এই সংকটটি শুধু মুদ্রার সংকট ছিল না। শিগগিরই ব্যাংকিং খাত আক্রান্ত হয়েছিল। প্রথমে অসংখ্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তারল্যসংকট এবং সবশেষে দেউলিয়াপনা দেখা দিয়েছিল। পরিশেষে, বাস্তবিক অর্থে অর্থনীতিগুলো আক্রান্ত হয়েছিল, সবচেয়ে তীব্র আঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়ায় এই অর্থনৈতিক সংকটটি একটি পূর্ণমাত্রার রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হয়েছিল এবং সুহার্তোর ৩০ বছরের শাসনের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল।

এই সংকটকে কীভাবে চিহ্নিত করা হবে সে সম্পর্কে এখন একটি স্পষ্ট মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমনটা জমো (১৯৯৮) এবং খান (২০০৪খ) উল্লেখ করেছেন, এই রাষ্ট্রগুলোতে সমন্বয় প্রকল্পগুলো নিয়ে আইএমএফ এবং এর সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক থেকে অনেক মতবিরোধ প্রকাশিত হয়েছে। তবে নীতিগত বিতর্কে সংকটটিকে ত্বরান্বিত করতে বিশ্বায়নের ভূমিকার মতো কিছু মৌলিক বিষয় যথেষ্টভাবে স্থান পায়নি।

১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সার্বিকভাবে এই অঞ্চল দ্রুত উন্নতি করতে শুরু করে। বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য অবমূল্যায়ন এবং নিয়ম হ্রাসের কারণে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের মতো রাষ্ট্রগুলো সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। সৌভাগ্যবশত প্লাজা চুক্তির পর জাপানি ইয়ানের উচ্চমূল্য অনেক জাপানি কোম্পানিকে বিদেশে বিনিয়োগে প্ররোচিত করে। কিছু জাপানি এফডিআইয়ের গন্তব্য হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

এমনকি সংকটের সময়েই এটা দেখা গিয়েছিল যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভিত্তিগত বিষয়গুলো সুস্থিরই ছিল (খান, ২০০২ক, ২০০২খ, ২০০২গ, ২০০২ঘ, ২০০২ঙ)। অন্য কথায় আর্থিক স্থিতি বজায় ছিল, মুদ্রানীতি মন্দ ছিল না এবং মূল্যস্ফীতি উচ্চ ছিল না। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রপ্তানিনির্ভর প্রবৃদ্ধিতে গৃহায়ণ এবং আর্থিক বাজারের বুদবুদও ছিল। সম্পত্তি, নির্মাণ এবং স্টক মার্কেটের দ্রুত বৃদ্ধি নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে। ভবিষ্যতে উচ্চ ফল লাভের আশায় বর্তমান সময়েই উচ্চমূল্য ও বিনিয়োগে প্ররোচিত করে। যখন এই অর্থহীনতা বৃদ্ধির অস্থির গতিবেগ মুখ থুবড়ে পড়ে, এর গতিপথ হঠাৎ ঠিক বিপরীতমুখী হয়ে যায়। দ্রুত বৃদ্ধির এই বাগাড়ম্বর, যা একই সঙ্গে গতানুগতিক এবং প্রসন্ন ছিল, একটি সমান সর্বনাশের বাগাড়ম্বরের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।

এ রকম একপেশে, রৈখিক বয়ানে ইতিহাস একমুখী হিসেবে অগ্রসর হয়। তবে বিশ্বায়নের যুক্তি, যা উল্লেখ করতে আমরা কুণ্ঠিত হই, আরও অনেক জটিল।

এশীয় উদাহরণ দেখিয়েছে যে এক সঙ্গে অসংখ্য বাজার শক্তির লাগাম ছেড়ে দিলে, বিশেষত বিবেচনাহীনভাবে এবং অন্যান্য নিয়মনীতি আরোপ ও তা কার্যকর করার সক্ষমতা অর্জন না করে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের উদারীকরণ কীভাবে ধ্বংস এবং বিশৃঙ্খলা ডেকে আনতে পারে।

মেক্সিকান সংকট এবং এশীয় সংকটের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই আছে। উভয় ক্ষেত্রেই দ্রুত মুদ্রার পতন হয়। ল্যাটিন আমেরিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উভয় অঞ্চলেই অধিক মাত্রায় সংক্রমণ প্রভাব কাজ করেছে। তবে দুটি সংকটের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে, মেক্সিকান পেসোর পতন এবং এর ফলে তৈরি হওয়া 'টেকিলা ইফেক্ট'-এর কারণে সম্পত্তি বিক্রির প্রবণতা তৈরি হয়নি, যেমনটা হয়েছিল এশীয় সংকটে। ল্যাটিন আমেরিকান সংকট পূর্ণমাত্রার ঋণ সংকোচনে পরিণত হয়নি।

সুতরাং, এশীয় সংকট শুধু একটি পরিশোধের হিসাবের সংকট ছিল না। এটা ছিল একটা মুদ্রাসংকট, যেটা অর্থনীতির বাস্তব ক্ষেত্রে একটি পূর্ণমাত্রার এবং বৃহদায়তন ঋণ সংকোচন এবং মন্দায় পরিণত হয়। এই নতুন ধরনের মুদ্রাসংকট এবং ঋণ সংকোচনকে চিহ্নিত করার একটি উপায় হচ্ছে এগুলোকে আন্তর্জাতিক মূলধন বাজারের ব্যর্থতা হিসেবে দেখা, যা বর্তমান করপোরেট-চালিত বিশ্বায়নের একটি যুক্তিযুক্ত ফলাফল। প্রথম ক্ষেত্রে বিশ্বায়িত আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার সন্তোষজনকভাবে মূলধনের বণ্টনে ব্যর্থ হয়েছে, যা নব্যধ্রুপদি অ্যারো-ডেবরু সাধারণ ভারসাম্য মডেলের বিপরীত। সংকটের সময় অ্যালেন গ্রিনসপ্যান বিনয়ের সঙ্গে যেমনটা উল্লেখ করেছিলেন : 'অতীতের ঘটনাবলির পর্যালোচনা করলে এটা পরিষ্কার হয় যে লাভজনকভাবে গ্রহণযোগ্য ঝুঁকিতে যে পরিমাণ মূলধন এসব অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করা যেত, তার চেয়ে বেশি মূলধন এসব অর্থনীতিতে প্রবাহিত হয়েছিল' (গ্রিনসপ্যান, ১৯৯৭ : ১-২)। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ খাতে ব্যাংক ব্যবস্থা বৈদেশিক মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ ধারণ করতে এবং অন্য খাতে তা প্রবাহিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। স্টিগলিজের রূপকে বলতে হয় ব্যাংক ব্যবস্থা, আরও সাধারণভাবে আর্থিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অন্যভাবে বললে, এটা কার্যকরভাবে ঝুঁকির ওপর নজর রাখতে এবং মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। স্পষ্টভাবে, বিগত সংকটগুলোর ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়নি, যেমনটা অতিসাম্প্রতিক কালে উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে ঘটে যাওয়া সাবপ্রাইম ঋণসংকট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটিও আর্থিক খাতে নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এশীয় সংকট-সম্পর্কিত ওপরের আলোচনায় পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আলোকে বিশ্বায়নের আপাত স্ববিরোধগুলোই প্রকাশিত হয়েছে,

যার ওপর আমি এই প্রবন্ধে জোরারোপ করেছি। যেমনটা সোবহান (১৯৮৯) এবং অন্যরা উল্লেখ করেছেন উন্নয়নশীল বিশ্বে পুঁজিবাদ বৃহদার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে। তবে, যেসব রাষ্ট্র যৎকিঞ্চিত হলেও সফল পুঁজিবাদী অর্থনীতি তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, সে একই রাষ্ট্রই বিশ্বায়নের মুখে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এই আপাত বিরোধাত্মক অবস্থার আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

যেমন এশিয়ার উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোতে পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো তৈরি রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে বিবেচনা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সক্রিয় সহযোগিতায় পুঁজিবাদীরা একটি শ্রেণি হিসেবে গড়ে ওঠে এবং তারাই বৃহদর্থে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে। এশীয় উন্নয়নের আপাতবিরোধ হচ্ছে এই, একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত রাষ্ট্রসমূহ এসব করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এসব রাষ্ট্রচালিত পুঁজিতান্ত্রিক উন্নয়ন যে তাদের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গিয়েছে তাও এখন স্পষ্ট প্রতীয়মান।

১৯৯০-এর দশকে এশিয়ার উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ বৈশ্বিক বিস্তারের মোটামুটি অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করত। তবে, রপ্তানির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির ফলে পুঁজিবাদের উদারীকরণের জন্যও এসব অর্থনীতির ওপর চাপ ছিল। উত্তর কোরিয়া, যেটি ওইসিডি গোষ্ঠীকে যোগ দিতে যাচ্ছিল, তাদের জন্য এই উদারীকরণ অপরিহার্য শর্ত হিসেবে দেখা হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য উদীয়মান বাজারে এফডিআই এবং আর্থিক মূলধনের প্রবাহের সমাহারকে আরও অধিক উদারীকরণকে ন্যায্যতা প্রদানকারী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছিল। স্থির মুদ্রা বিনিময় হার এবং গোঁড়া আর্থিক ও মুদ্রা নীতিমালার শাসনব্যবস্থা এসব বাজারকে ইতিমধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করেছিল। তবুও রাষ্ট্র—যেমনটা দেখা গিয়েছিল আগের মতো বিশ্বায়িত বাজারে—দেশীয় পুঁজিপতিদের রক্ষা করতে পারেনি। অনুন্নত রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য তথাকথিত 'শাসনপদ্ধতির সংকট' (জমো, ১৯৯৮) একটি বাস্তবিক সংকট, যেটি বিশ্বায়নের শক্তিগুলোর সঙ্গে লড়তে কার্যত শক্তিহীন। সুতরাং, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে বৈসাদৃশ্য আবারও তীব্রভাবে প্রকাশিত হলো। বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের সতর্ক তদন্তে বাস্তব এবং আর্থিক খাতের যে অসম উন্নয়ন তাও বের হয়ে এসেছে। যখন পুঁজিবাজারে আস্থার পতন হয় এবং বিনিয়োগকারীরা বাজার ত্যাগ করতে থাকেন, তখন দুর্বল রাষ্ট্রগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ পুঁজিবাজারকে বাঁচাতে খুব কম পদক্ষেপই নিতে পারে। যেমনটা সিয়ামওয়ালা (১৯৯৭) দুঃখপূর্ণভাবে বলেছেন, থাই রাষ্ট্র এবং থাই বুর্জুয়াদের এ রকম ব্যর্থতার কারণে আইএমএফের পীড়াদায়ক শর্তগুলো মেনে নেওয়া ছাড়া থাইল্যান্ডের মতো রাষ্ট্রগুলোর কাছে আর কোনো বিকল্প নেই। থাইল্যান্ডে আমলা, রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যকার জটিল সম্পর্কের

কারণে (ক্রোঙকাও, ১৯৯৭) এই সংকট মোকাবিলায় খুব দ্রুত কোনো সুসংগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে, এটাও আশা করা যাচ্ছিল না। অন্য কোনো বিন্যাসে, বিশ্বায়নের অধীনে শাসনপদ্ধতির এই সংকট অন্য অনেক রাষ্ট্রে চলমান রয়েছে।

এসব কিছুতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকটি হচ্ছে বৈশ্বিক পুঁজিবাদে রাষ্ট্রযন্ত্রের অসম উন্নয়ন। উদাহরণস্বরূপ, অনেক এশীয় রাষ্ট্রে আমলারা বিভিন্ন বিশেষায়িত কাজে নির্দেশক এবং তদারককারী বিশেষজ্ঞের কাজ করে এবং তাঁদের কাজে তুলনামূলকভাবে দক্ষ হয়ে ওঠেন এবং অংশত এই কারণে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। একই সময়ে, এই একই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অনেকগুলোতেই ব্যাংকিং এবং আর্থিক খাতের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যন্ত দক্ষ বিশেষজ্ঞ এবং শক্তিশালী আমলা নেই। এমনকি থাইল্যান্ডের মতো রাষ্ট্রে, যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ট্যাকনোক্রেটিক সক্ষমতার জন্য সুনাম আছে, সেখানেও নতুন প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংকক ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং ফ্যাসিলিটিসহ উদারীকৃত বাজারের সম্মুখে আমলারা নিজেদের অসহায় মনে করেছিলেন (লরিডসেন, ১৯৯৮)। আরও সাম্প্রতিক সংকটগুলো যেমন আর্জেন্টিনার সংকট এবং দ্রুত বর্ধনশীল বৈশ্বিক সাবপ্রাইম ঋণসংকট, যথেষ্ট পরিমাণ সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং অর্থনৈতিক নিয়মনীতি অবলম্বন না করে দ্রুত উদারীকরণের একই ধরনের সমস্যাগুলোকে নির্দেশ করছে।

সংক্ষিপ্তসার এবং উপসংহার

বিশ্বায়নের অবশ্যই কিছু ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে, যেমন প্রযুক্তির হস্তান্তর, নির্দিষ্ট খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে কিছু মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন। তবে বর্তমানের বিশ্বায়ন সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল বা গোষ্ঠীকে লাভবান করলেও, ভঙ্গুর এবং পশ্চাৎপদ অঞ্চল এবং মানুষদের প্রান্তিকায়িত করছে এবং পীড়াদায়ক অবস্থান সৃষ্টি করছে। মানব এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ওপর বস্তুগত সম্পদ অর্জনকে গুরুত্বদানের মাধ্যমে করপোরেট-চালিত এ ধরনের বিশ্বায়ন বিভিন্ন মানবিক চাহিদার মধ্যে অসমতা সৃষ্টি করছে, ফলে সহিংসতা, উন্মত্ততা এবং হতাশা তৈরি করছে। বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদগুলো এসব আপাতবিরোধকে তুলে ধরে।

বর্তমানের বৈশ্বিক অর্থনীতিতে কাঁচামালের এবং কম দক্ষ শ্রমিকের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে দক্ষ শ্রমিক এবং জ্ঞান, বিশেষত টেলিযোগাযোগ এবং কম্পিউটার প্রযুক্তি খাতের জ্ঞানের কদর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা দরিদ্র জাতিসমূহকে, যারা প্রাথমিক পণ্য এবং কম দক্ষ শ্রমিকের প্রধান রপ্তানিকারক, একটি অসুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড় করাচ্ছে।

বিশ্বায়ন সরকার এবং জাতিরাষ্ট্রসমূহের ওপর বিশ্ববাজারের নিয়ম এবং অনুশাসনগুলো আরোপ করছে, ফলে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর আর্থিক এবং মুদ্রানীতিসহ জাতীয় নীতিমালার গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। গিলপিনের মতে, যদি একটি রাষ্ট্র মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে লড়তে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে, তবে এর ফলে অভ্যন্তরীণ সুদের হার বৃদ্ধি পায় এবং এর কারণে পুঁজির অন্তঃপ্রবাহ শুরু হয়, যা তখন আসল নীতিগত উদ্দেশ্যকে প্রতিহত করে এবং মুদ্রা বিনিময় হার বৃদ্ধি করে। ...স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক এবং মুদ্রাবিষয়ক মূল্যবোধ থেকে অভ্যন্তরীণ লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টাকে পৃথক রাখা অসম্ভব।[৪]

বিশ্বায়নের অন্য নেতিবাচক প্রভাবটি হচ্ছে আয়বৈষম্যের ওপর এর প্রভাব। যেমনটা আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বিশ্বায়নের একটি প্রবণতা হচ্ছে জাতি, ব্যক্তি ও অঞ্চলসমূহের মধ্যে আয়বৈষম্য বৃদ্ধি করা। ফক অন্য আরও অনেকের মতামতকে ধারণ করেন, যখন তিনি বলেন,

> ...ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অধীনে বিশ্বায়ন সংঘটিত হচ্ছে, যাতে সব ধরনের স্থূল অসমতা দেখা যাচ্ছে। ফলে এটি সমাজের মধ্যে এবং সমাজসমূহের মধ্যে যারা ইতিমধ্যেই সুবিধাজনক অবস্থানে আছে তাদের ওপর প্রবৃদ্ধির উপকারিতার ওপর মনোনিবেশ করছে। একই সঙ্গে যারা ইতিমধ্যে সবচেয়ে বেশি অসুবিধাজনক অবস্থানে আছে তাদের অবস্থাকে তুলনামূলক এবং নিশ্চিতভাবে আরও খারাপ করে তুলছে।[৫]

আরও কিছু ন্যায্য উদ্বেগজনক বিষয় রয়েছে, যেমন ট্রাইপোলার অঞ্চলে (উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ, অন্যান্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে সম্পদের প্রবাহ হ্রাস পেতে পারে, ফলে বৃহৎ অঞ্চল যেমন সাব-সাহারান আফ্রিকার আর্থিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিকায়নকে অপ্রতিরোধ্য মনে হতে পারে, তাই বৈশ্বিক বাজার অর্থনীতির ফলে জন্মলাভ করা আর্থসামাজিক সমস্যাসমূহকে অতিসত্বর আলোচনায় স্থান দেওয়া অতীব জরুরি।

এই প্রবন্ধে আমি জোর দিয়ে বলেছি যে একটি ন্যায্য বৈশ্বিক অর্থনীতির ধারণাগত কাঠামোতে বিশ্বায়নের বিরূপ প্রভাবগুলোকে আলোচনায় আনতে হবে। এটা করার জন্য আমি সামাজিক সক্ষমতা দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার করার প্রস্তাব করেছি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ন্যায্য বৈশ্বিক অর্থনীতির দিকে যেকোনো পদক্ষেপের জন্যই বৈশ্বিক সম্পদ এবং ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য পুনর্বণ্টন প্রয়োজন হবে। বিশেষত, এর জন্য বর্তমান শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহকে তাদের সার্বভৌমত্বের কিছুটা নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর কাছে ছেড়ে দিতে হবে। এই সংগঠনগুলো একটি সময়োচিত এবং ন্যায়সংগত উপায়ে উন্নত এবং উন্নয়নশীল

রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যগুলোকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে বৈশ্বিক মঙ্গলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বৈশ্বিক অর্থসংস্থানের সমস্যাসমূহ বহুপক্ষীয়ভাবে কীভাবে সমাধান করা যায় তার একটি উদাহরণ হচ্ছে প্রস্তাবিত টবিন কর। এই কর থেকে হওয়া আয় এমন উন্নয়নের অর্থসংস্থানে খরচ করা যায়, যা এলডিসির মানুষদের সক্ষমতা বাড়াবে তাহলেই সবচেয়ে ভালো হয়।[৬]

যা হোক, বর্তমান অবস্থায় টবিন কর গ্রহণ বা অদূর ভবিষ্যতে উন্নয়নের জন্য এটার পরার্থে ব্যবহারের কোনো আশা দেখা যাচ্ছে না। একই সময়ে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থেই একটি একক রাষ্ট্র হিসেবে এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে দলবদ্ধ হয়ে স্বাধীনভাবে কাজের জন্য তাদের যে পর্যায়ের আপেক্ষিক স্বশাসন থাকুক না কেন, তা কাজে লাগাতে হবে এবং এর মাধ্যমে চিড় ধরা বিশ্বায়নের বিরূপ প্রভাবসমূহকে উপশম করতে হবে। এসব সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টা সার্বিকভাবে কার্যকর হবে না, কিন্তু নীতিমালা-সম্পর্কিত অসাড়তা—এ ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাবশালী ডিসকোর্সকে সমালোচনাহীনভাবে গ্রহণ করা হয়—অপেক্ষা তা গ্রহণযোগ্য। চূড়ান্তভাবে একটি স্বচ্ছ নিয়মভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং বৈশ্বিক আর্থিক কাঠামোনির্ভর একটি ন্যায্য বৈশ্বিক ব্যবস্থা একই সঙ্গে দক্ষতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে; কিন্তু এই অভিমুখে যাত্রার জন্য সব পক্ষেরই—কমপক্ষে প্রধান উন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের—এখানে উপস্থাপিত কাঠামোর আলোকে সহযোগিতা করার ইচ্ছাশক্তি থাকা প্রয়োজন।

যদি এই প্রবন্ধে প্রস্তাবিত মূল যুক্তি সঠিক হয়, তবে বৈশ্বিক আর্থিক বাজারগুলোর তদারকি প্রয়োজন এবং একটি সঠিক বৈশ্বিক আর্থিক কাঠামোকে একই সঙ্গে দক্ষতা ও ন্যায্যতার যুক্তির আলোকে নির্মাণ করতে হবে। দক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিটি হচ্ছে, একটি অভিন্ন পদ্ধতিগত ঝুঁকি পৃথিবীতে জুতসই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে দূরদর্শিতাকে কাজে লাগানো, যাতে করে আগের চেয়ে ভালোভাবে নীতিমালা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা যায়। ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সক্ষমতা দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে অগ্রসরমান যুক্তি প্রতিষ্ঠান এবং নীতিমালা প্রণয়নের দিকে চালিত করতে পারে, যা শুধু ঋণদাতাদেরই নয়, সাধারণ নাগরিকদেরও রক্ষা করবে। বিশেষত, অনগ্রসর এবং ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীর দিকে অবশ্যই সতর্ক নজর দিতে হবে। সংকটের আগে যথেষ্ট পরিমাণ সামাজিক নিরাপত্তাবলয় গড়ে তুলতে হবে এবং সংকটের পর তাদের জরুরি প্রয়োজন মেটাতে অবশ্যই দ্রুত সাড়া দিতে হবে। সংকটের আগে একটি অধিক গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, এ ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো বুঝতে আরও বেশি সহায়ক হতে পারে। আবারও, সব পর্যায়ে ভালো গণমুখী শাসনপদ্ধতি প্রয়োজন। যদি একুশ শতককে একটি অধিক সভ্য বৈশ্বিক সমাজ গঠনের পক্ষে অধিক নিরাপদ হতে হয়, তবে এসব গণতান্ত্রিক পূর্বশর্তের দিকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে এবং সাথে সাথে উপযুক্ত প্রায়োগিক উপদেশ গ্রহণ করতে হবে, যা কোনো একজন অর্থনীতিবিদ আংশিকভাবে কোনো একসময় দিতে পারেন। তবে অন্য সমাজবিজ্ঞানীদের এবং প্রকৃত ন্যায়পরায়ণ সমাজসেবীদের এতে সামগ্রিকভাবে অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

অনুবাদ : **গোলাম মুস্তাফা**

তথ্যসূত্র :

১. বিস্তারিত তথ্যনির্দেশ এবং ব্যাখ্যার জন্য নিচে দেখুন।
২. উদাহরণস্বরূপ স্যুর-কনকেইভ এসডব্লিউএফগুলো 'সমতাকাঙ্ক্ষী' এসডব্লিউএফ।
৩. খান (১৯৯৮, ১৯৯৭গ)।
৪. গিলপিন (১৯৮৭ : পৃষ্ঠা. ১৪৫)।
৫. ফক (১৯৯৭, পৃষ্ঠা. ১৯); আরও দেখুন, খান (২০০৪খ)।
৬. হক এবং অন্যান্য (১৯৯৬)।

গ্রন্থপঞ্জি :

Adelman, I. and Robinson, S. (1978*). Income Distribution Policy in Developing Countries: A Case Study for Korea*, Palo Alto: Stanford University Press.

Baker, Dean, Epstein, G. and Pollin, R. (1998) *Globalization and Progressive Economic Policy*, Cambridge, Cambridge University Press.

Barber, B. (1995). *Jihad vs. McWorld*, New York: Random House.

Bonvin, J. (1997). "Globalization and Linkages: Challenges for Development Policy," *Development* 40 (2): 39-42.

Bosier S. (1997). *The Elusive Goal of Regional Development: Between the Black Box and the Political Agenda*. Edificio CEPAL: Stantiago-Chile.

Chang, Ha-Joon(2007*), Institutional Change and Economic Development*, London: Anthem Press.

Cook, P. and Kirkpatrick, C. (1997). "Globalization, Regionalization and Third World Development," *Regional Studies* 31 (1): 55-66.

Falk. R. (1997). "Resisting 'Globalization-from-above' through 'Globalization-from-below'," *New Political Economy* 2 (1): 17-24.

Greenspan, A. (1997). *`Statement Before the U.S. House of Representatives Committee on Banking and Financial Services'*, Washington, D.C. 13 November.

Gills, K. B. (1997). "Editorial: 'Globalization' and the 'Politics of Resistance'," *New Political Economy* 2 (1): 11-15.

Gilpin, R. (1987). *The Political Economy of International Relations*, Princeton: Princeton, New Jersey.

Griffin K. and Khan A. R. (1992). *Globalization and the Developing World: An Essay on the Structural Dimensions of Development in the Post Cold War Era.* UNRISD, Geneva.

Harris, Laurence. (1998). "The Dynamics of Globalization: Eight Skeptical Theses", Paper presented at the UNU/AERC Conference, Tokyo, August 3-4, 1998.

Hirst, P. (1995). *Globalization in Question*, Political Economy Research Centre Occasional Paper Number 11. Sheffield, England: The Political Economy Research Center.

James, J. and Khan, Haider A. (1993). "The Employment Effects of Income Redistribution," *World Development* (March): 817-28.

(1997). "Technolgy Choice and Income Distribution" *World Development*, (February): 153-165.

(1998). *Technological Systems and Development*, London: Macmillan.

Jomo, K.S. (1998). "Introduction: Financial Governance, Liberalization and Crises in East Asia," in *Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalization and Crises in East Asia*. Hong Kong: Hong Kong University Press, pp. 1-23.

Khan, Haider Ali and Yi-bei Liu, (2008), "Globalization and the WTO Dispute Settlement Mechanism: Making a Rule-based Trading Regime Work", http://mpra.ub.uni-muenchen.de/7613/

Khan, Haider A. (2014). Development and Women's Rights as Human Rights: A Political and Social Economy Approach within a Deep Democratic Framework, *Denver Journal of International Law and Policy,* Vol. 42, No. 3(Aug. 2014).

Khan, Haider A. (2013a). Development Strategies: Lessons from the Experiences of South Korea, Malaysia, Thailand and Vietnam, in Augustin K. Fosu ed. *Achieving Development Success*, Oxford University Press, 2013:119-132.

Khan, Haider A. (2013b).Basel III, BIS and Global Financial Governance, *Journal of Advanced Studies in Finance*, Volume IV, Issue 2(8), Winter 2013

Khan, Haider A. (2007), " A Theory of Deep Democracy and Economic Justice in the Age of Postmodernism", http://econpapers.repec.org/paper/tkyfseres/2007cf468.htm

Khan, Haider A. (1998). *Technology, Development and Democracy: Limits to National Innovation Systems in the Age of Postmodernism*, Aldershot, U.K.: Edward Elgar.

..... 2004a, *Innovation and Growth in East Asia: The Future of Miracles*, Macmillan

..... 2004b, *Global Markets and Financial Crisis: Asia's Mangled Miracle*, Macmillan/Palgrave.

..... 2003, "Creating Social Capabilities in a POLIS", in Tom Misa et als. Eds. *Technology and Modernity*, The MIT Press.

..... 1996, "Beyond Distributive Justice in the McWorld", *Global Justice*, Spring/Summer, pp. 30-40.

Khan, Haider A. (1999a) "Corporate Governance of Family Businesses in Asia: What's Right and What's Wrong?" ADBI paper no. 3, Tokyo, 1999.

Khan, Haider A. (1999b) " Corporate Governance in Asia: Which Road to Take?" paper presented at 2nd high level symposium in ADBI, Tokyo

Khan, Haider Ali, 1994, "Does Bilateral Foreign Aid Affect Fiscal Behavior of a Recipient?" Journal of Asian Economies, March

..... 1995a, "Does the Policy-Maker Make a Difference?" paper presented at AEA/ASSA meetings, Washington D.C., January 1995.

..... 1995b, "Does Japan's Aid Work?" unpublished paper, University of Denver.

Khan, Haider A. (1997a), "Does Japanese Bilateral Aid Work? Foreign Aid and Fiscal Behavior in a Bounded Rationality Model," *Regional Development Studies,* Vol. 3 (Winter, 1996/97), pp. 283-97.

Khan, Haider A.(1997b), *Technology, Energy and Development: The South Korean Transition*, Cheltenham: Edward Elgar.

Khan, Haider A.(1997c), African Debt and Sustainable Development, New York: phelps-Stokes Foundation.

Khan, Haider A. (2002a), " Can Banks Learn to Be Rational?", Discussion Paper no. 2002-CF-151, Graduate School of Economics, University of Tokyo.

Khan, Haider A. (2002b), " Corporate Governance: the Limits of the Principal –Agent Model", Discussion Paper, CIRJE, University of Tokyo.

Khan, Haider A. (2002c) "The Extended Panda's Thumb and a New Global Financial Architecture: An Evolutionary Theory of the Role of the IMF and Regional Financial Architectures, Working paper, GSIS, University of Denver.

..... 2002d, "Does Aid Work? Japanese Foreign Aid, Development Expenditures and Taxation in Malaysia: some results from a bounded rationanlity model of fiscal behavior", Journal of the Centre for International Studies, Aichi Gakuin University, Vol. 4, pp. 1-19.

..... 2002e, " What can the African countries learn from the macroeconomics of foreign aid in Southeast Asia ?", Aryeetey, E., Court, J., Nissanke, M. and Weder, B., Asia and Africa in the Global Economy, Tokyo, UNU Press.

Krongkaew, M. (1997). "*An Alternative Interpretation of Economic Policy Determination in Thailand*". Paper presented at the conference on `Asia's Development Experience', Tokyo, December 1-2.

Krugman, P. (1996). *Pop Internationalism*, MIT Press, Cambridge, MA.

Lauridsen, L. S. (1998). "Thailand: Causes, Conduct, Consequences," in Jomo, K.S. ed. *Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalization and Crises in East Asia*, Hong Kong: Hong Kong University Press, pp. 137-157.

McGrew A. (1992). The Third World in the new global order, in Allen T. and Thomas A. (eds.) *Poverty and Development in the 1990s.* Oxford University Press in association with the Open University, Oxford.

Ohmae, K. (1996). *The End of the Nation State*. Harper Collins Publishers: London.

Peraton, J. et al (1997). "The Globalization of Economic Activity," *New Political Economy* 2 (2):257-277.

Sen, G. (1997). "Globalization, Justice and Equity: A gender perspective," *Development* 40(2):21-26.

Siamwalla, A. (1997) "*Can a Developing Democracy Manage Its Macroeconomy?*" The Case of Thailand, Lecture delivered at Queen's University, Kingston, Ontario, Canada on October 15.

Sobhan, R (1989) "The State and Development of Capitalism: The Third World Perspective", in Bharadwaj, K. and S. Kaviraj, eds. *Perspectives on Capitalism*, New Delhi: Sage Publications, pp. 247-258.

Stiglitz, J. 2002. *Globalization and Its Discontents*, New York: Norton

..... 2006. Making Globalization Work, New York: Norton

Straubhaar, T. and Wolter, A. (1997). "Globalization, Internal Labor Markets and the Migration of the Highly Skilled," *Intereconomics* 32 (4): 174-180.

The Economist, "Mahathir, Soros and the Currency Markets: Amoral may be, but Currency Speculators are both necessary and productive" (September 7-October 3, 1997).

The Economist, "One World?" (October 18, 1997a).

Thurow, L. (1996). *The Future of Capitalism: How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's World*. Penguin Books: New York.

Ul, Haq, M., K. Inge and I. Greenberg (eds.) (1996). *The Tobin Tax: Coping with Financial Volatility.* Oxford: Oxford University Press.

Wood, A. (1994). *North-South Trade, Employment and Inequality: Changing Fortunes in a Skill-driven World*. Oxford. Clarendon Press.

Yeung, Y. and Lo, F. (1996). "Global Restructuring and Emerging Urban Corridors in Pacific Asia," in Yeung, Y. and Lo, F. (eds.) *Emerging World Cities in Pacific Asia*. United Nations University: Tokyo.

রাজনৈতিক অর্থনীতি

নব্য উদারনীতিবাদের ত্রুটিগুলো কীভাবে সারাই করা সম্ভব

জেসন হিকেল

সারসংক্ষেপ

অর্থনৈতিক অ্যাকাডেমিক মহলে নব্য উদারনীতিবাদ একটি পরিচিত ধারণা। ব্যাপারটা যেন এমন, দুনিয়ার অর্থনীতি এ ধারাতে চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। পৃথিবী নব্য উদারনীতিবাদী ধারা থেকে কখনো বেরোতে পারবে, বেশির ভাগ মানুষই এটা ভাবতে পারে না। কথা হচ্ছে, ১৯৭০-এর দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নব্য ব্যালান্স অব পেমেন্টের ঘাটতিতে পড়লে রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদেরা তত্ত্ব দেন, কেইনসের অঙ্গীভূত উদারনীতিবাদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাঁরা বললেন, ধনীদের হাতে আরও বেশি করে টাকা তুলে দিতে হবে। তাঁদের সেই টাকা বিনিয়োগের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সেবা খাত বেসরকারীকরণ করতে হবে। ফলে তাঁরা সেখানে যে টাকা বিনিয়োগ করবেন, তার কিয়দংশ চুইয়ে চুইয়ে প্রান্তিক মানুষের হাতে যাবে। এতে তাদের জীবনমান উন্নত হবে। এ লক্ষ্যে রিগ্যান যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ করের হার ৭০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৮ শতাংশে নামিয়ে আনেন, আর ক্যাপিটাল গেইন করের হার কমিয়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনেন, যেটা ছিল মহামন্দা-উত্তর যুগের সর্বনিম্ন। কিন্তু দেখা গেল, এর ফলে মানুষে-মানুষে ব্যবধান অনেক বেড়ে গেল। আয় ও সম্পদের বৈষম্য আকাশ স্পর্শ করল। তবে নব্য উদারনীতিবাদই শেষ কথা নয়। এখান থেকে বেরিয়ে আসার পথও আছে। এই প্রবন্ধে তার একটা রূপরেখাও দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

নব্য উদারনীতিবাদ, অঙ্গীভূত উদারনীতিবাদ, ভোকার-শক, রিগ্যান, বাজারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল, মুদ্রানীতি, শ্রমিক আন্দোলন।

অর্থনীতিতে নিওলিবারেলিজম বা নব্য উদারনীতিবাদ সম্পর্কে মানুষের মনোভাবটা এমন যে এটি যেন খুব স্বাভাবিক ও অনিবার্য ব্যাপার। বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে

এ মনোভাব দেখা যায়, কারণ তাদের অধিকাংশেরই জন্ম ১৯৯০-এর দশকে। ১৯৮০-এর দশকে মার্গারেট থ্যাচার সবাইকে বোঝান, নব্য উদারনীতিবাদের বিকল্প নেই। এখন যেন এটা ঘরের আসবাবের মতো হয়ে গেছে, ডান ও বাম সবাই এটাকে সাধারণভাবে মেনে নিয়েছে। যদিও ব্যাপারটা ঠিক এ রকম ছিল না।

আজকের অর্থনীতিতে যেটা প্রমিত তত্ত্ব হিসেবে গৃহীত হয়েছে, ২০ শতকের বেশির ভাগ সময়জুড়ে সেটা অযৌক্তিক হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হতো। একই রকম নীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা আগেও করা হয়েছে, কিন্তু তা বিপর্যয় বয়ে এনেছে। ফলে তখনকার অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই কেইনসীয় মতবাদ বা একধরনের সামাজিক গণতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করেছেন। সুসান জর্জ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে: 'কথা হচ্ছে, বাজার যে সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবে বা অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সংকুচিত হবে বা করপোরেশনকে একদম পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দেওয়া হবে বা ট্রেড ইউনিয়নের পরিসর ছোট হবে বা নাগরিক অধিকার হ্রাস পাবে—এসব চিন্তা আমাদের সময়ে কারও মাথায়ও আসত না।'

পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিতে উদারনীতিবাদ

নব্য উদারনীতিবাদের গল্পটা শুরু হয় ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দার পর থেকে। অর্থনীতিবিদদের ভাষায়, 'অতি উৎপাদনের সংকট' থেকেই এই মহামন্দা সৃষ্টি হয়। সে সময় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও মজুরি হ্রাসের মাধ্যমে পুঁজিবাদ স্ফীত হচ্ছিল, কিন্তু এতে সমাজে যে গভীর অসমতা সৃষ্টি হয় তাতে মানুষের ভোগ-সক্ষমতা কমে যায়। দেখা গেল, বাজারে প্রচুর পণ্য পড়ে আছে, কিন্তু সেগুলো কেনার লোক নেই। এই সংকট দূর করতে এবং ভবিষ্যতে যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে লক্ষ্যে জন মেইনার্ড কেইনসের নেতৃত্বে অর্থনীতিবিদেরা পরামর্শ দিলেন, পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রকে রাশ টানতে হবে। তাঁরা যুক্তি দিলেন, বেকারত্বের হার কমানোর সঙ্গে মজুরি বাড়িয়ে ও পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করে রাষ্ট্র নিরবচ্ছিন্নভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। এটা আসলে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে একধরনের শ্রেণি সমঝোতা, যেটা ভবিষ্যৎ অস্থিতিশীলতার রাশ টানতে পারে।

এই অর্থনৈতিক মডেলকে 'অঙ্গীভূত উদারনীতিবাদ' হিসেবে অভিহিত করা হতো। অর্থাৎ এটা এমন একধরনের পুঁজিবাদ, যার নাড়ি সমাজেই পোঁতা থাকে, যার গতিপ্রকৃতি রুদ্ধ হয় রাজনৈতিক বিবেচনার দ্বারা। সামাজিক কল্যাণই যার অভীষ্ট। এটা ভদ্রস্থ পারিবারিক আয়ের বিনিময়ে অনুগত, বাধ্য ও উৎপাদনশীল মধ্য শ্রেণির উৎপাদক তৈরি করতে চেয়েছিল, যাদের মৌলিক পণ্য কেনার সামর্থ্য থাকবে। এই নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ঢালাওভাবে অনুসরণ করা হয়। নীতিপ্রণেতারা ভেবেছিলেন, এর মাধ্যমে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ

এড়ানো সম্ভব হবে। ব্যালান্স অব পেমেন্ট ব্যবস্থা মসৃণ করতে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনে তারা ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলেন (যেটা পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও ডব্লিউটিওতে পরিণত হয়)।

১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে শিল্পায়িত দেশসহ উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রেও এই অঙ্গীভূত উদারনীতিবাদ উচ্চ প্রবৃদ্ধি বয়ে আনে। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের শুরুতেই সংকট সৃষ্টি হয়। একদিকে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও আরেক দিকে অর্থনৈতিক স্থবিরতা—এই দুয়ে মিলে বড় ঝামেলাই সৃষ্টি হয়। যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ১৯৬৫ সালে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৩ শতাংশ, সেখানে ১৯৭৫ সালে তা দাঁড়ায় ১২ শতাংশে। অনেকেই এর নানা রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রগতিশীল অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান দুটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমত, ভিয়েতনাম যুদ্ধের খরচের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যালান্স অব পেমেন্ট ঘাটতিতে পড়ে যায়। এটা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে উদ্বিগ্ন আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা ডলার তুলে নিতে শুরু করেন। এতে মূল্যস্ফীতি অনেকাংশেই বৃদ্ধি পায়। নিক্সনের কারণে ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়। যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান খরচ মেটাতে গিয়ে তিনি ১৯৭১ সালে ডলারকে স্বর্ণমান থেকে আনপেগ (বিচ্ছিন্ন) করলে সোনার দাম দ্রুত বৃদ্ধি পায় আর ডলারের দাম পড়ে যায়। দ্বিতীয়ত, ১৯৭৩ সালের তেলসংকটের কারণে জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্থবির হয়ে যায়। ফলে এক স্থবিরতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা এসব কারণ স্বীকার করতে চান না। তাঁরা বলেন, ধনীদের ওপর অতিরিক্ত করারোপ ও অর্থনীতিতে বেশি বেশি নিয়মকানুন আরোপের কারণে এমনটা হয়েছে। সে কারণে তাঁরা দাবি করলেন, অঙ্গীভূত উদারনীতিবাদের সময় শেষ হয়ে এসেছে।

দেখা গেল, এই রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদদের যুক্তি ধনীদের বেশ মনে ধরল। ডেভিড হার্ভে বলেন[১], এই ধনীরা আসলে তখন অঙ্গীভূত উদারনীতিবাদের যুগের পর নিজেদের শ্রেণি ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ এক শতাংশ ধনীর হাতে জাতীয় আয় পুঞ্জীভূত হওয়ার হার ১৬ থেকে কমে ৮ শতাংশে নেমে এসেছিল। যত দিন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেশি ছিল, তত দিন তাদের কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকে যখন প্রবৃদ্ধির গতি কমে গেল ও মূল্যস্ফীতি বেড়ে গেল, তখন তাদের সম্পদও ব্যাপক হারে কমতে শুরু করে। এর প্রতিক্রিয়ায় তারা শুধু নিজেদের আয়ে প্রবৃদ্ধির স্থবিরতার প্রভাব উল্টে দিতেই চাইলেন না, এই সংকটের অজুহাতে তাঁরা অঙ্গীভূত উদারনীতিবাদই ঝেরে ফেলতে চাইলেন।

হ্যাঁ, 'ভোকার শকের' মাধ্যমে তাঁরা সমাধানটিও পেয়ে গেলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ১৯৭৯ সালে পল ভোকারকে ফেডারেল রিজার্ভের

চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেন। শিকাগো স্কুলের অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যানের পরামর্শে ভোকার যুক্তি দিলেন, এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হচ্ছে, সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতির হার কমিয়ে আনা। চিন্তাটি ছিল এমন যে মুদ্রার সরবরাহ কমিয়ে সঞ্চয় উৎসাহিত করতে হবে, আর এর মাধ্যমে মুদ্রার মূল্যমান বাড়াতে হবে। এরপর রিগ্যান ১৯৮১ সালে ক্ষমতায় এলে ভোকারকে পুনর্নিয়োগ দিয়ে সুদের হার এক অঙ্কের ঘর থেকে বাড়িয়ে প্রায় ২০ শতাংশে তুলে আনেন। এতে ব্যাপক মন্দা সৃষ্টি হয়। বেকারত্বের হার ১০ শতাংশের ওপরে চলে যায়, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি হ্রাস পায়। অথচ অঙ্গীভূত উদারনীতিবাদের আমলে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন পুঁজিপতিদের অধিক শোষণ করা থেকে নিবৃত্ত করেছে, যার কারণে সেই মহামন্দা সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণির ওপর ভোকার শকের মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল, কিন্তু এর ফলে মূল্যস্ফীতি কমে আসে।

কট্টর মুদ্রানীতি যদি নব্য উদারনীতিবাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হয়, তাহলে এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাপ্লাই-সাইড অর্থনীতি। রিগ্যান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর লক্ষ্যে ধনীদের হাতে আরও টাকা তুলে দিতে চেয়েছিলেন। ধারণাটি ছিল এ রকম যে তাঁরা এই টাকা উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করবেন, যাতে প্রবৃদ্ধির চাকা সচল হবে, আর তার সুফল চুইয়ে চুইয়ে সমাজের নিম্নকোটির মানুষের কাছেও পৌঁছাবে (যেটা আসলে কাজ করেনি)। এ লক্ষ্যে রিগ্যান যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ করের হার ৭০ থেকে কমিয়ে ২৮ শতাংশে নামিয়ে আনেন, আর ক্যাপিটাল গেইন করের হার কমিয়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনেন, যেটা ছিল মহামন্দা-উত্তর যুগের সর্বনিম্ন। এর আনুষঙ্গিক কাজ হিসেবে রিগ্যান আরও কিছু করেছিলেন, যেটা লোকে ঠিক জানে না, সেটা হলো, তিনি শ্রমিকদের মজুরির ওপরও কর আরোপ করেন। অর্থাৎ তিনি রিপাবলিকানদের কাঙ্ক্ষিত 'সবার জন্য সমান' করের নীতির দিকে অগ্রসর হন। রিগ্যানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তৃতীয় দিকটি ছিল আর্থিক খাতের লাগাম শিথিল করা। কিন্তু ভোকার এ কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালে রিগ্যান ১৯৮৭ সালে অ্যালান গ্রিনসপ্যানকে তাঁর জায়গায় নিয়োগ দেন। গ্রিনসপ্যান মূলত একজন মুদ্রানীতি-বিশেষজ্ঞ। পরবর্তীকালের রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয় দলই তাঁকে কয়েকবার পুনর্নিয়োগ দিয়েছে, ফলে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে আসীন ছিলেন। তাঁর হাত দিয়ে যে নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে শুরু করেছিল, তার ফলেই ২০০৮ সালের আর্থিক সংকট সৃষ্টি হয়, যে সময় ব্যাংকগুলো বন্ধকি সম্পত্তি পুনর্দখল করলে লাখ লাখ মানুষ বাড়িঘর হারায়[২]।

এসব নীতির সম্মিলিত ফলাফল হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসমতার হার এ সময় ব্যাপক হারে বেড়ে যায়, নিচের লেখচিত্রে যা দেখা যাচ্ছে। লেখচিত্র ১-এ

দেখা যায়, ১৯৭৩ সালের ভোকার শকের পর কীভাবে মজুরির হার কমলেও উৎপাদনশীলতা বাড়ে, যার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা বড় অংশ শ্রমিকদের কাছ থেকে পুঁজির মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ প্রবণতাকে আরও জোরদার করার জন্য ১৯৯০-এর দশকে সিইওদের বেতন বাড়ে ৪০০ শতাংশ, যেখানে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ে মাত্র ৫ শতাংশ। আর ফেডারেল ন্যূনতম মজুরি কমে ৯ শতাংশে দাঁড়ায়[৩]। লেখচিত্র ২-এ দেখা যায়, সমাজের উচ্চকোটির মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত জাতীয় আয়ের পরিমাণ ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। সমাজের শীর্ষ এক শতাংশ ধনীর হাতে সম্পদ পুঞ্জীভবনের পরিমাণ ১৯৮০-এর দশকের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে যায়, সে সময় যার পরিমাণ ছিল ৮ শতাংশ, ১৯৯০-এর দশকে তা এসে দাঁড়ায় ১৮ শতাংশে। শুমারির তথ্যানুসারে, ১৯৮০ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ৭২ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যেখানে মধ্যম সারির পরিবারের আয় স্থিতিশীল থাকে আর নিচের দিকের মানুষের আয় ৭ দশমিক ৪ শতাংশ কমে যায়[৪]।



লেখচিত্র-১ : শ্রমিকদের ওপর আঘাত : যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃত আয় ও উৎপাদনশীলতা, ১৯৬০-২০০০ (উৎস : আর পলিন, কন্টোয়ার্স অব ডিসেন্ট, নিউ ইয়র্ক, ভার্সো, ২০০৫)।

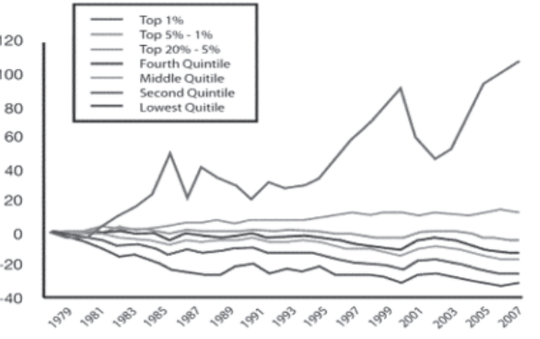

লেখচিত্র-২ : জাতীয় আয়ের বণ্টন, ১৯৭৯-২০০৮ (উৎস : মাদার জোনস ম্যাগাজিন, ইউএস স্যান্সাস ডাটার ওপর ভিত্তি করে)।

কেমব্রিজের অর্থনীতিবিদ হা জুন ব্যাপারটা সঠিকভাবেই বলেছেন, 'ধনী মানুষকে আরও ধনী বানালেই বাকিরা ধনী হয়ে যায় না।' এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বাড়ে না, যেটা কি না সাপ্লাই সাইড অর্থনীতির একমাত্র যুক্তি। বস্তুত, এর বিপরীত ব্যাপারটাই সত্য হিসেবে আবির্ভূত হয়, কারণ নব্য উদারনীতিবাদী অর্থনীতি চালু হওয়ার পর শিল্পায়িত দুনিয়ায় মাথাপিছু আয় ৩ দশমিক ২ থেকে কমে ২ দশমিক ১ শতাংশে নেমে আসে[৫]। এতে বোঝা যায়, নব্য উদারনীতিবাদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু ধনীদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তা দারুণ কার্যকর হয়েছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, নব্য উদারনীতিবাদ যদি এতটাই ধ্বংসাত্মক হয়, তাহলে রাজনীতিকেরা কীভাবে এটা জায়েজ করলেন? এর আংশিক কারণ হচ্ছে, ভোকার শকের পর সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণির ধ্বংস হওয়া। তার সঙ্গে আছে শ্রমিক ইউনিয়নকে 'আসুরিক' ও 'আমলাতন্ত্রিক' আখ্যা দেওয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বামপন্থীদের সমাজতন্ত্র ত্যাগ করা আর 'ভোগবাদকে' মার্কিন নাগরিকত্বের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ করে তোলা। আমরা মার্কিন রাজনীতিতে করপোরেট লবিংয়ের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও ওয়াল স্ট্রিটের সুবিধাভোগী অ্যাকাডেমিক অর্থনীতিবিদদের স্বার্থের দ্বন্দ্বকেও এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, নব্য উদারনীতিবাদকে মার্কিন সত্তার কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ 'ব্যক্তিস্বাধীনতার' নামে বেশ ভালোভাবে বাজারে খাওয়ানো গেছে[৬]। রক্ষণশীল চিন্তক প্রতিষ্ঠান যেমন মন্ট পেরেলিন সোসাইটি, হেরিটেজ ফাউন্ডেশন ও বিজনেস রাউন্ডটেবিল ৪০ বছর ধরে বলে আসছে, বাজারের 'স্বাধীনতার' মাধ্যমেই কেবল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব। তারা মনে করে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ মানেই অবধারিতভাবে সমগ্রতাবাদের দিকে অগ্রসর হওয়া। এই কথার যুক্তি আরও জোরালো হয় তখন, যখন নব্য উদারনীতিবাদের দুই আইকন ফ্রিডরিখ ভন হায়েক ও মিল্টন ফ্রিডম্যান ১৯৭০-এর দশকে অর্থনীতির নোবেল খ্যাত সুইডিশ ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কার পান, যদিও নোবেল ফাউন্ডেশন এই পুরস্কার দেয় না।

আন্তর্জাতিক পরিসরে উদারনীতিবাদ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মতো পশ্চিমা দেশগুলো যখন নব্য উদারনীতিবাদ নিয়ে নিজেদের মতো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে, তখন তারা উত্তর ঔপনিবেশিক দেশগুলোর ওপরও এই মডেল চাপিয়ে দিয়েছে, কখনো খুবই সহিংস রূপে।

আন্তর্জাতিক পরিসরে নব্য উদারনীতিবাদের চর্চা শুরু হয় ১৯৭৩ সালে। সে বছর ওপেকের তেল নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরব রাষ্ট্রগুলোর

বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের হুমকি দেয়, যদি তারা নিজেদের অতিরিক্ত পেট্রোডলার ওয়াল স্ট্রিটের ইনভেস্ট ব্যাংকে না রাখে। তারা সেটা করেছিল। এই টাকা দিয়ে কী করা হবে সে সিদ্ধান্ত ছিল ব্যাংকের ওপর, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে তখন স্থবিরাবস্থা ছিল। ফলে তারা সিদ্ধান্ত নিল, এই টাকা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বেশি সুদে ঋণ দেওয়া হবে, তেলের বাড়তি দামের কারণে যে দেশগুলো মারাত্মক ধাক্কা খেয়েছিল। তখন মূল্যস্ফীতির হারও ছিল অনেক বেশি। ব্যাংকগুলো ভেবেছিল, বিনিয়োগ হিসেবে এটা খুব নিরাপদ হবে। কারণ তারা ভেবেছিল, সরকার তো আর সহজেই ঋণখেলাপি হবে না।

কিন্তু তারা ভুল ভেবেছিল। এই ঋণ যেহেতু মার্কিন ডলারে দেওয়া হয়েছিল, সেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের সুদের হারের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল। ১৯৮০-এর দশকের শুরুর দিকে ভোকার শকের আঘাত লাগলে ও সুদের হার আকাশ ছুঁলে কমজোর উন্নয়নশীল দেশগুলো ঋণ খেলাপ করার পর্যায়ে চলে যায়, যেটা শুরু হয় মেক্সিকোর মাধ্যমে। যেটা আজ 'তৃতীয় বিশ্বের ঋণসংকট' নামে পরিচিত। এই ঋণসংকটের কারণে ওয়াল স্ট্রিটের ব্যাংকগুলো ডুবতে বসেছিল, যার কারণে আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার ভিত্তিও দুর্বল হয়ে যায়। এ রকম সংকট ঠেকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে এল, যাতে মেক্সিকোসহ অন্যান্য দেশ ঋণ শোধ করতে পারে। আইএমএফের উদ্দেশ্য বদলে দিয়ে তারা সেটা করে ফেলে। অতীতে আইএমএফ নিজের টাকা দিয়ে বিভিন্ন দেশকে ব্যালান্স অব পেমেন্টের ঘাটতি মোকাবিলা করতে সহায়তা করত, কিন্তু সেবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইএমএফকে ব্যবহার করে এটা নিশ্চিত করল যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বেসরকারি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে পারে। ডেভিড হার্ভের মতে, ১৯৮২ সাল থেকে শুরু হওয়া সেই পর্যায়ে ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউশনগুলোকে ধীরে ধীরে কেইনসীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করা হয়। এরপর তারা নব্য উদারনীতিবাদী আদর্শের প্রবক্তা হয়ে যায়।

পরিকল্পনাটির এভাবে কাজ করার কথা ছিল: আইএমএফ উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেবে এই শর্তে যে তাদের কিছু 'কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি' বাস্তবায়নের ব্যাপারে সম্মত হতে হবে। এতে বৈপ্লবিক উপায়ে বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয় এই ধারণার ভিত্তিতে যে এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থনীতির দক্ষতা বাড়িয়ে দেবে, ফলে প্রবৃদ্ধির গতি বাড়বে ও তারা ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবহন খাতে সরকারের ভর্তুকি কমিয়ে, সরকারি খাতকে বেসরকারি খাতে তুলে দিয়ে, শ্রমের ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে, সম্পদ ব্যবহার, বাণিজ্যের শুল্ক কমিয়ে 'বিনিয়োগের সুযোগ' তৈরি ও ভোক্তা বাজার তৈরি করার মাধ্যমে তারা এটা করল। তারা মূল্যস্ফীতির

হার কম রাখারও চেষ্টা করল, যাতে আইএমএফের কাছে তৃতীয় বিশ্বের ঋণ শেষ না হয়, যদিও এতে প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারের সামর্থ্য কমে যায়। এসব নীতির অনেকগুলোই করা হয়েছিল বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষায়, যাদের সরকারি সম্পদ কেনা, সরকারি নিলামে অংশগ্রহণ ও ইচ্ছামাফিক মুনাফা নিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

ওদিকে বিশ্বব্যাংক উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর এই নব্য উদারনীতিবাদ চাপিয়ে দেয়। তারা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য এসব দেশকে ঋণ দেওয়ার শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয় যে ঋণগ্রহীতা দেশকে বাজার উদারীকরণ করতে হবে (১৯৮০-এর দশকে এই ব্যাপারটা ঘটেছে)। অন্য কথায়, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ সার্বভৌম রাষ্ট্রের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই ঋণকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাও বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে হাত মেলায়। তারা নাফটার মতো দ্বিপক্ষীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পশ্চিমা বাজারে ঢোকার সুযোগ পাওয়ার জন্য শর্ত দেয় যে, তাদের শুল্ক হার কমাতে হবে। এতে উন্নয়নশীল দেশের স্থানীয় শিল্প বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কথা হচ্ছে, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকে ভোট প্রদানের ক্ষমতা নির্ধারিত হয় প্রতিটি দেশের মালিকানার ভিত্তিতে, ঠিক যেমন করপোরেশনে হয়ে থাকে। সেখানে বড় সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ৮৫ শতাংশ ভোট লাগে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় প্রতিষ্ঠানেরই ১৭ শতাংশ মালিকানা ধারণ করে। ফলে তার হাতে কার্যত ভেটো প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে। আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ভোট প্রদানের ক্ষমতা নির্ধারিত হয় বাজারের আকার দিয়ে। ফলে ধনী দেশগুলো সব সময়ই নিজেদের সূচি বাস্তবায়ন করতে পারে। গরিব দেশ যদি বাণিজ্যের নিয়ম ভাঙে, তাহলে ধনী দেশগুলো কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সে দেশের অর্থনীতি ভেঙে দিতে পারে।

আসলে বিশ্বায়নের নব্য উদারনীতিবাদী যুগের চূড়ান্ত ফলাফল হচ্ছে, বেশির ভাগ দেশের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলো যেহেতু 'সবচেয়ে ভালো' বাণিজ্য পরিবেশ খোঁজার জন্য সারা পৃথিবী চষে বেড়াতে পারে, ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সস্তা শ্রম নিয়ে হাজির হতে হয়। এমনকি সেসব দেশে এসব করপোরেশনকে দীর্ঘদিনের জন্য কর ছাড় দিতে হয়। কিন্তু এই নব্য উদারনীতিবাদ গরিব দেশগুলোকে সাহায্য না করে বরং তাদের একরকম ধ্বংস করেছে। ১৯৮০-এর দশকের আগ পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোর মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩ শতাংশ। কিন্তু নব্য উদারনীতিবাদের যুগে এসে তা দাঁড়াল ১ দশমিক ৭ শতাংশে[৭]। সাবসাহারা অঞ্চলে ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে মাথাপিছু আয় বাড়ার হার ভালোই ছিল, ১.৬ শতাংশ, কিন্তু নব্য উদারনীতিবাদের যুগে এসে তা দাঁড়ায় ০.৭ শতাংশে। আর এই নব্য উদারনীতিবাদের কাঠামোগত

সমন্বয়ের যুগে আফ্রিকার দেশগুলোর জিএনপি ১০ শতাংশ কমে যায়[৮]। ফলে ১৯৮০-এর দশক থেকে দারিদ্র্যের মৌলিক কাঠামোতে থাকা দেশের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে যায়[৯]। লেখচিত্র ৩-এ দেখা যায়, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতেও সেটা কীভাবে ঘটেছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম ইস্টারলি দেখিয়েছেন, একটি দেশ যত কাঠামোগত সমন্বয় ঋণ নিয়েছে, ততই তার অর্থনীতির পতনের আশঙ্কা বেড়েছে[১০]।

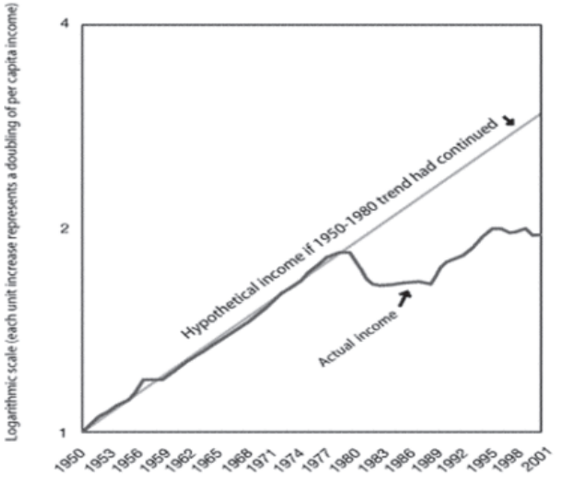

লেখচিত্র-৩ : লাতিন আমেরিকার মাথাপিছু আয়ের সূচক- প্রকৃত হিসাব ও প্রবণতা, ১৯৫০-২০০৩ (উৎস : ডব্লিউ ইস্টারলি, দ্য হোয়াইট ম্যান'স বার্ডেন, লন্ডন, পেঙ্গুইন, ২০০৬)।

এটা যে হয়েছে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এখানে এক বড় দ্বৈত নীতি চলছে : পশ্চিমা নীতিপ্রণেতারা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বলছে, প্রবৃদ্ধির জন্য তাদের অর্থনীতিকে উদার করতে হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, পশ্চিম নিজে যখন অর্থনীতিকে সংহত করেছে, তখন সে এ কাজ করেনি। কেমব্রিজের অর্থনীতিবিদ হা-জুন চ্যাং দেখিয়েছেন, আজকের সব ধনী দেশই একসময় নিজের অর্থনীতিকে সুরক্ষা দিয়ে উন্নত হয়েছে। বস্তুত, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একসময় দুনিয়ার সবচেয়ে আগ্রাসী সুরক্ষাবাদী রাষ্ট্র ছিল। তারা সরকারের ভর্তুকি, বাণিজ্য শুল্ক, সীমিত পেটেন্ট নীতি গ্রহণ করেছিল, যেটা আজকের নব্য উদারনীতিদবাদ একদম খারিজ করে দেয়। উইলিয়াম ইস্টারলি বলেছেন, কিছু কিছু অপশ্চিমা দেশ যেমন : জাপান, ভারত, চীন, তুরস্ক ও পূর্ব এশিয়ার 'বাঘ' বলে পরিচিত দেশগুলো একদম সোজাসাপটা মুক্তবাজার অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ না করলেও বেশ ভালো করেছে।

অর্থাৎ মোদ্দা কথা হলো, নব্য উদারনীতিবাদ আসলে ধনী দেশগুলোর স্বার্থে মুক্তবাজারের নীতিকে খুব সুনির্দিষ্ট উপায়ে ব্যবহার করা। যেমন মার্কিন নীতিপ্রণেতারা মুক্তবাজারের নীতি তখনই গ্রহণ করেন, যখন করপোরেশনগুলোকে বিদেশের সস্তা শ্রম শোষণ ও দেশের অভ্যন্তরীণ ইউনিয়নকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখানোর সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অন্যদিকে ডব্লিউটিও যখন তাদেন কৃষিতে বিপুল ভর্তুকি দেওয়ার নীতি বাদ দিতে বলে, তখন তারা সেটা শোনে না। এ কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো প্রতিযোগিতার সুবিধা নিতে পারছে না। তারা এটা করবে না, কারণ তাহলে তা বড় করপোরেশনগুলোর স্বার্থের বিপক্ষে যাবে। ২০০৮ সালে আর্থিক খাতে সংকটের পর ব্যাংকগুলোকে যে বেইল আউট করা হলো, সেটা তাদের দ্বৈত নীতির আরেকটি নজির। প্রকৃত মুক্তবাজারে ব্যাংকের সমস্যা নিজেকেই মেটানোর কথা। আবার কখনো কখনো নব্য উদারনীতিবাদের অর্থ হলো, ধনীদের জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ আর গরিবদের জন্য মুক্তবাজার। আসলে নব্য উদারনীতিবাদের কারণে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয়, তার অনেকগুলোই বাজার নীতির দ্বারাই সমাধান করা সম্ভব। জার্মানি যে কাজটা করে থাকে। তারা অরডোলিবারেলিজম নামের এক নীতি প্রণয়ন করেছে, যার মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে হস্তক্ষেপ করে একচেটিয়াতন্ত্র রোধ করে এবং ছোট ও মাঝারি আকারের উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে।

কথা হচ্ছে, এই নব্য উদারনীতিবাদী বিশ্বায়নের কারণে বিশ্বের ধনীতম দেশগুলোতে বসবাসরত এক-পঞ্চমাংশ জনগণ ও দরিদ্রতম দেশগুলোতে বসবাসরত এক-পঞ্চমাংশ জনগণের মধ্যকার আয়ের বৈষম্য ব্যাপক হারে বেড়েছে, ১৯৮০ সালে যেটা ছিল ৪৪:১, ১৯৯৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৪:১১১। লেখচিত্র ৪-এ এই প্রবণতা দেখা যায়। আর আজ এই নীতির কারণে দুনিয়ার ৩৫৮ জন শীর্ষ ধনী ব্যক্তির হাতে ৪৫ শতাংশ গরিব মানুষের সম্পদ জড়ো হয়েছে। আরও মারাত্মক ব্যাপার হলো, বিশ্বের শীর্ষ তিন ধনী ব্যক্তির হাতে সবচেয়ে অনুন্নত দেশগুলোর সম্মিলিত সম্পদের সমপরিমাণ সম্পদ রয়েছে, অর্থাৎ ৬০০ মিলিয়ন মানুষের সম্পদ আছে তাদের হাতে[১২]। আজ বিশ্বের শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর হাতে ৪০ শতাংশ সম্পদ, আর ১০ শতাংশের হাতে আছে ৮৫ শতাংশ সম্পদ। আর নিচের কোটির ৫০ শতাংশের হাতে বিশ্বের মাত্র ১ শতাংশ সম্পদ রয়েছে[১৩]।

হ্যাঁ, নব্য উদারনীতিবাদ ধনীদের গরিবদের সম্পদ চুরি করার সুযোগ দিয়েছে। গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির এক সমীক্ষা অনুসারে, ১৯৭০-এর দশক থেকে এ পর্যন্ত বহুজাতিক কোম্পানিগুলো শুধু আফ্রিকা থেকেই ট্রান্সফার প্রাইসিং ও কর ফাঁকির মাধ্যমে ১.১৭ ট্রিলিয়ন ডলার চুরি করে নিয়ে গেছে।

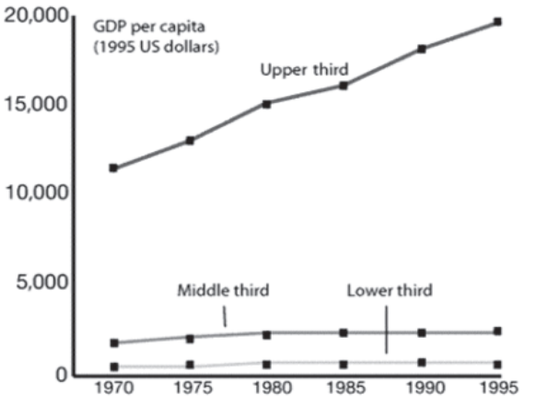

লেখচিত্র-৪ : ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর আয় বৈষম্য, ১৯৭০-১৯৯৫ (বিশ্বব্যাংক বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯৯৯/২০০০)

আরেকটি বিশ্ব নির্মাণ সম্ভব

মোদ্দা কথা হলো, কিছু সুনির্দিষ্ট মানুষ নব্য উদারনীতিবাদী অর্থনৈতিক মডেল তৈরি করেছিল। ফলে মানুষই তা ভেঙে ফেলতে পারে।

২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের পর থেকেই নব্য উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। এই সংকটের মধ্য দিয়ে শুধু শিথিল নিয়ন্ত্রণের সংকটই উন্মোচিত হয়নি, রক্ষণশীল নীতিপ্রণেতারা এই সংকট কাজে লাগিয়ে 'ঘাটতি কমানোর' নামে অভূতপূর্ব কৃচ্ছ্রসাধনের নীতির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। যেমন : স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, গৃহায়ণ ও অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচির বরাদ্দ ব্যাপক হারে কমানো হয়েছে (যেখানে করদাতাদের ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার বেসরকারি ব্যাংককে দেওয়া হয়েছে)। এটা শুধু যুক্তরাষ্ট্রে নয়, সারা ইউরোপেই চলছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট, স্পেন ও গ্রিসে 'ইনডিগনাদোস'-এর মতো আন্দোলন যে গড়ে উঠেছে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। একই কথা গত ৫০ বছরের মধ্যে ব্রিটেনের ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন ও শ্রমিক বিক্ষোভের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও ডব্লিউটিওর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে গণতান্ত্রিক করতে হবে, যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। জোসেফ স্টিগলিৎসকে তো এসব প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করার জন্য বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদের পদ থেকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সব ঋণ মওকুফ করে দিতে হবে, যাতে ধনী দেশগুলো গরিব দেশের ওপর ছড়ি ঘোরানোর সুযোগ না পায়। তৃতীয়ত, বিদেশি সাহায্য ও উন্নয়ন ঋণ দেওয়ার জন্য গয়রহভাবে/ঢালাওভাবে কাঠামোগত

সমন্বয়ের শর্ত বাদ দিতে হবে। এটা বুঝতে হবে যে প্রতিটি দেশের নিজস্ব চাহিদা রয়েছে। চতুর্থত, প্রতিটি দেশের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে, যাতে মজুরির 'ক্রমহ্রাস' বন্ধ করা যায়। পঞ্চমত, প্রতিটি দরিদ্র দেশকে নব্য উদারনীতিবাদের যুগের আগের প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের সুযোগ দিতে হবে, যার জন্য তাদের আমদানি শুল্ক, ভর্তুকি, নিম্ন হারের আর্থিক ঘাটতি, নিম্ন সুদের হার, ট্রান্সফার প্রাইসিংয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও নতুন শিল্পে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ প্রভৃতি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দিতে হবে।

শেষমেশ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আমাদের স্বাধীনতার ধারণা পুনরুদ্ধার করতে হবে। নব্য উদারনীতিবাদের স্বাধীনতার ধারণা হলো, বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিলের ধারণা, যেটা আসলে ধনীদের সম্পদ আহরণের সুযোগ ব্যতীত কিছু নয়। আমাদের নতুন করে স্বাধীনতার ধারণা লাভ করতে হবে, যা আমাদের অর্থনীতিকে কাজে লাগিয়ে সুনির্দিষ্ট সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে নিয়ে যায়, যার সুফল গণতান্ত্রিকভাবে বণ্টন হয়, আর সবাই যাকে অনুমোদন করে।

তথ্যসূত্র :

১. Harvey, David. 2005. *A Brief History of Neoliberalism.* London: Oxford University Press.

২. Stiglitz, Joseph. 2010. *Freefall*. New York: W.W. Norton & Co.

৩. *Executive Excess 2006*, the 13th annual CEO compensation survey from the Institute for Policy Studies and United for a Fair Economy.

৪. U.S. Census Bureau, Historical Income Tables: Families.

৫. Chang, Ha-Joon. 2007. *Bad Samaritans: The Guilty Secrets of Rich Nations and the Threat to Global Prosperity*. London: Random House. Pg. 26.

৬. Hickel, Jason and Arsalan Khan. 2012. "The Culture of Capitalism and the Crisis of Critique," *Anthropological Quarterly* 85(1).

৭. Chang. 2007. Pg. 27.

৮. Chang. 2007. Pg. 28.

৯. World Bank. 2007. *World Development Indicators*.

১০. Easterly, William. 2007. *The White Man's Burden.* Penguin Books.

১১. United National Development Programme. 1999. *Human Development Report 1999: Globalization with a Human Face*. New York. P. 38.

১২. Milanovic, Branko. 2002. "True World Income Distribution, 1988 and 1993." *Economic Journal*, 112(476).

১৩. United Nations University. 2009. *2008 Annual Report*.

নিউ লেফট প্রজেক্ট.অর্গ থেকে নেওয়া।

অনুবাদ : **প্রতীক বর্ধন**

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব

বাংলাদেশে গণতন্ত্র : এলিট বনাম জনগণ

বদরুল আলম খান

সারসংক্ষেপ

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিমানুষ ও নেতৃত্বের ভূমিকা আর্থসামাজিক পূর্বশর্তের চেয়ে কম নয়। একই সঙ্গে জনগণ এবং ব্যক্তিকে সংগঠিত করে যে রাজনৈতিক দল, তার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রকে অনেক সময় এলিট শ্রেণি এবং জনগণের মধ্যে একধরনের ঠান্ডা লড়াই বা যাকে বলে *টাগ অব ওয়ার* বোঝায়। এলিট শ্রেণি স্বেচ্ছায় গণতন্ত্রের পক্ষশক্তি হয় না। গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করে নিতে হয় এবং সেখানে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জনগণের ভূমিকা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে তাত্ত্বিক বিতর্ক আছে। একদিকে জোসেফ সুম্পিটার বা রবার্ট ডালের মতো তাত্ত্বিকেরা জনগণের ভূমিকাকে সীমিত রাখার পক্ষে মত দেন। অন্যদিকে ধ্রুপদি তত্ত্ব থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেকে জনগণের ভূমিকাকে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসেবে ভাবেন। বাংলাদেশে ব্যক্তি বা দলীয় নেতৃত্বের ভূমিকায় মিশ্র সাফল্য লক্ষণীয়। রাজনৈতিক দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেখানে বড় মাপের সংস্কারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার প্রতি তেমন কোনো উৎসাহ লক্ষ করা যায় না। সিভিল সমাজের ভূমিকাও প্রশ্নবোধক। তারা মূলত আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রবক্তা এবং দলীয়করণের দোষে দুষ্ট। সব মিলিয়ে গণতন্ত্রের ভাগ্য বাংলাদেশে এখনো তেমন সুপ্রসন্ন নয়।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

সিভিল সমাজ, গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত, এলিট শ্রেণি, জনগণ, জোসেফ সুম্পিটার, রুশো, লাতিন আমেরিকা।

ভূমিকা

যে বিশেষ ধরনের গণতন্ত্র বাংলাদেশে আজ বহাল আছে তার হালচিত্র নিয়ে এই প্রবন্ধটি লেখা। স্বাধীনতা লাভের পর ৪৫ বছর পার হলেও গণতন্ত্র আমাদের দেশে অসুস্থতায় ভুগছে। এমন কিছু বস্তুগত পূর্বশর্ত আছে যেগুলো গণতন্ত্রের জন্য

জরুরি হলেও বাংলাদেশ সেগুলো পূরণ করে না। ওই পূর্বশর্তগুলো কেন বস্তুগত তার কারণ হচ্ছে সেগুলো সমাজের আর্থসামাজিক অগ্রগতির পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অন্তত পরোক্ষভাবে। বস্তুগত পূর্বশর্তের মধ্যে আর্থসামাজিক উন্নয়নকে মুখ্য ধরা হয়ে থাকে। সামন্তবাদী এবং অনুন্নত আর্থসামাজিক কাঠামোকে গণতন্ত্রের জন্য কেউ উপযোগী ভাবে না। অথচ ওই ধরনের সামন্তবাদী কাঠামো বাংলাদেশে বিরাজ করছে। আরও কিছু পূর্বশর্ত আছে, যেগুলো আর্থসামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়। কিন্তু গুরুত্বের বিচারে তাদের ভূমিকাকে লঘু ভাবা যায় না। তার মধ্যে একটি হচ্ছে উদারনীতির বিকাশ। একে অপরের প্রতি উদার না হলে নাগরিক সমাজে নানা মতের প্রসার ঘটে না। ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ভিন্নমত মেনে নেওয়ার সংস্কৃতি গড়ে না উঠলে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়। উদারবাদী মানসিকতা সমাজে এমনিতেই জন্ম নেয় না। তার বিকাশে সর্বজনীন শিক্ষার বিকাশ, মুক্ত মনের প্রসার, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেও উপেক্ষা করা যায় না। রাষ্ট্রের পক্ষে নানা আইন প্রবর্তন করে উদারনীতির প্রসার ঘটানো সম্ভব হলেও সেসব উদ্যোগ আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় বর্তমানে হয় অনুপস্থিত নতুবা পুরোমাত্রায় নেই।

উদারনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা প্রায় বলা হয়। মধ্যবিত্ত বলতে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, পেশাজীবী গোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক কর্মীদের বোঝানো হলেও বাংলাদেশে তাঁদের অবদান প্রশ্নসাপেক্ষ। সিভিল সমাজ নামে যাঁরা রাষ্ট্র বা রাজনীতির উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে জনগণের পক্ষে কথা বলেন এবং গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসেবে যাঁরা পরিচিত তাঁদের ভূমিকাও আজ প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক অবস্থান পরিহার করে তাঁরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতি বিচার করতে অভ্যস্ত নন। সিভিল সমাজের মধ্যে অনেকে নব্য উদারনৈতিক পুঁজিবাদী কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। স্থানীয় পর্যায়ে ওই কেন্দ্রের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা গণতন্ত্রের কথা বলেন। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য বা নীতিগত অবস্থানের প্রতি মানুষের তেমন কোনো আস্থা নেই। সে কারণে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁদের যথাযথ ভূমিকা পালন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই দুই পূর্বশর্ত আমাদের দেশে অনুপস্থিত কেন তার কারণ ঐতিহাসিক। উত্তরাধিকারসূত্রে সেগুলো আমরা আমাদের হাতে পেয়েছি। অনুন্নত আর্থসামাজিক কাঠামো কেন আজও টিকে আছে বা কীভাবে আমাদের হাতে এল তার কারণ খুঁজতে ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস ঘাঁটতে হয়। ব্রিটিশ শাসন এবং পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানি শোষণ ও অত্যাচারের ইতিহাস উল্লেখ না করে সেটি বোঝা কঠিন। কেন পর্যাপ্ত পরিমাণে গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা আমাদের নেই, তার কারণও

ঐতিহাসিক। পাকিস্তান আমলে গণতন্ত্রের চর্চার কোনো সুযোগ আমাদের ছিল না। কেন উদারনীতির বিকাশ ঘটেনি সেটিও ওই ঐতিহাসিক কারণের সঙ্গে যুক্ত। অনুন্নত আর্থসামাজিক কাঠামো এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির সঠিক ভূমিকার অভাবে এই ঘাটতিগুলো সৃষ্টি হয়েছে এবং যে কারণেই হোক সেগুলো আমাদের আজকের জীবনের বাস্তবতা হয়ে আছে। এসব পূর্বশর্ত দ্রুত পূরণ করা কঠিন। সেগুলো পূরণের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। প্রশ্ন হচ্ছে, দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে ওই পূর্বশর্ত পূরণ করে গণতন্ত্রের চিন্তাভাবনা কতটুকু যৌক্তিক। যদি যৌক্তিক না হয় তাহলে তার বাইরে ভিন্ন কোনো বিকল্প পথ আছে কি না সেটি বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

আর্থসামাজিক পূর্বশর্ত ছাড়াই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব

পূর্বশর্ত-সংক্রান্ত একটি শক্তিশালী অবস্থান হচ্ছে, পূর্বশর্তের অভাবে গণতন্ত্র আটকে থাকে না এবং তাকে গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য ভাবাও ঠিক নয়। নানা উদাহরণ দিয়ে সেটি আমরা বোঝাতে পারি। দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ দীর্ঘকাল ধরে কোনো গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়নি। সেখানে বর্ণবাদী শাসন বলবৎ ছিল, যা কিনা কঠোর শোষণনীতির ওপর গড়ে উঠেছিল। সেখানে মানুষের বাকস্বাধীনতা হরণ করে গোটা জাতিকে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নেলসন ম্যান্ডেলার মতো সংগ্রামী নেতার পক্ষে ওই বর্ণবাদী সমাজে গণতন্ত্রের প্রাথমিক ভিত গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। সমাজ উদার না হলে গণতন্ত্র আসবে না, সেটিও ঠিক না। গোটা ভারতবর্ষে উদারনীতির বিকাশ সমানভাবে ঘটেনি। ভারত একধরনের বর্ণবাদভিত্তিক সমাজ হওয়া সত্ত্বেও প্রায় সত্তর বছর ধরে গণতন্ত্র সেখানে সফলভাবে টিকে আছে। বাংলাদেশের কিছু উদাহরণও এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। ২০০৬ সালে ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী সমর্থিত যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে, সে সরকার গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার যথার্থভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। তারা নিরপেক্ষ ভোটার তালিকা তৈরি করে। জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রথা চালু করে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর জন্য দেশকে পর্যাপ্ত পরিমাণ উদার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাহীনতা বা উদারনীতির ঘাটতিকে কারণ হিসেবে ব্যবহার করা সে কারণে ঠিক নয়।

আর্থসামাজিক বা আরও অন্যান্য পূর্বশর্তের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আমাদের মতো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু সেখানে চাই গান্ধী, নেহরু বা নেলসন ম্যান্ডেলার মতো মানুষ। যেখানে বস্তুগত পূর্বশর্তের অভাব আছে সেখানে এ ধরনের

নেতৃত্ব গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে পারে। সে কারণে তাকে আমরা পূর্বশর্ত হিসেবেও দেখতে পারি। এই পূর্বশর্তটি বস্তুগত নয়। এটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কারণ পূর্বশর্তটি ব্যক্তিমানুষের গুণাবলির সঙ্গে, রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভুক্ত নেতা বা কর্মীর কার্যকলাপের গুণগত মানের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে গুণগত দিক দিয়ে উচ্চ মানসম্পন্ন নেতৃত্ব বা সাচ্চা কর্মী নিয়ে গঠিত রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কী হবে তার ওপর বিশেষ প্রভাব রাখতে পারে। এটি নানা দেশের অভিজ্ঞতায় লক্ষ করা যায়। স্যামুয়েল হান্টিংটনও তার *দ্য থার্ড ওয়েভ* প্রবন্ধে নেতৃত্বের ভূমিকাকে মূল্যায়ন করে লিখেছেন, 'economic development makes democracy possible; political leadership makes it real' (1991:33)। এর কারণ রয়েছে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে একক ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব হলেও গোষ্ঠী বা সংগঠনের বিকাশ সেভাবে ঘটেনি। সে কারণে সংগঠনগতভাবে রাজনৈতিক দল দুর্বল হলেও ব্যক্তির ভূমিকা ওই দুর্বলতাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুষিয়ে নিতে পেরেছে।

গণতন্ত্রের বিকাশে ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ—এই চিন্তাধারা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল ১৯৯১ সালে সোভিয়েত এবং মার্কিনদের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। ঠান্ডা লড়াই শেষ হওয়ার পর নানা দেশ পূর্বশর্তের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়া, অন্যান্য সোভিয়েত রিপাবলিক, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশ অন্তর্ভুক্ত। স্বৈরশাসন বা একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বদলে ওই সব দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। নির্বাচিত প্রতিনিধি দিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনার প্রথা শুরু হয়। এই গণতান্ত্রিক প্রথা মোটামুটি নির্বিঘ্নে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ধরে নেওয়া হয়েছিল আর্থসামাজিক বা রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পূর্বশর্ত ছাড়াই এলিট শ্রেণির সম্মতির ভিত্তিতে একটি দেশ গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে পারে। বস্তুগত পূর্বশর্তের অভাব সত্ত্বেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনেক উদাহরণ রয়েছে। তার মধ্যে চিলি ও পেরু অন্তর্ভুক্ত। এই দুই দেশ শিল্পায়িত না হয়েই অর্থাৎ আর্থসামাজিক পূর্বশর্ত পূরণ না করেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। শিল্পায়নের অভাব সেখানে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে ব্যাহত করেনি। খনিজ সম্পদ রপ্তানি করে ওই দুই দেশ আধুনিকায়নের পথে অগ্রসর হয়। কলকারখানা তৈরির প্রয়োজন হয়নি। প্রয়োজন হয়নি শিল্পায়নের (Pinkney 2003: 66)। তবে চিলির ক্ষেত্রে ব্যাপারটি কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। চিলির গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনেক আগে থেকেই ছিল। সেটি তার গণতন্ত্রায়ণে কিছুটা হলেও সাহায্য করেছে।

আরও অনেক দেশের উদাহরণ আছে যেখানে শিল্পায়ন নয়, বরং কৃষির আধুনিকায়ন ঘটিয়ে গণতন্ত্র এসেছে। তার উদাহরণ হচ্ছে ব্রাজিল। ব্রাজিলের এই

উদাহরণ গণতন্ত্রের সনাতনী একটি তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করে। ওই তত্ত্বের দাবি ছিল কৃষিভিত্তিক কোনো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না। অথবা সম্ভব হলেও কঠিন। এসব উদাহরণের ভিত্তিতে বলা যায় যে শিল্পায়নের সঙ্গে যে সামাজিক পরিবর্তন জড়িত, সেগুলো গণতন্ত্রের জন্য পুরোমাত্রায় আবশ্যক ভাবা ঠিক নয়।

গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকা নানা বিচিত্র পথে আসতে পারে। তার নানা উদাহরণ আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখি। দেখা গেছে, কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে কোনো দেশের ওপর গণতন্ত্রকে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সেটি সম্ভব হয়েছে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রনায়ক অথবা রাজনৈতিক দলের দূরদর্শিতার কারণে। তার একটি উদাহরণ হচ্ছে জাপান। শক্তি বা ভয়-ভীতি দেখিয়েই হোক আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজয়ের কারণেই হোক, বস্তুগত পূর্বশর্তের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও জাপানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি, অন্যদিকে সম্রাটের শাসন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের আবছায়ায় জাপানে গণতন্ত্রের কথা ভাবা কঠিন ছিল। কিন্তু তারপরও সেখানে গণতন্ত্র এসেছে ব্যক্তিবিশেষের দূরদর্শিতার কারণে। সে দেশের এলিট গোষ্ঠী এক পা এগিয়ে গিয়ে গণতন্ত্রকে স্বাগত জানিয়েছিল। সানফ্রানসিসকো শহরে ১৯৫১ সালে জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে জাপান অনেকটা বাধ্য হয়ে জাতীয় ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সম্রাটের প্রবল আধিপত্য এবং প্রভাবকে উপেক্ষা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। জাপানের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র মার্কিনরাই লিখে দিয়েছিল। সেটি আমরা অনেকেই হয়তো জানি না। সেই শাসনতন্ত্র অনুসরণ করে জাপান বিগত সত্তর বছর ধরে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিত। এই চাপিয়ে দেওয়ার কারণ বহুবিধ হতে পারে। জাপানের ক্ষেত্রে ঠান্ডা লড়াই বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে একধরনের ভূকৌশলগত প্রাধান্য লাভ করতে চেয়েছিল। তবে সেটি বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে পূর্বশর্তের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। জাপানের উদাহরণ থেকে সেটি আমরা দেখতে পাই।

এই চাপিয়ে দেওয়ার আরও উদাহরণ রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর (জুলাই ২৭, ১৯৫৩ সালে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তি, অর্থ এবং রাজনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করেছিল এবং নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সে দেশও গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে গেছে। ওই একই দাবি করা সম্ভব তাইওয়ানের ক্ষেত্রে। সেখানেও গণতন্ত্র এসেছে পূর্বশর্তের অনুপস্থিতিতে। ভূকৌশলগত কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে নানা ধরনের উন্নতমানের প্রযুক্তি সাহায্য দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর অনুদানও তাইওয়ানের জন্য

বরাদ্দ করা হয়। নানা বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে তাইওয়ান আজ গণতান্ত্রিক দেশ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অতিশয় উন্নত। তুরস্কের ক্ষেত্রেও ওই চাপিয়ে দেওয়ার উদাহরণ আছে। দেশ হিসেবে তুরস্ক এশিয়া এবং ইউরোপের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। কিন্তু অর্থনৈতিক সুবিধার কারণেই হোক আর ইউরোপের সদস্য হওয়ার গৌরববোধ থেকেই হোক, সে দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে চায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের শর্ত হচ্ছে সদস্যপদ পেতে হলে তুরস্ককে গণতান্ত্রিক দেশ হতে হবে, মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে। এই ধরনের বহিঃচাপ কেবল ইউরোপ থেকে আসে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ইদানীং তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতিমালায় গণতন্ত্রকে পূর্বশর্ত হিসেবে ধরে নেয়। সেটিও একধরনের চাপিয়ে দেওয়া বৈকি। ওই চাপ বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও রয়েছে, যদিও পরোক্ষভাবে।

যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আমাদের মতো যেসব দেশে বস্তুগত পূর্বশর্তের অভাব রয়েছে, সেখানে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে ব্যক্তির ভূমিকার ওপর। ব্যক্তির ভূমিকা বলতে বোঝা উচিত নেতা এবং নেতৃত্বের ভূমিকাকে, রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক অবস্থা বা তার আদর্শকে। তার অর্থ হচ্ছে যে ঘাটতি বস্তুগত পূর্বশর্তের অভাবের কারণে সৃষ্টি হয় সেটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ফ্যাক্টরের বর্ধিত ভূমিকা দিয়ে পূরণ করা সম্ভব। প্রায় সব সমাজে বস্তুগত পূর্বশর্তের কিছু না কিছু ঘাটতি থাকে। এমন কোনো রাষ্ট্র বা সমাজ নেই যেখানে বস্তুগত পূর্বশর্তগুলো পুরোমাত্রায় পূরণ করা সম্ভব। সেই ঘাটতি আমাদের সমাজে দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক বেশি। কিন্তু তারপরও কেন বাংলাদেশ রাজনৈতিকভাবে আজও ঐক্যবদ্ধ সমাজে পরিণত হতে পারেনি সে প্রশ্নের উত্তর রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা বা অনীহা থেকে সৃষ্ট বলে ধরে নিতে সংকোচ করা উচিত নয়। নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে নিরপেক্ষ করার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা রাজনৈতিক দলের ঘাড়ে চাপে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কেন গণকল্যাণমুখী নয় সেটি কোনো ঐতিহাসিক কারণ দিয়ে বোঝানো যাবে না। আংশিকভাবে হলেও তার উত্তর খুঁজতে হবে জনপ্রতিনিধিদের আচরণে, জনগণের প্রতি তাদের নির্লিপ্ত ভূমিকায়, তাদের মধ্যযুগীয় এবং ঔপনিবেশিক স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতায়। এই ত্রুটিগুলো গণতন্ত্রের বস্তুগত পূর্বশর্তের সঙ্গে যুক্ত নয়। এগুলোর কারণ ঐতিহাসিকও নয়। এগুলো ব্যক্তিমানুষের দুর্বলতা বা ভুলত্রুটির সঙ্গে যুক্ত। সেখানে অপ্রতুল মেধা এবং সদিচ্ছার অভাবও কারণ হতে পারে। রাজনৈতিক এলিট শ্রেণির গুণগত মানের সঙ্গে গণতন্ত্রের ভাগ্য যে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত সেই প্রতিপাদ্যটি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তবে বহিঃচাপের যেসব উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হলো তাকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করে নেওয়া উচিত নয়, তা যতই কার্যকরী বলে মনে হোক না কেন। কেবল

তার ওপর ভরসা করে আমাদের দেশে গণতন্ত্রের কথা ভাবা যায় না। যে পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল অথবা তাইওয়ান বা কোরিয়ায় নাক গলিয়েছিল তার কারণ বহুবিধ হতে পারে। সেই কারণগুলো আজকের বিশ্বে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চীন বা ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট শাসন প্রবর্তন এবং এশিয়ায় দ্রুতগতিতে সমাজতান্ত্রিক ধারণার বিস্তার লক্ষ করা গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়তো গণতন্ত্রের বেশ কিছু এশীয় মডেল তৈরি করে ওই প্রসারের আশঙ্কা থেকে এশিয়াকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই পরিস্থিতি আজ আর নেই। আজ ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। বাইরের সাহায্যের চেয়ে অভ্যন্তরীণ শক্তির ওপর গুরুত্ব দেওয়া আজ সে কারণে অনেক বেশি ফলপ্রসূ। তা ছাড়া পৃথিবীও আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া প্রভাবের মধ্যে নেই। একদিকে চীন এবং ভারতের অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি, লাতিন আমেরিকায় ব্রাজিল বা আফ্রিকা মহাদেশে দক্ষিণ আফ্রিকা অথবা ইউরোপে রাশিয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের শক্তি বৃদ্ধির কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া আধিপত্য বিনষ্ট হচ্ছে। ফলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বাস্তবায়নের প্রশ্নকে কেবল বাইরের প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা সমীচীন হবে না। বলছি না ওই ভূকৌশলগত কারণ আজ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। চীনের পরাশক্তি হওয়াকে রোধ করার জন্য অথবা তার আঞ্চলিক প্রভাবকে সীমিত রাখার জন্য মিয়ানমার বা অন্য কোনো দেশের ওপর চাপ খাটিয়ে তাদের গণতন্ত্রের পথে আনার কৌশলকে পুরোপুরি বাতিল করা যায় না। যদিও সেটি কতটুকু কার্যকর হবে তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে।

দ্বিতীয় যে কারণে আর্থসামাজিক পূর্বশর্ত ছাড়াই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা যায়, সেটি হচ্ছে বর্তমানের পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। ইদানীংকালে বিশ্বপরিস্থিতি গণতন্ত্রের জন্য অনুকূল বলে ধরে নিতে হবে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তির পর গণতন্ত্রসংক্রান্ত গবেষণায় কোনো পূর্বশর্তের অনুপস্থিতিতে কীভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় সেটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। মার্কিন স্বরাষ্ট্র বিভাগের এককালের প্রধান ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা *The End of History and the Last Man*—এই প্রশ্নটিকে তাত্ত্বিক ফ্রেমে সাজিয়ে বিচার করে দেখেছেন। তাঁর লেখায় তিনি দাবি করেছেন, রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সে কারণে মানবসমাজকে শাসন করার যেসব তত্ত্ব বা কৌশল নিয়ে নানা পরীক্ষণ করা হয়েছে (সমাজতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক, সামরিক) সেই পরীক্ষণের আজ সমাপ্তি ঘোষণার সময় উপস্থিত। সেখানে গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো শাসনব্যবস্থা দিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনার সম্ভাবনা নেই, যেহেতু একদলীয় শাসনের তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের সঙ্গে শেষ হয়েছে।[১] ঠিক এই অর্থে ফুকুয়ামা বুঝিয়েছেন কেন মানবসমাজ ইতিহাসের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

কেবল ফুকুয়ামা নন, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের শক্ত এবং খাঁটি অনুসারী হয়ে যাঁরা এত দিন অন্য বৃন্তের মানুষ ছিলেন, তাঁরাও ওই সত্যটি ধীরে হলেও উপলব্ধি করছেন। তাঁদের মনে একনায়কতান্ত্রিক বা একদলীয় ক্ষমতাকাঠামো নিয়ে সন্দেহ জন্মেছে। তাঁরা এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছেন যে সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিক জোয়ারের সামনে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের স্লোগানটা অসম্ভব রকম বেমানান দেখায়। ফলে তাঁদের উপলব্ধি হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রশি ধরে অথবা তাকে সংশোধন করে অগ্রসর হতে হবে। D L Rabyi তাঁর *Democracy and Revolution: Latin America and Socialism Today* গ্রন্থে সেই অবস্থানের প্রতিফলন আমরা লক্ষ করি। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'বিপ্লবী বামের ক্ষেত্রে শিক্ষাটা আজ একেবারে পরিষ্কার। সমাজতন্ত্র একনায়কতন্ত্রের পথ ধরে অর্জন করা সম্ভব নয়। সে কারণে আজ আমরা সবাই গণতন্ত্রী। কঠোরপন্থী স্তালিনীয় তত্ত্বের দিন ফুরিয়ে গেছে। নির্বাচনকে বাতিল করে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি করা আর স্বৈরতন্ত্রকে সমর্থন করা' (পৃষ্ঠা ২০) একই জিনিস। স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের মূল্যায়ন গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের সমর্থনকে বৃদ্ধি করবে, সেটি আশা করা যায়।

তত্ত্বগতভাবে বস্তুগত পূর্বশর্ত ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে জোরদার করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন রবার্ট ডাল (১৯৮৯), রনালদ ইঙ্গেলহাট (১৯৯০), সিমোর লিপসেট (১৯৯৪), গ্যাব্রিয়েল আলমনড এবং সিডনি ভেরবা (১৯৬৩), রস্টো (১৯৭৩), জোসেফ সুম্পিটার (১৯৭৬), ল্যারি ডায়ামনড (১৯৯০), গুলিয়েরমো ও ডোনেলের লেখা। এসব গবেষকের যুক্তি হচ্ছে, একটি দেশের এলিট গোষ্ঠী বা প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যদি নিজের স্বার্থের কথা ভেবে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছান এবং গণতন্ত্রের মূল নীতিমালা মেনে চলার অঙ্গীকার করেন, তাহলে আর্থসামাজিক পূর্বশর্ত ছাড়াই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই বিশেষ পথটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটি যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। রাজনৈতিক এলিট শ্রেণির মধ্যে বাংলাদেশে সমঝোতার রাজনীতি আজও অনুপস্থিত এবং ওই শ্রেণি দ্বিধাবিভক্ত। সে কারণে এলিট শ্রেণির ওপর এই গুরুদায়িত্ব দিয়ে কতটুকু নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে সে প্রশ্ন অবান্তর নয়। আরও একটি দিক লক্ষ করার মতো। গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শক্তি হচ্ছে জনগণ। এলিট শ্রেণির ওপর গণতন্ত্রের দায়িত্বভার চাপিয়ে দেওয়া এবং এলিট শ্রেণি ওই দায়িত্ব কতটুকু পালন করছে সেটি নির্ভর করে জনগণের ভূমিকার ওপর। সে কারণে এলিট শ্রেণির ওপর দায়িত্ব দেওয়ার

অর্থ এই নয় যে জনগণের ভূমিকাকে আমরা উপেক্ষা করছি। গণতন্ত্রায়ণে জনগণের ভূমিকা এবং অংশগ্রহণের দিকটি অনেক তাত্ত্বিক আলোচনায় উহ্য রাখা হয়। কিন্তু এলিট গোষ্ঠী এবং জনগণের ভূমিকার আন্তসম্পর্ক-সংক্রান্ত প্রশ্নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

জনগণের ভূমিকার দিকটি এলিট শ্রেণির ভূমিকার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে সামাজিক উত্থান-পতনে জনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৮৪৮ সালে নেপোলিয়নের নাতি লুই বোনাপার্ট যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তাতে জনগণের ভূমিকা ছিল প্রধান। কার্ল মার্ক্স তাঁর ১৮ ব্রুমেই লুই বোনাপার্টে ব্যক্তি বা সামাজিক গোষ্ঠীর ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরে দেখিয়েছেন নেপোলিয়নের ওই ক্যু সফল হয়েছিল সমাজের সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণির সমর্থন নিয়ে। অন্যদিকে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের ক্ষেত্রেও জনগণের ভূমিকাকে ভেবে দেখা যায়। ১৯৩৩ সালের নির্বাচনে হিটলারকে জয়ী করেছিল সে দেশের জনগণ। ১৯৩৩ সাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত হিটলার ক্ষমতায় টিকে ছিলেন জনসমর্থনের কারণে। ফলে জনগণ এবং রাজনৈতিক এলিট শ্রেণির ভূমিকার মধ্যে বিশেষ সমন্বয় গণতন্ত্রের সফলতার জন্য আবশ্যকীয় বলে ধরে নিতে হবে। এলিট শ্রেণির ভূমিকা, জনমানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যবোধ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাদের আন্তরিকতার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে গণতন্ত্রের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে নাকি তার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই ফ্যাক্টরগুলো বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রধান পূর্বশর্ত হিসেবে ধরে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

এলিট শ্রেণি বনাম জনগণ

বস্তুগত পূর্বশর্তের অভাবের প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা ভাবনায় নিয়ে আমরা প্রধান দুই পক্ষের ভূমিকার ওপর বিশেষ জোর দিতে চাই। ওই দুইয়ের একটি হচ্ছে দেশের এলিট শ্রেণি, বিশেষ করে রাজনৈতিক এলিট। অন্য পক্ষ হচ্ছে জনসাধারণ। আদর্শগতভাবে গণতন্ত্রকে এই দুই শ্রেণির 'টাগ অব ওয়ার' হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। এলিট শ্রেণি জনগণের হাতে ক্ষমতা স্বেচ্ছায় হস্তান্তর করতে চায় না। তারা ক্ষমতা বরং নিজের হাতে কুক্ষিগত রাখতে চায়। অন্যদিকে জনগণ গণতন্ত্র চায়। কারণ গণতন্ত্রের অধীনে তার স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। গণতন্ত্রের অধীনে মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করে। এই দুই শক্তির ভারসাম্য কোন দিকে গড়ায় তার ওপর নির্ভর করে গণতন্ত্রায়ণ-প্রক্রিয়া কতটুকু প্রসারিত হবে। এলিট শ্রেণি তার শ্রেণিগত ওই অবস্থান থেকে সরে আসতে পারে, নমনীয় মনোভাব দেখাতে পারে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের প্রতি আকর্ষিত হতে পারে

কিন্তু সেটি নির্ভর করে বিশেষ পরিস্থিতির ওপর। তার নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এলিট শ্রেণি জনগণের সঙ্গে সমঝোতায় আগ্রহী হতে পারে। এলিট শ্রেণি সমাজে বিপ্লব বা অস্থিরতা চায় না। বিপ্লব তাদের ক্ষমতাকে আরও সংকুচিত করতে পারে এবং জনগণের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিতে পারে—এই আশঙ্কার কারণে ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা গণতন্ত্রের পক্ষে এসে দাঁড়াতে পারে। তা ছাড়া এলিট শ্রেণি এবং জনগণের মধ্যে যে শক্তির ভারসাম্যের কথা বলা হয় সেটি যদি কোনো কারণে সমান সমান থাকে তাহলে এলিট শ্রেণি অনেক বেশি সচেতন হয় এবং জনগণের স্বার্থের দিকটি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় নেয়।

এলিট শ্রেণি এবং জনগণের ভূমিকা ও তাদের আন্তসম্পর্ক-সংক্রান্ত এই আলোচনাটি বোঝা প্রয়োজন, যদিও প্রসঙ্গটিকে সহজ ভাবা যায় না। তাত্ত্বিক দিক থেকে আন্তসম্পর্কটি এত দিন ধরে পশ্চিমা উদারনৈতিক দর্শনের ওপর ভর করে গড়ে উঠেছে, যদিও ওই উদারনৈতিক দর্শনের দৃষ্টিতে আমাদের দেশে জনগণ এবং এলিট শ্রেণিকে বিচার করা কঠিন। আমরা নিজেরাও তাদের আন্তসম্পর্ক-সংক্রান্ত কোনো দেশীয় তত্ত্ব দাঁড় করাতে পারিনি। অথচ এই আন্তসম্পর্ককে না বুঝে গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলা কঠিন। আলোচনাটি সে কারণে অন্তত এই পর্যায়ে পশ্চিমা ভাবনার যে ফ্রেম রয়েছে তার মধ্যে রেখে করা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই।

জনগণের ভূমিকা কী হবে?

গণতন্ত্র যদি এলিট শ্রেণি এবং জনগণের ক্ষমতাকেন্দ্রিক আন্তসম্পর্কের ওপর নির্ভর করে তাহলে জনগণের ক্ষমতার প্রকৃতি ও পরিমাণ কী সেটি মেপে দেখা প্রয়োজন। প্রথমত, এলিট গোষ্ঠী রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্বভার পায়, কারণ জনগণ ওই ক্ষমতা তাদের প্রদান করে। সেদিক থেকে জনগণের ক্ষমতা কম ভাবা যায় না। জনগণের হাতে দুই ধরনের ক্ষমতা থাকে। একধরনের ক্ষমতা আছে যাকে *De facto* ক্ষমতা বলা হয়ে থাকে। অন্য আরও একধরনের ক্ষমতা আছে যাকে বলা হয় *De jure* ক্ষমতা। প্রথম ধরনের ক্ষমতা বলতে মানুষের প্রকৃতিগত ক্ষমতাকে বোঝায়। ফলে আমরা সবাই ওই ক্ষমতার অধিকারী। দ্বিতীয় ধরনের ক্ষমতা হচ্ছে সেই ক্ষমতা যেটি কাউকে হস্তান্তর করা যায়। প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেটি সাধারণত হস্তান্তরিত হয় জনসাধারণের হাত থেকে এলিট শ্রেণির হাতে। সেভাবে এলিট শ্রেণির ওপর দেশ শাসনের দায়িত্বভার বর্তায়। প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ প্রতিনিধি নির্বাচন করে। তারা তাদের ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে হস্তান্তর করে এই ভেবে যে ওই ক্ষমতা তাদের কল্যাণেই ব্যবহার করা হবে। জনগণের হাত থেকে হস্তান্তরিত এই ক্ষমতাই হচ্ছে *De jure* ক্ষমতা। অর্থাৎ জনগণের *De facto* ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে গিয়ে *De jure* ক্ষমতায় পরিণত হয়। অগণতান্ত্রিক পরিবেশে জনগণের হাতে *De facto* ক্ষমতা পরিমাণে বেশি থাকে। কারণ ওই ক্ষমতা এলিট শ্রেণির হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। সুতরাং যেকোনো গণতন্ত্রে প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে, জনগণ কোন ধরনের প্রতিনিধির হাতে ওই *De jure* ক্ষমতা হস্তান্তর করছে। কেবল হস্তান্তর করেই দায়িত্ব শেষ হচ্ছে না। সেই ক্ষমতা সম্পর্কে জনগণ কতটুকু সচেতন এবং *De jure* ক্ষমতা এলিট শ্রেণিকে প্রদান করে জনগণ তার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে কতটুকু সক্রিয় বা পারদর্শী সেটিও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

যে শর্তে জনগণ এলিট শ্রেণির হাতে তার ক্ষমতা হস্তান্তর করে সেই শর্ত এলিট শ্রেণি কতটুকু পালন করল বা আদৌ করল কি না তার তদারকির ক্ষমতা জনগণের আছে কি না বা কতটুকু আছে সেটি দিয়েই যাচাই করা সম্ভব একটি দেশে জনগণের ক্ষমতা কতটুকু। এই আন্তসম্পর্কের ওপর নির্ভর করে গণতন্ত্রের ভাগ্য। জনগণের ক্ষমতা যদি এলিট শ্রেণির ওপর যথেষ্ট প্রভাব রাখতে সক্ষম হয় তাহলে গণতন্ত্র সফল হবে। এলিট শ্রেণি ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের দাবি-দাওয়াকে এড়িয়ে গিয়ে যদি আত্মসেবায় মগ্ন হয় এবং জনগণ সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন বা তার বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ প্রতিবাদ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে গণতন্ত্র আংশিক, খণ্ডিত বা বিকৃত হবে। গণতন্ত্র সেসব ক্ষেত্রে সার্বিক ব্যবস্থা হিসেবে দাঁড়াতে ব্যর্থ হবে। ফলে মূল যে দিক সম্পর্কে খেয়াল রাখা জরুরি তা হচ্ছে জনগণের সচেতনতার দিক, তাকে কীভাবে সচেতন করে তোলা যায়, যেন এলিট শ্রেণির সমকক্ষ শক্তি হয়ে সে তার দাবি পূরণের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে।

জনগণের সক্রিয়তা বা তার ভূমিকার প্রশ্নকে তিনটি পৃথক অবস্থান থেকে বিচার করে দেখা সম্ভব। এই তিনটির দুটি প্রাচীন গ্রিক গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। বাকিটা গড়ে উঠেছে আধুনিক কালে। প্রথম ধরনের অংশগ্রহণ বলতে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে বোঝায়। সেটি প্রাচীন গ্রিসের গণতন্ত্রে আমরা লক্ষ করেছি। ওই প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের বিশেষ প্রেক্ষাপট ছিল। এথেন্সের আক্রোপলিসকে আমরা ছবিতে অনেকবার দেখেছি। তারই পাশে একটি মাঠ—হতে পারে টাওয়ার অব দ্য উইন্ড বা প্রাচীন আগোরার ধার ঘেঁষে কোনো বিস্তীর্ণ মাঠ। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০৮ সালে গ্রিসের জনগণ বিদ্রোহ করে অত্যাচারী শাসককে পরাভূত করে। তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে নতুন যে শাসক দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি জনগণের অধিকার এবং রাষ্ট্রশাসনে তাঁর ভূমিকার দিকটি অগ্রাধিকার দিয়ে বিচার করার সাহস দেখিয়েছিলেন। যে পদ্ধতি অনুসরণ করে ওই নতুন শাসক জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করেছিলেন সেটিই আজ গণতন্ত্র নামে পরিচিতি পেয়েছে। তিনি আক্রোপলিসের পাশে একটি জায়গা নির্ধারণ করে এথেন্সবাসীকে সেখানে সমবেত করেন। নতুন সম্রাট সমবেত জনতাকে রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণের অনুরোধ

জানান। উপস্থিত জনসমষ্টি ওই দিন গ্রিসের প্রথম পার্লামেন্টে পরিণত হয়। ঠিক আজকের দিনের বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ বা ব্রিটেনের হাউস অব কমন্সের মতো। সেখানে বিতর্ক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহজ একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সাদা পাথর দিয়ে 'হ্যাঁ' ভোট এবং কালো পাথর দিয়ে 'না' ভোটের ব্যবস্থা চালু হয়। জনগণ কী সিদ্ধান্ত নেবে, কীভাবে তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে, তার সমাধান এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। এভাবে গ্রিক শব্দ ডেমোস যার অর্থ জনগণ এবং ক্রাটিস যার অর্থ শাসন বা জনগণের শাসনের ধারণা এথেন্সসহ বাকি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

এখানে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে জনগণের শাসন। গ্রিক গণতন্ত্রকে জনগণের শাসন হিসেবে দেখা হয়েছে, কারণ সেখানে জনগণ সরাসরি সশরীরে উপস্থিত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। ওই শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ ছিল পূর্ণমাত্রায়। পরবর্তী সময়ে এই প্রত্যক্ষ উপস্থিতির পাশাপাশি আরও একটি স্তর যোগ করা হয়। তার সঙ্গে আজকের প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের সাদৃশ্য আছে। এথেন্সে সাধারণ মানুষের অ্যাসেম্বলির পাশাপাশি ৫০০ সদস্যের এক বিশেষ কাউন্সিল গঠন করা হয়। এই কাউন্সিলের দায়িত্ব ছিল প্রতিদিনের কাজগুলো পরিচালনা করা। নগররাষ্ট্রের সব জনগণের পক্ষে প্রতিদিন এক জায়গায় সমবেত হয়ে রাষ্ট্রের শাসন দেখাশোনা করা ব্যবহারিক দিক থেকে অসম্ভব ছিল। যদি তা-ই হতো তাহলে প্রতিদিনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাদ দিয়ে জনগণকে তার পুরো সময় ব্যয় করতে হতো রাষ্ট্রপরিচালনার কাজে। ওই দিকটি ভেবে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য লটারির মাধ্যমে কর্মকর্তা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে প্রাচীন গ্রিসে জনগণের দুই ধরনের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি হচ্ছে, জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ। অন্যটি জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার। বলা বাহুল্য, প্রথমটি আজকের আধুনিক সমাজে প্রযোজ্য ভাবা কঠিন। কয়েক কোটি মানুষকে একটি স্থানে জড়ো করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া আজ কোনোভাবে সম্ভব নয়। সে কারণে গণতন্ত্রের প্রধান রূপ হিসেবে প্রতিনিধিত্বের ধারণাটি স্থান করে নিয়েছে। ফলে জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পরিবর্তে প্রতিনিধি দিয়ে শাসন করার প্রথা গণতন্ত্রে প্রাধান্য পাওয়ার কারণে আজকাল জনগণের শাসন না বলে গণতন্ত্র বলতে জনপ্রতিনিধির শাসনকে বোঝানো হয়।

জনগণের অংশগ্রহণকেন্দ্রিক দ্বিতীয় তত্ত্বটি গ্রিক ধ্রুপদি উদাহরণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। ওই ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে জনগণের অংশগ্রহণ বলতে তার বিদ্রোহী চরিত্রকে বোঝানো হয়েছে। ওই বিদ্রোহী চরিত্র অকার্যকর সরকারের বিরুদ্ধে একধরনের রক্ষাকবচ হিসেবে ভাবা হয়। এই রক্ষাকবচের ধারণাটি গড়ে ওঠে

জনগণের প্রতিবাদী দিকের প্রতি লক্ষ রেখে। গ্রিসে কুশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকের বিদ্রোহ করার কারণে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। বিদ্রোহের মুখে অভিজাত শ্রেণি গণতন্ত্র দিতে বাধ্য হয়েছিল। সেদিক থেকে ভাবলে ওই গণতন্ত্র প্রবলভাবে শ্রেণি বিভক্ত গ্রিক সমাজের অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের ফসল ছিল। বঞ্চিত, নিগৃহীত ও অধিকারহীন বিশাল জনগোষ্ঠীর সেই বিদ্রোহটি ঘটেছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৫০৮ সালে। ওই বিদ্রোহে সাধারণ মানুষ অত্যাচারী শাসক রাজা হিপিয়াসকে উৎখাত করে। মানুষ রাস্তায় নামে, অভিজাত পরিবারের ঘরে ঘরে আগুন দেয়, হিপিয়াসকে এথেন্স থেকে বহিষ্কার করে। ফলে ওই প্রতিবাদী দিককে গণতন্ত্রের প্রধান রক্ষাকবচ হিসেবে দেখা হয়।

আধুনিক সমাজে ওই প্রতিবাদী দিকটি নতুনভাবে মূল্যায়িত হয়েছে। জনগণের অংশগ্রহণ বলতে তার বিদ্রোহী তৎপরতাকে আর বোঝানো হয় না। প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। তার জায়গায় আজকাল জোর দেওয়া হচ্ছে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর। ওই সক্রিয়তা বলতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করা, জ্বালাও, পোড়াও বা আক্রমণাত্মক কিছুকে বোঝায় না। বোঝায় বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগগত এবং নৈতিক শক্তি দিয়ে শাসকগোষ্ঠীর ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং সেভাবে তাকে দায়বদ্ধ রাখা। ফলে জনগণের অংশগ্রহণের প্রশ্নে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগগত এবং নৈতিক শক্তি কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় (Pateman 1970, p. 12) সেদিকটি তাত্ত্বিক আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। জনগণের অংশগ্রহণের এই নতুন ধারণা গড়ে ওঠে ফরাসি দার্শনিক জ্য জাঁক রুশোর সময় থেকে। রুশো জনগণের বিদ্রোহী মনকে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসেবে ভাবেননি। তার চেয়ে তিনি অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন জনগণের সচেতন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণকে। ওই সক্রিয় অংশগ্রহণ বলতে কী বোঝায়, সেটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

সক্রিয় অংশগ্রহণ বলতে রুশো সমাজে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং যুক্ত থাকাকে বুঝিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানে অংশ নিয়ে মানুষ নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রাখতে পারে, তার ভেতরে যেসব গুণ আছে সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষ একে অন্যের সঙ্গে আন্তসম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ পায়। ওই আন্তসম্পর্ক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক এবং মনোভাবের জগতে পরিবর্তন এনে দেয়। একই সঙ্গে ব্যক্তিপর্যায়ে মানুষ সংগঠনের গুণগত মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। জনগণের অংশগ্রহণ বলতে তাহলে যা বোঝায় তা হচ্ছে মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণগত পরিবর্তন। ওই পরিবর্তন জ্বালাও-পোড়াও বা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর বলে ধারণা করা হয়। ওই অভ্যন্তরীণ গুণাবলির বিকাশ জনগণকে প্রকৃত অর্থে আরও

শক্তিশালী করে এবং গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে সাহায্য করে। রুশো অবশ্য গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে একটি শর্ত আরোপ করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন জনগণের মনোজগতে গুণগত পরিবর্তন আনতে হলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনতে হবে। ওই বৈষম্য কমানো না গেলে ওই আন্তসম্পর্ক সত্যিকার অর্থে ফলপ্রসূ হয় না। সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যকে এমন পর্যায়ে রাখা প্রয়োজন যেন মানুষ কোনোভাবে রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার না হয়। এই দিকটি নিশ্চিত করা গেলে মনস্তাত্ত্বিক উন্নতি এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার পথটি সবার ক্ষেত্রে সহজ হবে বলে তিনি আশা করেছিলেন। রুশো সে কারণে সমাজে কোনো গোষ্ঠীকে অতিমাত্রায় ধনী হিসেবে ভাবেননি বা অতিমাত্রায় দরিদ্র হওয়ারও বিরোধিতা করেছেন। অতিমাত্রায় ধনিক গোষ্ঠী অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পায়, অর্থের বিনিময়ে সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব খাটাতে পারে। সে কারণে সম্পত্তির মালিকানাকে রুশো গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসেবে ভেবেছেন সে মালিকানা যত সীমিত হোক না কেন। সম্পত্তির ওপর মালিকানা মানুষের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে (Pateman, 1970 p. 22-23) এই ধরনের একটি বিশ্বাস রুশোর মনে ছিল।

দ্য পলিটিকস নামক গ্রন্থে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলও দাবি করেছেন, জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমতা সৃষ্টি না হলে জনগণ সার্বভৌম হতে পারে না। সমতাকে তিনি দুটি অর্থে বুঝতে চেয়েছিলেন। সমতা বলতে একদিকে প্রতিটি নাগরিকের শাসন করার অধিকারকে বোঝায়। বোঝায় সবার ভোট দেওয়ার অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় অফিসের কর্মকর্তা হওয়ার অধিকারকে। সেই সঙ্গে শাসিত হওয়ার সম্ভাবনাকে বাদ দেওয়া যায় না। অর্থাৎ সমতার অর্থ কেবল স্বাধীনতা নয়। ওই স্বাধীনতা অন্যের স্বাধীনতাকে যেন হরণ না করে সে দিকটির প্রতিও লক্ষ রাখা জরুরি। সেদিক দিয়ে ভাবলে সমতা ও স্বাধীনতার মধ্যে বিরোধ থেকে যায়। সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সবাই সমান অধিকার ভোগ করে না। সমাজে ধনীর তুলনায় দরিদ্রের সংখ্যা বেশি। সমতা ও স্বাধীনতার এই বিরোধকে গণতন্ত্রের অন্যতম প্যারাডক্স হিসেবে ধরা হয়। ফলে আমরা লক্ষ করেছি কোনো এক পর্যায়ে ধনিক শ্রেণির হাতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কুক্ষিগত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ধনী-গরিব বিভেদ আমাদের দেশে তীব্র থাকায় জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে না। প্রবণতাটি কেবল অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভাবা যায় না। উন্নত সমাজেও জনগণ রাজনীতির প্রতি ওই বিশেষ অবস্থাগত কারণে অনেক বেশি নির্লিপ্ত হয়ে পড়ছে। জনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপারে ধ্রুপদি তাত্ত্বিকেরা যেভাবে উৎসাহী হয়েছিলেন, সে উৎসাহের এখন

পুনর্মূল্যায়ন ঘটতে দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্রসংক্রান্ত নানা তত্ত্বে। বিশেষ করে সেটি লক্ষ করা যায় সুম্পিটারের তত্ত্বে। সেটি আমরা পরবর্তী সময়ে আলোচনা করব।

যাই হোক, রুশোর তত্ত্বে তাহলে জনগণকে পারস্পরিক নির্ভরশীল একটি সমষ্টি হিসেবে দেখা হয়েছে যে নির্ভরশীলতা গড়ে তোলা গেলে মানুষের মধ্যে সমতা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। এই নির্ভরশীলতা রুশোর কাছে বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ার আরও একটি কারণ ছিল। সেখানে রুশো আইনের শাসনের একটি দিক লক্ষ করেছিলেন। সেটি হচ্ছে, ব্যক্তি যদি স্বাধীন হয় এবং স্বাধীন হিসেবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয় তাহলে এমন কোনো আইন পাস করতে কেউ উৎসাহী হবে না যে আইন অন্যকে ক্ষতি করে। রুশো এমন একটি সমাজ চেয়েছিলেন যেখানে খুদে কৃষকদের প্রাধান্য থাকবে বা খুদে কৃষক নিয়ে পুরো সমাজ গড়ে উঠবে। সেখানে অর্থনৈতিক সমতা বলবৎ থাকবে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে।[২] স্বাধীন মানুষ বলতে রুশো বুঝেছেন সেই মানুষকে যে কিনা সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়। রুশোর গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের তত্ত্ব সে অর্থে নিবিড়ভাবে প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত। ওই প্রতিষ্ঠান মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গুণাবলি বা মনোভাবকে গণতান্ত্রিক করে এবং সেই ধরনের মানুষ প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

রুশোর এই তত্ত্বকে পরবর্তী সময়ে আরও উন্নত করেছেন প্রখ্যাত দার্শনিক এবং উপযোগবাদী J S Mills (1806-1873) এবং D S Cole। জনগণের অংশগ্রহণকে রুশোর মতো করে তাঁরাও শিক্ষামূলক এবং ব্যক্তির গুণগত মান উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পারস্পরিক সম্পর্ক জনগণের গুণগত মান উন্নয়নে সাহায্য করে। তার মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ অনেকখানি নির্ভর করে ওই আন্তক্রিয়ামূলক অংশগ্রহণে, যেখানে মানুষ সমষ্টি স্বার্থ কী সে সম্পর্কে ধারণা পায়। আর সেটিই পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্রের ভিত গড়ে তুলতে সাহায্য করে।[৩] আজকাল সব দেশে জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাকে মিলস কেবল ভোট দেওয়ার অধিকার এবং ওই ভোট দিয়ে জাতীয় সরকারে অংশগ্রহণকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি। তাঁর মতে, আন্তক্রিয়ামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গা হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে।[৪] যেমন গ্রাম, উপজেলা, মহকুমা, জেলা ইত্যাদি পর্যায়ে। মিলস প্রতিটি স্থানকে গণতন্ত্রের মূল কেন্দ্র হিসেবে পেতে চেয়েছেন। তিনি সেগুলোকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন যেন সেগুলো সমাজের স্বাভাবিক ঐক্য এবং বিকাশের কথা মাথায় রাখে। তিনি আরও জোর দিয়েছেন শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলার ওপর। সেখানে মানুষ সমষ্টিবদ্ধ কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পায় এবং গণতন্ত্র সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন

করে। Cole জনগণের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন সামাজিক সংগঠনের ভূমিকাকে কেবল বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ঠিক নয়। তাকে সংগঠনের প্রতিটি সদস্যের মানসিক বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রয়োজন। ওই বিকাশ বলতে কোল স্বশাসনকে বুঝিয়েছেন। অনেকটা আমাদের দেশে উপজেলা বা স্থানীয় সরকার এমনকি গ্রামীণ সরকারের মতো কিছু। তার অর্থ হচ্ছে, জনগণের পূর্ণ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটানো উচিত।[৫] ব্যালট বাক্সের গণতন্ত্র সত্যিকার অর্থে রাজনৈতিক সমতা নিশ্চিত করে না।[৬] একইভাবে রাজপথে আন্দোলন, জ্বালাও-পোড়াও ইত্যাদি জাতীয় অংশগ্রহণ প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য উপযোগী ভাবা যায় না।

তবে সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে, রুশো বা তাঁর অনুসারীদের এই ধারণা বাস্তবায়িত হয়নি। কেবল তা-ই নয়, জনগণের অংশগ্রহণের ধারণাটি পরবর্তী সময়ে নানা ধরনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে এবং ওই বিবর্তনে তাঁর ভূমিকাকে আজ অনেক বেশি সংকুচিত করে দেখা হচ্ছে। ফলে গণতন্ত্র পরিণত হয়েছে জনগণকে রক্ষা করার একটি ব্যবস্থায়। গণতন্ত্রের দায়িত্ব বলতে আজকাল মানুষের অধিকার রক্ষা করা, তার বাকস্বাধীনতা রক্ষা করা, সংগঠন করার অধিকার রক্ষা করা বোঝায়। একে অনেকে protective model of liberal democracy (Macpherson, 1977, pp. 22-43) হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা কিনা পশ্চিমা বিশ্বে ইতিমধ্যে স্থান করে নিয়েছে। অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবে সেখানে জনগণের ক্ষমতায়নের দিকটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র কীভাবে মানুষকে রক্ষা করবে, সেটিই সেখানে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রিস্টোফর হাডসনের মন্তব্যটি এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।[৭] তিনি দেখিয়েছেন পশ্চিমা গণতন্ত্র মানুষের ক্ষমতায়ন নিয়ে ভাবে না। বরং মানুষের স্বাধীনতাকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় মাত্র। আধুনিক গণতন্ত্রে ভোট দেওয়ার দিকটি প্রাধান্য পাওয়ায় গণতন্ত্রকে জনগণের শাসন না বলে প্রতিনিধিত্বকারী এলিট শ্রেণির শাসন বলাই শ্রেয়। তার অর্থ হচ্ছে, মুক্ত ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। জনগণের ভূমিকা সেখানে ওই ধরনের নির্বাচনে অংশ নেওয়া এবং তাদের মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করা। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সুম্পিটার নামে একজন গবেষকের ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ (Hudson, C, 2012, p. 444)।

তবে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক গণতন্ত্রে জনগণের ভূমিকা নিশ্চিত হলেও সেখানে বেশ কয়েকটি ব্যবহারিক সমস্যা রয়ে গেছে। প্রথম সমস্যা হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন জনগণের স্বার্থ কতটুকু রক্ষা করবে বা আদৌ করবে কি না তার কোনো গ্যারান্টি নেই। হিটলারের নাজি পার্টি বা ইরানের আয়াতুল্লাহ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। জনগণ প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করে

হিটলার পৃথিবীকে কোথায় নিয়েছিল সেটি আমরা জানি। সংখ্যাগরিষ্ঠ বলতে জনসংখ্যার ৫১%কে বোঝায়। ওই সংখ্যক ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধিরা বাকি ৪৯%কে বঞ্চিত করার অধিকার পেল কি না সেটি একটি উদ্বেগের ব্যাপার। বাংলাদেশে প্রায় সব নির্বাচনে বিজয়ী দল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার লক্ষ্য নিয়ে অত্যাচার, নিপীড়ন, রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে নির্যাতন এবং ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের কৌশল বেছে নেয়। তার উদাহরণ একাধিক। এ ধরনের বৈষম্য ও নির্যাতন জাতিগতভাবে বিভক্ত সমাজে অহরহ ঘটছে। ইরাক জাতিগত দিক দিয়ে ভিন্ন। সেখানে শিয়া বা সুন্নি সম্প্রদায় সংখ্যাগত দিক দিয়ে প্রায় সমানে সমান। আরও রয়েছে সংখ্যালঘু অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী। সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র শিয়া ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিজয় এনে দিলেও জনসংখ্যার ৪৫% হয়েও সুন্নিরা ক্ষমতাকাঠামো এবং রাষ্ট্রপরিচালনার কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। ওই একই প্রশ্ন কানাডার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেখানে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষাভাষী মানুষের প্রায় সমান উপস্থিতি রয়েছে। ফরাসি ভাষাভাষীরা বিশেষ একটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত এবং ইংরেজি ভাষাভাষীরা ভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এসব দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রবল আকার ধারণ করতে পারে, যে কারণে জাতিগতভাবে বিভক্ত সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপযোগী কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি ঘিরে দ্বিতীয় সংশয় হচ্ছে অল্প ভোটের ব্যবধানে যাঁরা জনগণের প্রতিনিধি হন, আর যাঁরা অল্প ভোটের ব্যবধানে হেরে যান, তাঁদের মধ্যে অবস্থানগত পার্থক্য নগণ্য হতে পারে। জনগণ কেন একজনকে নির্বাচিত করে বা অন্যকে করে না, তার কারণ এই নয় যে যিনি নির্বাচিত হলেন, তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান, দূরদর্শী বা দক্ষ। নির্বাচনে যোগ্যতার মাপকাঠি জ্ঞান নয়, দক্ষতা নয়, এমনকি প্রার্থীর দূরদর্শিতাও নয়। নির্বাচিত হওয়ার পেছনে আরও বহুবিধ কারণ থাকে। মিথ্যা প্রলোভন, অর্থ, সস্তা প্রতিশ্রুতি, জনবন্ধুর মুখোশ পরে মানুষকে পক্ষে টানা সম্ভব হলেও রাষ্ট্রপরিচালনায় তার প্রভাব পড়ে (ম্যাকিয়াভেলি ওইভাবে শাসন করার উপদেশ দিয়ে গেছেন)। সংখ্যাগরিষ্ঠতা সে কারণে ভয়ংকর হতে পারে যদি নিম্নমানের বুদ্ধিবৃত্তিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বুদ্ধি নয়, সংখ্যা প্রাধান্য পেলে গণতন্ত্র নিম্নমানের হয়। অভিযোগটি একেবারে মিথ্যা ভাবা কঠিন। গ্রিক নগররাষ্ট্রে সক্রেটিসকে হেনস্থা হতে হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠেরই হাতে। যদিও তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। এই সমস্যাগুলো পশ্চিমা বিশ্বে সমাজ পরিচালনার মূল তত্ত্ব উদারনীতির (Liberalism) সঙ্গে যুক্ত। গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের সার্বভৌমত্ব রক্ষার (সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন) পাশাপাশি রাষ্ট্রশাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে যেন ওই শাসন

সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকারকে খর্ব না করে (Plattner 2010, p. 84)। এটি পশ্চিমা দেশগুলোতে বাস্তবায়ন সম্ভব হলেও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন।

তৃতীয় সমস্যা লক্ষ করা যায় লোকপ্রিয় রাজনীতিতে। গণতন্ত্রে লোকপ্রিয় স্লোগান ব্যবহার করে জনগণের সমর্থন আদায় করা সম্ভব হয়। জনগণ লোকপ্রিয় রাজনীতির প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়। ওই রাজনীতি তাদের ভাগ্যে পরিবর্তন আনার প্রতিশ্রুতি দেয়। জনগণের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার পর ওই লোকপ্রিয় নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। এতে করে মানুষের সমর্থন ওই ধরনের নেতৃত্বের প্রতি কমে আসে। এ থেকে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। ইতিহাসে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। শেখ মুজিবের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকালে দেওয়া নানা প্রতিশ্রুতি স্বাধীনতার পর পূরণ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয় তার সঙ্গে ওই অপূর্ণ থাকা প্রতিশ্রুতির যোগ সম্পর্ককে বাতিল করা কঠিন। লোকপ্রিয় রাজনীতি তার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যেকোনো আদর্শ ব্যবহার করে থাকে। ইউরোপে ওই রাজনীতির কুফল আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ করেছি। ফ্রান্সে লে পেন সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমবিরোধী স্লোগান ব্যবহার করে প্রচুর ভোট পেয়ে থাকে। অস্ট্রিয়ায় জরগ হেয়ডার অথবা ভেনেজুয়েলায় হুগো চাভেজের লোকপ্রিয় রাজনীতিও এখানে উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিজেপি পার্টি ধর্মীয় বিভেদ এবং হিন্দু রাষ্ট্রের দাবি তুলে ধর্মকে ব্যবহার করে। লোকপ্রিয় রাজনীতি চর্চা বাংলাদেশেও লক্ষ করা যায়। ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে হেফাজতে ইসলাম বা আরও অনেক ধর্মীয় রাজনৈতিক দল জনগণকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তারাই আবার অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ভাবে।[৮] ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন যে ধরনের গণতন্ত্র এনে দেয় সেই শাসন দিয়ে জনগণের মঙ্গল কতটুকু হবে তার কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।

চতুর্থত জনগণের সচেতনতা এবং অংশগ্রহণের আরও একটি দিক আছে যেটির গুরুত্ব উপেক্ষা করা কঠিন। Shadi Hamid নামে একজন গবেষক মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে জরিপ চালিয়ে জনগণের সচেতনতার মাত্রাগত দিকের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন, যেটি আমাদের জন্য প্রণিধানযোগ্য। সেই জরিপে দেখা যায়, মধ্যপ্রাচ্যে জনগণের অধিকাংশ সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হিসেবে ইসলামি আইন প্রবর্তনকে বিবেচনা করে। সে কারণে তারা ইসলামি আইন চায় এবং ঐশী শাস্তির প্রবর্তন চায়। ওই শাস্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে চুরির অপরাধে হাত কাটা, adultery'র জন্য পাথর ছুড়ে হত্যা এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান (Masoud, 2014, p.171)। সংখ্যাগরিষ্ঠের এই

মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শাসন করার অর্থ দাঁড়াতে পারে মধ্যযুগীয় নিয়মমাফিক নানা দেশে অগণতান্ত্রিক নিষ্ঠুর সমাজ গড়ে তোলা।

তাহলে এ ক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন মনে করা উচিত। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র যদি অবাস্তব হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র যদি বুদ্ধিবৃত্তিকতাকে অবদমন করে তাহলে গণতন্ত্রে জনগণের ভূমিকা কী হবে সেটি ভাববার বিষয় বৈকি। একটি ধারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে গণমানুষের অংশগ্রহণকে সীমিত রাখার পক্ষে মত দেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে রাজনীতি থেকে দূরে রেখে বড় ধরনের মতবিরোধ থেকে পুরো শাসনব্যবস্থাকে মুক্ত রাখা সম্ভব বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। সেটি পুরোপুরি অসত্য নয়। রাজনীতির ওপর বিশেষজ্ঞ যাঁরা তাঁরা লক্ষ করেছেন গণ-আন্দোলন দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ কখনো সহজ হয়নি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত হলেও কিছুকাল পর ওই স্বৈরাচারী শাসন ভিন্ন আঙ্গিকে ফিরে এসেছে। জার্মানিতে ভাইমার রিপাবলিক (১৯১৯-১৯৩৩) তার উদাহরণ। সেখানে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল নির্বাচনী পদ্ধতির কারণে। বেশি গণতন্ত্রী হতে গিয়ে নির্বাচনী পদ্ধতিতে আনুপাতিক হারে সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। ভোটের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে সেখানে পার্টির আসন বরাদ্দের প্রথা চালু হয়। এর ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্টি পার্লামেন্টে বেশ বড় সংখ্যায় আসন লাভের সুযোগ পায়। তারা জাতীয় ইস্যুর বদলে আঞ্চলিক সমস্যার ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় পার্লামেন্টে তাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে স্থানীয় সমস্যাগুলোর মধ্যে। কোনো রাজনৈতিক দল ওই নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করায় সংখ্যালঘিষ্ঠের সরকার গঠন করা হয়। একপর্যায়ে ওই পার্লামেন্ট অকার্যকর হয়ে পড়ে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হলেও পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নে বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে ওই গণতন্ত্রের ব্যর্থতা দেখিয়ে জার্মানিতে কীভাবে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে ইতিহাস আমাদের জানা আছে।

জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের অর্থ গণতন্ত্র নয়। যুক্তিটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভাবা সম্ভব। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মানুষের অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ আমরা লক্ষ করেছি। কিন্তু স্বাধীনতা এলেও ওই আন্দোলন গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেনি। নব্বই দশকের দিকে এরশাদবিরোধী আন্দোলন গণতন্ত্রের পথকে কিছুটা উন্মুক্ত করেছিল। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও গণতন্ত্র শেকড় গাড়তে ব্যর্থ হয়েছে। ইদানীংকালে শাহবাগ চত্বরে বিপুল মানুষের সমাগম লক্ষ করা গেলেও গণতন্ত্র তারপরও শক্তিশালী হয়নি। ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে যেভাবে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটেছিল ধর্মীয় স্লোগানের ভিত্তিতে গণতন্ত্রের যা কিছু অর্জন, তাকে ওই গণ-আন্দোলনের স্রোতোধারায় বানচাল করার ষড়যন্ত্র লক্ষ করা গিয়েছিল।

হেফাজতে ইসলাম নামে একটি ধর্মভিত্তিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের বাস্তব সম্ভাবনা সে সময় সৃষ্টি হয়েছিল। কেবল সরকারের শক্ত অবস্থানের কারণে এবং ঢাকাবাসীর সমর্থনের অভাবে ওই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের অংশগ্রহণ বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ওপর ভিত্তি করে সরকার গঠনের ফলাফল কী হয়েছে সেটি আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি মিসর, তিউনিসিয়ার উদাহরণ দেখিয়ে।

গণ-আন্দোলন কেন ব্যর্থ হয় তার কিছু কারণ এখানে উল্লেখ করতে আপত্তি নেই। অন্যতম একটি হচ্ছে, সব গণ-আন্দোলনে যতটুকু বিজয় অর্জিত হয় তার সবটুকুই রাজনৈতিক এলিট শ্রেণি ভোগ করে। সাধারণ মানুষের ভাগ্যে তেমন কিছু জোটে না। একপর্যায়ে গণ-আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। জোয়ার শেষ হওয়ার পর ভাটার টানে সমুদ্র যেমন ফিরে যায়, জনগণও তেমনি ঘরে ফেরে। আন্দোলনের ফলাফল থেকে যায় এলিট শ্রেণির হাতে। ওই বিজয়কে তারা কীভাবে ব্যবহার করবে, গণতন্ত্রের কতটুকু বাস্তবায়িত হবে সেটি নির্ভর করে তাদের মর্জির ওপর। রবার্ট ডালের একটি পর্যবেক্ষণ এখানে প্রণিধানযোগ্য মনে হয়। নানা গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন নিম্ন শ্রেণি থেকে আসা গ্রুপ বা উপগ্রুপ রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে কম সক্রিয় হয় এবং কর্তৃত্ববাদী মনোভাব তাদের মধ্যে প্রবলভাবে থাকে (Pateman, C, 1970, p. 10)। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণকে সে কারণে তেমন গুরুত্ব দিয়ে ভাবা সঠিক নয় বলে তাঁর দাবি।

গণতন্ত্রের ডানপন্থী সমালোচকেরা এর বিকল্প হিসেবে নাগরিক সমাজের গুণগত মানের ওপর জোর দিয়ে থাকেন। তার কারণ হচ্ছে, জনগণ তাদের ধারণায় সাধারণভাবে সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বুদ্ধিহীন। ২০০৩ সালে প্রকাশিত Richard Posner-এর *Law, Pragmatism and Democracy* (Cambridge: Harvard University Press, 2003, p. 16) গ্রন্থে এই ধরনের উক্তি লক্ষ করা যায়। সেখানে আরও মন্তব্য করা হয়েছে যে সাধারণ মানুষ সহজে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কারণ তারা তথ্যকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে অক্ষম। Bryan Caplan (2007) নামে আরও একজন গবেষক *The Myth of Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies* গ্রন্থে জনগণের প্রজ্ঞাহীনতার অভিযোগ নিয়ে এসেছেন। জনগণের দুর্বল বিচার-বুদ্ধি গণতন্ত্র বাস্তবায়নের পথে প্রধান বাধা হিসেবে ওই সব তাত্ত্বিকের রচনায় লক্ষ করা যায়। সে কারণে জনগণের শাসন কতটুকু সম্ভব বা কার্যকরী সে নিয়ে সব সময় সংশয় রয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতার ওপর এলিট শ্রেণির একচেটিয়া দখল থেকে মুক্তি পাওয়া তাদের ধারণায় কঠিন এবং ওই বাস্তবতা মেনে নেওয়াই সমীচীন।

তবে নাগরিক সচেতনতা নিয়ে এই ধরনের মন্তব্যের পরও জনগণের বর্ধিত

ভূমিকাকে এত সহজে নাকচ করে দেওয়া উচিত নয়। কারণ এ কথা তো সত্য যে রাজনৈতিক তথ্য সম্পর্কে নাগরিক সমাজ কতটুকু ওয়াকিবহাল হলে তাকে সচেতন ধরা হবে তার কোনো সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া কঠিন। অতিমাত্রায় সচেতন ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রতিটি ইস্যু নিয়ে মতবিরোধ থাকে। তারাও অভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কারণ প্রত্যেকের মতামত ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। সে কারণে যত সচেতন বা জ্ঞানীই হোক না কেন, একই তথ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নিতে পারে। যেকোনো সমস্যা বিচারে সে কারণে মতের অমিলকে নাকচ করা যায় না। সেটি বুদ্ধি বা বুদ্ধিহীনতার ওপর নির্ভর করে না। আর সে কারণে জনগণের প্রজ্ঞাহীনতার দোহাই দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করা যথাযথ ভাবা যায় না।

তবে এ কথাও মানতে হচ্ছে যে বাংলাদেশের মতো অনুন্নত সমাজে জনগণকে দুঃখজনকভাবে এক অদ্ভুত সমষ্টি হিসেবে ভাবতে হয়। এখানকার ক্ষুদ্র সংখ্যক জনগণ বুদ্ধিহীন বা রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ সে দাবি করা কঠিন হলেও যে ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন তাঁরা অধিকাংশই কৃষক, না হয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার, স্কুল-কলেজের শিক্ষক। এঁদের অধিকাংশ ভালোভাবে শিক্ষিত নন। রাষ্ট্রপরিচালনার নীতির মতো জটিল বিষয় নিয়ে তাঁরা ভাবেন না। ভাবার সময় তাঁদের নেই বা সামর্থ্য নেই। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তাঁরা মাঠে সময় কাটায় না। সন্ধ্যায় পাড়ায় চায়ের দোকানে জটলা করেন। টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রেখে দেশকে ভাবেন। পর্দায় নানা খবর, মুখ বা ঘটনা ভেসে ওঠে। সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে কিছু বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন আলাপে জড়িত হয়ে তাঁরা ঘরে ফেরেন। এই নিয়ে গড়ে ওঠে অধিকাংশ মানুষের সচেতনতার পরিধি। মেয়াদান্তে নির্বাচন আসে। তার সঙ্গে কিছু ক্ষণিক উত্তেজনা থাকে। নির্বাচন কেন্দ্রে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে ভোট দেওয়ার সুযোগ আসে। কপাল মন্দ হলে সেটুকুও ভাগ্যে জোটে না। কেউ সে কাজটি ইতিমধ্যে হয়তোবা সম্পন্ন করে দিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে রয়েছে অর্থের বিনিময়ে ভোট কেনার সংস্কৃতি। এঁদের কোনো সংগঠন নেই। থাকলেও সেসব সংগঠন ব্যক্তি আধিপত্য দিয়ে পরিচালিত হয়। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভূমিকা সেখানে নিতান্ত নগণ্য বলে ধরে নিতে হয়।

এই হচ্ছে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রধান একটি অংশের সচেতনতার গভীরতা ও পরিধি। এই জনগোষ্ঠীকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসেবে ধরে নেওয়া হয় এবং তাকে ঘিরে গড়ে ওঠে গণতন্ত্রের বাকি অংশ, নেতা এবং রাজনৈতিক দল। তাঁরা এই জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়ে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি হন এবং দেশ শাসন করেন। মেয়াদান্তে নির্বাচন আসে, নতুন সরকার গঠিত হয়। আর তাকেই গণতন্ত্র হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। সে কারণে যতই দিন যাচ্ছে ততই ওই জাতীয়

নির্বাচন-প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের উৎসাহ কমছে। মানুষ তুমুলভাবে আন্দোলিত হচ্ছে না। রাজনীতিবিদদের নিয়ে মানুষের উৎসাহে ভাটা পড়ছে, তাদের কর্মকাণ্ডে মানুষ বীতশ্রদ্ধ হচ্ছে। তাদের দেখা হচ্ছে গণশত্রু হিসেবে। ফলে জনগণের ভূমিকার দিক থেকে ভাবলে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ঘাটতি রয়েছে। বলা যেতে পারে জনগণের সার্বভৌমত্ব এখানে দুর্বল কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে।

রাজনৈতিক এলিট শ্রেণির ভূমিকা

জনগণের অংশগ্রহণ বা সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়সংক্রান্ত এই বিতর্ক দীর্ঘকালের। সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে অতীতে নানা ধরনের বিকল্প ভাবনার জন্ম হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তার একটি ধারা ইতালিয়ান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গায়েটানো মস্কা (তাঁর রচনা *The Rulling Class*) এবং জার্মান সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট মিচেলসের (তাঁর রচনা *Political Parties*) মতো তাত্ত্বিকদের রচনায় লক্ষ করা যায়। তাঁরা উভয়ে মিলে একধরনের এলিট তত্ত্বের পক্ষে ওকালতি করে গেছেন। সেখানে জনগণের ভূমিকাকে দেখা হয়েছে খুবই নগণ্য হিসেবে। তাঁরা কেন এলিট তত্ত্বের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন তার পেছনে বিশেষ দুটি ঘটনা প্রভাব রেখেছিল। ওই দুই ঘটনার মধ্যে তাঁরা একটি ঐতিহাসিক প্রবণতাও লক্ষ করেছিলেন। জনগণের সক্রিয় ভূমিকার কারণে যেসব সামাজিক পরিবর্তন এতকাল ধরে ঘটেছে সে পরিবর্তনগুলো স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, এই ছিল তাদের সিদ্ধান্ত। এ ক্ষেত্রে দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। প্রথম ঘটনা ঘটে রাশিয়াতে। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে জনগণের প্রত্যক্ষ এবং সশস্ত্র অংশগ্রহণে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জারের রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ওই রাষ্ট্রের চরিত্র ছিল Totalitarian এবং তার উদ্ভবের পেছনে জনগণের সমর্থন প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১৯৩৩ সালের দিকে। ওই বছর জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টিও জনগণের প্রত্যক্ষ সমর্থন নিয়ে ওই একই ধরনের একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। জার্মান জাতীয়তাবাদী অনুভূতিকে ব্যবহার করে হিটলার জনগণের বিপুল সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়। যে শাসনপদ্ধতি হিটলার প্রবর্তন করেছিল তাকে স্বৈরশাসন বা একনায়কতান্ত্রিক শাসন হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। তার অর্থ হচ্ছে জনগণের সক্রিয় ভূমিকার মধ্যে লোকপ্রিয় গণতান্ত্রিক মনস্তত্ত্ব থাকলেও সেই ভূমিকা স্বৈরশাসনের জন্ম দিতে পারে। এসব দৃষ্টান্তের কারণে জনগণের ভূমিকাকে অশুভ ধরে নেওয়া হয়। সে কারণে তাকে উপেক্ষা করে এলিট শাসনের পক্ষে এক বিশেষ ধারার জন্ম হয়েছিল, যেখানে এলিট শ্রেণির ওপর আস্থা রেখে রাষ্ট্রশাসনে

তার শক্তিশালী এবং বর্ধিত ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তারই ফলে গড়ে উঠেছে নানা জাতীয় এলিট তত্ত্ব, যার মধ্যে ইতিমধ্যে উল্লেখিত মস্কা এবং মিচেলের Iron law of oligarchy অন্যতম। ধ্রুপদি গণতান্ত্রিক তত্ত্ব এরপর থেকে প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিরোধিতা করে এসেছে। গণতন্ত্রসংক্রান্ত সুম্পিটারের তত্ত্ব তার একটি বড় উদাহরণ।

প্রখ্যাত রাজনীতি বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক জোসেফ সুম্পিটার জনগণের ভূমিকাকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি। তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ওই ভূমিকার পরিবর্তে এলিট শ্রেণির ভূমিকাকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন। তাঁর তত্ত্বকে সাধারণত এলিট সমঝোতার তত্ত্ব হিসেবে পরিচিতি দেওয়া হয়। ওই তত্ত্বে জনগণের সীমিত অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে, জোর দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন এলিট গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারার ওপর, সমঝোতার ওপর, কীভাবে অভ্যন্তরীণ সংঘাত এড়িয়ে এলিট শ্রেণির নানা গ্রুপ বা অংশ সম্মতিতে পৌঁছাতে পারে। সুম্পিটারের ধারণায় গণতন্ত্র রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি মাধ্যম মাত্র এবং নিতান্তই ক্ষমতাকেন্দ্রিক। তিনি গণতন্ত্রকে প্রতিযোগিতা হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতাকে কেবল এলিট শ্রেণির অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার মধ্যে সীমিত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। যাঁরা নির্বাচনে এলিট শ্রেণির পক্ষ থেকে পদপ্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাঁরা প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনে অংশ নিয়ে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন (Diamond, L, 1999, p 8) এবং জনগণের ভূমিকা সে ক্ষেত্রে হবে ভোটে অংশ নেওয়া এবং যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা।[৯]

সুম্পিটার গণতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে দেখার প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তার বদলে তাকে মানসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখার কথা বলেছেন। সেই ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করানো এবং তার অধীনে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, আইনগত ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা। এই অবস্থানকে যাঁরা ইতিবাচক মনে করেছেন এবং তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট ডাল। গণতন্ত্রকে সুম্পিটারের মতো করে তিনিও একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সাজানো একটি ব্যবস্থা হিসেবে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন, যার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে নির্বাচনী প্রক্রিয়া। ওই প্রক্রিয়ায় খুব স্বল্পসংখ্যক নেতার প্রাধান্য বা অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন। তারাই রাষ্ট্রপরিচালনায় মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং গণতন্ত্রকে নেতা নির্বাচনের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখবে। গণতন্ত্রের দায়িত্ব সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা নয়। জনগণের দায়িত্ব ভোট দেওয়া এবং সবচেয়ে ভালো পণ্যটি কেনা, ঠিক যেটি আমরা বাজারে হতে দেখি। পণ্য বলতে এ ক্ষেত্রে

বোঝানো হচ্ছে রাজনৈতিক নেতা বা ব্যক্তি। গণতন্ত্রে প্রার্থী বেচাকেনা হয়। জনগণ ক্রেতার ভূমিকা পালন করে। ভোটের মাধ্যমে তারা তাদের প্রতিনিধি কিনে দেশের শাসনভার তাঁদের হাতে তুলে দেয়। এই তাত্ত্বিক কাঠামোকে ক্ল্যাসিক্যাল ডকট্রিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনেকে এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন (Pateman, C, 1970, p.2)। ডাল[১০] একে পলিয়ারখি হিসেবে দেখার উপদেশ দিয়েছেন।

গণতন্ত্রের এই বিশ্লেষণ নিতান্তই গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াগত দিকের ওপর জোর দেয়। ডাল তাঁর *Elective Polyarchy* রচনায় সমাজে বিদ্যমান আর্থসামাজিক বৈষম্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার উপদেশ দিয়েছেন। সমাজকে অবিভাজিত জনসমষ্টি হিসেবে ধরে নিয়ে গ্রুপ, গোত্র বা সামাজিক বিভেদকে তাঁর মতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা শ্রেয়। কারণ জনগণ অভিন্ন কোনো স্বার্থ দিয়ে বাঁধা সমষ্টি নয়। বর্ণবিভক্তি, নারীর অবহেলিত সামাজিক অবস্থান গণতন্ত্রে বিবেচ্য নয়। ধর্মীয় বিভক্তির রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিফলের কথাও ভাবার প্রয়োজন নেই। সামাজিক বিভেদ, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে সমাজের অভ্যন্তরে যেসব পরিবর্তন ঘটে সেগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করেননি। প্রথাভিত্তিক সামাজিক উপাদানগুলো যেমন: ধর্ম, জাতি, বর্ণপ্রথা, ধর্মীয় বিভেদ, এমনকি ধর্মের অভ্যন্তরীণ বিভেদ বা জটিলতাকে গণতন্ত্রের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাকেও তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। সেগুলো বাস্তব জীবনে উপস্থিত থাকলেও তাকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্রকে ভাবতে হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সফল হওয়ার পর যা কিছু প্রথাগত, সামন্ততান্ত্রিক, অনাধুনিক সেগুলো দূর করা সম্ভব হবে বলে তাঁর বিশ্বাস। সে কারণে প্রথাভিত্তিক সামাজিক ফ্যাক্টরগুলো গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাপর্বে মূল্যহীন ভাবাই শ্রেয়।

এই তত্ত্ব আরও জোর দিয়েছে সমাজের এলিট প্রতিষ্ঠানের ওপর। আর সে কারণে ওই দুই গবেষকের তত্ত্বে এলিট শ্রেণির ওপর গণতন্ত্রের সব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এলিট প্রতিষ্ঠান বলতে তিনি আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝিয়েছেন যার মধ্যে ব্যাংক, বিমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন রাষ্ট্রধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এগুলো সমাজের স্থায়ী এবং কাঠামোর দিক থেকে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা মূল প্রতিষ্ঠান। সে কারণে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন এবং গণতন্ত্রের পক্ষশক্তি হিসেবে দেখা প্রয়োজন। তারাই গণতন্ত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। সে কারণে গণতন্ত্রের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ওই সব প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সংস্কার কীভাবে হচ্ছে তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। এরই বিপরীতে যেসব প্রতিষ্ঠান সমাজে স্বীকৃতির অপেক্ষায় আছে, যেগুলো সমাজের অভ্যন্তরে নতুন নতুন পরিবর্তনের কারণে কেবল গড়ে উঠতে শুরু করেছে, সেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবার প্রয়োজন নেই বলে তিনি মনে

করেন। একইভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নেতার গুণ, বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক অবস্থান, অতীত জীবন ইত্যাদি ওই তত্ত্বে জনগণের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান মনে করেছিলেন। দলীয় নীতি বা দর্শনকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয় না। রবার্ট ডালের মতো মস্কা এবং মিচেলও ওই একই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং জনগণের ভূমিকাকে প্রাধান্য দেওয়ার রীতিকে আক্রমণ করেছিলেন। তাঁদের মতে, যেকোনো জটিল সমাজে হয় এলিট শ্রেণি নতুবা সাধারণ মানুষ শাসন (গণতন্ত্র) করবে। এরা উভয়ে একসঙ্গে কাজ করতে পারে না (Pateman, C 1970, p.2)। জনমানুষের অংশগ্রহণ সামাজিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে। সে কারণে কেবল এলিট শ্রেণিকে শাসনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া শ্রেয়। বোধগম্য যে জনগণের ভূমিকাসংক্রান্ত যেসব ধ্রুপদি ধারণার সঙ্গে আমরা ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছি, তাদের প্রতি এই তাত্ত্বিকদের ছিল গভীর সন্দেহ।

তবে জনগণের ভূমিকাকে যতই অস্বীকার করা হোক না কেন, এই তত্ত্বের মূল দুর্বলতার একটি দিক খুবই স্পষ্ট। সেটি হচ্ছে, গণতন্ত্রকে নিছক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা এবং গণতন্ত্রকে সীমিত অর্থে বোঝা। প্রক্রিয়াগত দিক বলতে সঠিক সময়ে নির্বাচন হচ্ছে কি না, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত আছে কি না, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি আছে কি না, রাজনীতিতে আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে কি না ইত্যাদিকে বোঝায়। ফলে গণতন্ত্রকে কীভাবে মজবুত করা যাবে তার কোনো স্ট্র্যাটেজি ওই তত্ত্বে তুলে ধরা হয়নি। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক ক্ষেত্রে জটিলতাগুলোর প্রতি মনোযোগ না দেওয়ায় আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সত্যিকার পরিবর্তন যা কি না গণতন্ত্রের ভিতকে শক্ত করতে সাহায্য করে, সে সম্পর্কে এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ উদাসীন। গণতন্ত্রকে অবশ্যই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়কে গুরুত্ব দিতে হবে। রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রাতিষ্ঠানিক আকার, জাতিগত রূপ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিকগুলোকে গণতন্ত্রের সংগ্রাম থেকে বাদ দিলে শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র কীভাবে ব্যর্থ হয় সেটি আমরা ইতিমধ্যে 'আরব বসন্ত' বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি।

এই অবস্থানটি অবশ্য কোনো আকস্মিক প্রবণতা নয়। পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্রকে এলিট গোষ্ঠীর দায়দায়িত্ব হিসেবে দেখার দীর্ঘ ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লারি ডায়মন্ড এলিটকেন্দ্রিক এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা হিসেবে উত্তরণকালীন গণতন্ত্রেও এলিট শ্রেণির ওপর ওই বিশেষ দায়িত্ব দিতে আগ্রহী। এলিট শ্রেণি যদি নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক বিবাদের সীমানা এবং পরিধিকে সংকুচিত করার ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করাতে পারে তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তারা যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলে তার ধারণা। এলিট শ্রেণিভিত্তিক গণতন্ত্রকে চালু রাখতে গেলে সমাজে

ক্ষমতার নানা কেন্দ্রের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হয়। সমাজে ক্ষমতার নতুন নতুন কেন্দ্র গড়ে ওঠে নানা সময়ে নানা কারণে। যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁরা প্রতিনিয়ত উদীয়মান রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির মুখোমুখি হন এবং দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। সেই দ্বন্দ্বের মীমাংসা যদি শান্তিপূর্ণভাবে সম্ভব হয়, তাহলে বিবাদরত ক্ষমতার কেন্দ্রগুলো নিজেদের মধ্যে সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দেশ শাসনে সম্মত হয়। এভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব বলে তার ধারণা।

আমাদের দেশীয় এলিট শ্রেণির প্রধান দুর্বল দিকটি গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় প্যারাডক্সের সঙ্গে যুক্ত। প্যারাডক্সটি হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে সমঝোতার। গণতন্ত্রে প্রতিযোগিতা এবং সমঝোতা একই সূত্রে গাঁথা। কেবল প্রতিযোগিতা বা কেবল সমঝোতা দিয়ে গণতন্ত্র হয় না। প্রয়োজন হয় এই দুইয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক মিশ্রণ। কখনো সমঝোতা কখনো প্রতিযোগিতা—এই মিশ্রণ আমাদের এলিট শ্রেণির রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা রাজনীতিকে এখনো পুরোনো ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে রেখে বুঝতে চায়। সে কারণে প্যারাডক্সটি আমাদের দেশে গণতন্ত্রের জন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মরণফাঁদ।

গণতন্ত্রকে এমন একটি ব্যবস্থা হিসেবে আমরা জানি যেখানে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে নানান রাজনৈতিক দল প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। সেখানে দলীয় কর্মীরা প্রচারণা চালায়। দলের সুনির্দিষ্ট ম্যানিফেস্টো থাকে। প্রতিযোগিতা সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। তার অর্থ হচ্ছে, প্রতিযোগিতা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঘটে। সেই প্রতিযোগিতার নীতিমালা থাকে। সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে ওই প্রতিযোগিতার কাঠামো থাকে। নির্বাচনী প্রতিযোগিতার ফল হিসেবে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সেখান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থানান্তরিত হয় সংসদে, যেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে নীতি বা আইনের ওপর বিতর্কে অবতীর্ণ হন। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা অনেক সময় অতিমাত্রায় তীব্র রূপ ধারণ করে। সেই তীব্রতা নানা ইস্যুকে কেন্দ্র করে ঘটতে পারে। সংসদ অধিবেশনে গণপ্রতিনিধিরা উত্তেজিত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান গ্রহণ করতে পারেন। প্রতিযোগিতার তীব্রতা সীমারেখা অতিক্রম করলে পুরো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে একদিকে যেমন প্রতিযোগিতার আবশ্যকতা থাকে, তেমনি থাকে সমঝোতার। প্রতিযোগিতা ও সমঝোতার মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য গড়ে তোলা না গেলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এই দুইয়ের সম্পর্ককে আগেই প্যারাডক্স হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ প্রতিযোগিতা এক দিক থেকে সমঝোতার বিপরীত। সমঝোতাও প্রতিযোগিতার বিপরীত। অথচ এই দুইয়ের সমন্বয় বা

উপস্থিতি ব্যতীত গণতন্ত্রকে ভাবা কঠিন।

বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব অত্যন্ত অপরিপক্ব। এখানে রাজনৈতিক এলিট শ্রেণি গণতন্ত্রের কৌশলী দিক সম্পর্কে সচেতন নয়। মতৈক্য ও সমঝোতা দিয়ে বিরোধ এবং দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হলেও এ দেশের এলিট শ্রেণি এখনো সেই কৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি। নানা ধরনের সমঝোতা, এক পা পিছিয়ে আসা, বিরোধী শক্তির সঙ্গে বিশেষ ক্ষেত্রে কৌশলগত আপসের রাজনৈতিক মূল্য থাকলেও সামন্তবাদী একগুঁয়েমির কারণে ওই কৌশল রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়নি। দেশের এলিট শ্রেণি সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলেনি। কোন ধরনের ব্যবহার সঠিক, কোনটি সঠিক না, তারা তাদের ব্যক্তি জীবনের উদাহরণ দিয়ে দেখাতে পারে। তাদের নেতিবাচক ব্যবহার এখানে বরং অন্যদের নেতিবাচক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ থেকে রাজনৈতিক এলিটদের সঙ্গে বাকি এলিটদের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, যেটি দেশীয় গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়। বিরোধী রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং অবস্থানকে যে এলিট গোষ্ঠী গ্রহণ করতে পারে না তার পক্ষে প্রয়োগবাদী এবং নমনীয় হওয়াও কঠিন। তাদের চিন্তা থাকে স্থির, আদর্শ পরিচালিত। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিশ্বাস বা সমঝোতা গড়ে ওঠে না। সে কারণে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় ভদ্রতা ও অন্যের মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ঐতিহ্য এখানে গড়ে ওঠেনি।

এলিট শ্রেণির সেই অপরিপক্বতা দূর করা যেত যদি শাসকশ্রেণি দুই ইতালীয় চিন্তাবিদ ম্যাকিয়াভেলি বা প্যারেটোর এলিট তত্ত্বের সঙ্গে কিছুটা অন্তত পরিচিত হতেন। তারা উভয়ে এলিট শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন দুটি অর্থে। একটি ব্যাপক অর্থে, যেখানে সমাজের সব এলিটকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে এলিট বলতে প্যারেটো দেখেছেন ক্ষুদ্র এক গ্রুপকে, যারা কাজের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে এবং পেশার স্তরবিন্যাসে সবচেয়ে উঁচু স্থানে অবস্থান করছে। ব্যবসায়ী, আর্টিস্ট, সফল রাজনীতিবিদ, প্রফেসরের মতো পেশাজীবী মানুষ ব্যাপক অর্থে এলিট। তবে এই এলিটদের গুরুত্ব কম। সংকীর্ণ অর্থে এলিট বলতে সরকারি বা রাজনৈতিক এলিটকে বোঝায়। সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত এলিট সংখ্যায় নগণ্য হতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনায় এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণে তারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ফলে সমাজের ধরন নির্ভর করে এই ক্ষুদ্র এলিট গোষ্ঠীর চরিত্র এবং রাজনৈতিক পারদর্শিতার ওপর। এলিট শ্রেণির এই অংশ বৃহৎ অংশকে তত্ত্বীয়ভাবে শাসন করে দুটি উপায়ে। শক্তি অথবা ছলনা দিয়ে। সেদিক থেকে রাজনৈতিক এলিটকে দুই গোত্রে ভাগ করা যায়। যারা শক্তি প্রয়োগে শাসন করতে উদ্যোগী হয় তারা সিংহ পরিবার নামে পরিচিত। যারা চাতুর্য এবং ছলনা দিয়ে শাসনের ক্ষমতা রাখে তারা

শৃগাল পরিবারের। প্যারেটো বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন the instinct for combination এর ওপর, অর্থাৎ শৃগাল এবং সিংহের যে প্রবৃত্তি, সেই উভয় প্রবৃত্তির সমন্বয়ের ওপর। এই গুণ আয়ত্ত করে চিন্তা ও বাস্তবতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে পারদর্শী হওয়া এলিট শ্রেণির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এরই মধ্য দিয়ে এলিট শ্রেণির মধ্যে সংযতাচার, আপসরফার মনোভাব এবং চুক্তিতে পৌঁছাতে আলাপ-আলোচনার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। বিশ্বের প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক এলিট এই দক্ষতা কোনো না কোনোভাবে অর্জন করে। দলগত সংঘাত এবং দলীয় তিক্ততা উপশমে আমাদের দেশে এলিট শ্রেণি ওই দক্ষতা থেকে অনেক দূরে। অথচ এই দক্ষতাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একমাত্র পথ।

জোসেফ সুম্পিটার বা রবার্ট ডালের তত্ত্ব পশ্চিমা দেশের ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও উন্নয়নশীল দেশে তার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা সুম্পিটারের তত্ত্বকে অনেকাংশে নাকচ করে দেয়। Agustin Cueva (1976) তাঁর *El desarroll del capitalism en America Latina*, Mexico City: Siglo XX1 লেখা রচনায় উল্লেখ করেছেন যে লাতিন আমেরিকায় যেসব বুর্জোয়া বিপ্লব (এলিট শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লব) অনুষ্ঠিত হয়েছে তার কোনোটিই গণতন্ত্রের কথা বলেনি। লাতিন আমেরিকার বুর্জোয়া শ্রেণির এজেন্ডাতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনো উল্লেখ নেই। মেক্সিকোতে ১৯১০ এবং ১৯১৭ সালে বুর্জোয়া বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গুয়াতেমালায় ১৯৪৪ সালে, বলিভিয়ায় ১৯৫২ সালে এবং ব্রাজিলে ১৯৬৪ সালে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে ওই বিপ্লবের একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যেভাবেই হোক পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা। সেখানে রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের কোনো উল্লেখ বা তার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নেই। বুর্জোয়া শ্রেণি গণতন্ত্রের বদলে বরং একধরনের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন দিয়ে দেশ চালিয়েছে। লাতিন আমেরিকায় অধিকাংশ সময় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে এবং সামরিক বাহিনী দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণি দেশ শাসনকে পছন্দ করেছে। তারা মনোযোগী থেকেছে অর্থের প্রতি, পুঁজির বিকাশের প্রতি। ফলে ওই স্বৈরাচারী শাসনের শেকড় সেখানে অতীতকাল থেকে প্রোথিত হয়ে আছে এবং সেখানে কোনো পরিবর্তন আনার কথা বুর্জোয়া গোষ্ঠী বা এলিট শ্রেণি ভাবেনি। গণতন্ত্রের প্রতি লাতিন আমেরিকার বুর্জোয়া শ্রেণি কিছু দুর্বলতা দেখিয়েছে কেবল সোভিয়েত ব্যবস্থার পতনের পর। কিন্তু সেখানেও গণতন্ত্রকে সুম্পিটারের মতো কেবল নির্বাচনী প্রক্রিয়া হিসেবেই ভাবা হয়েছে। গণতন্ত্র বলতে আইনগত এবং শাসনব্যবস্থাগত একটি কাঠামো গড়ে তোলা এবং নৈতিকতাশূন্য এক ব্যবস্থা হিসেবে ভাবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে এলিট শ্রেণি নিজেদের

পরিচালিত কোনো বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেনি। এলিট শ্রেণি এখানে ক্ষমতায় এসেছে সামরিক শাসনের মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থান নতুন এলিট শ্রেণি গঠনে সাহায্য করে এবং পুরোনো এলিট শ্রেণিকে বদলিয়ে দেয়। এই এলিট শ্রেণি গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে নয়, সামরিক একনায়কতন্ত্রের সাহায্যে রাষ্ট্রক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত রাখে। সেদিক থেকে লাতিন আমেরিকার এলিট শ্রেণির সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক এলিটের কেবল সাদৃশ্য নয়, বরং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার ব্যর্থতার ধারাবাহিকতাও লক্ষণীয়।

কিন্তু ৯০-এর দশক থেকে লাতিন আমেরিকায় যে গণতন্ত্রায়ণ আমরা লক্ষ করেছি, সেই গণতন্ত্রে সিভিল সমাজের ভূমিকার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এলিট গোষ্ঠী। ওই এলিট শ্রেণি গণতন্ত্রকে যদিও কেবল প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছে। তার ঐতিহাসিক কারণও আছে। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রায়ণ ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে। ইকুয়েডর, বলিভিয়া ও পেরুতে ১৯৭০ সালের শেষের দিকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় আসেন। মধ্য আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও চিলিতে গণতন্ত্র আসে ১৯৮০ বা ৯০-এর দশকে। মেক্সিকোতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের নির্বাচনের পর। এসব দেশ গণতন্ত্রের ন্যূনতম সংজ্ঞা অর্থাৎ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র হাতে পেয়েছে। তারা দীর্ঘকাল সামরিক একনায়কতন্ত্রের অধীনে শাসিত হলেও পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে সামরিকতন্ত্রের অভ্যন্তরে বেশ বড় ধরনের বিবর্তন ঘটে। বিবর্তনটি সামরিক বাহিনীকে অনেক বেশি আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে পরিণত করে। এই আমলাতন্ত্রই কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের মূল মেরুদণ্ডে পরিণত হয়। ফেরনান্দ কারডোসো এই আমলাতান্ত্রিকীকরণের কারণ হিসেবে দুটি প্রবণতাকে তুলে ধরেছেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, সামরিক বাহিনীর পেশাগত ক্ষেত্রে পরিপক্বতা এবং বামপন্থী গেরিলা যুদ্ধে সামরিক বাহিনীর অভিজ্ঞতা (Cardoso, Fernando 1986, p. 24)। ১৯৬৪ সালের দিকে ব্রাজিলে সামরিক বাহিনীর মধ্যে উদারনৈতিক গণতন্ত্রী সামরিক অফিসারদের বিশেষ একটি অংশের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ওই গণতন্ত্রী চরিত্রকে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি বামপন্থী গেরিলা যুদ্ধের কারণে। অ্যালফ্রেড স্টেপান তাঁর *দ্য মিলিটারি ইন পলিটিকস* (নেওয়া হয়েছে Cardoso, Fernando 1986, p. 24) নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে পেশাজীবী সামরিক বাহিনীর পক্ষে একটি রাষ্ট্রের চরিত্রকে গণতান্ত্রিক এবং লিবারেল হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষমতা থাকে। সামরিক বাহিনী বিপ্লব ঝঞ্ঝা লাতিন আমেরিকায় কিছুটা স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম হলেও গেরিলা যুদ্ধ সেখানে এতই জটিল এবং দীর্ঘ ছিল যে ওই স্থিতিশীলতা বেশিদিন টেকেনি। তা ছাড়া দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার কারণে সামরিক বাহিনী আমলাতান্ত্রিক ও কর্তৃত্ববাদী শক্তিতে পরিণত হয়।

গুলিয়েমো ওডোনেল দেখিয়েছেন লাতিন আমেরিকায় সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক দলগুলোকে অনেকটা অলংকারের মতো ব্যবহার করে এসেছে। ঠিক বাংলাদেশে জিয়াউর রহমানের সময় যেটি ঘটেছিল। জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর পার্লামেন্ট বাতিল করেন, যদিও তিনি ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন এবং গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত সংলাপের ফলে প্রকাশ্য রাজনীতির দরজা খুলে গেলে প্রায় ৬০টি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। এরই মধ্যে রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টিতে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। মুসলিম লীগের শাহ আজিজুর রহমানকে প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর পক্ষে আনতে তিনি সক্ষম হন। আওয়ামী লীগকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে মিজানুর রহমান ও মাওলানা তর্কবাগীশকে দিয়ে নতুন দল গঠন করান। ওসমানীর জাতীয় জনতা পার্টি, খোন্দকার মোশতাকের গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট তৈরির পাশাপাশি তাঁর পক্ষে ভাসানী ন্যাপের অভ্যন্তরে ভাঙন ধরানো সম্ভব হয়। মসিউর রহমান ও এস এ বারীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ জিয়াকে সমর্থন জানায়। পরে তাঁরা জিয়ার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগ দেন। আতাউর রহমান খানের ইউনাইটেড পিউপিলস পার্টি বিভক্ত হয়ে এক অংশ কাজি জাফর আহমদের, অন্য অংশ ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে জিয়ার দলে যোগ দেন। সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রকে জিয়া তার সমর্থনের ঘাঁটি হিসেবে তৈরি করেন। মুসলিম লীগ ও ইসলামী পার্টির সমর্থন আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। বেশ কিছু প্রগতিবাদী দল, যারা শেখ মুজিবের বিরোধিতা করে এসেছিল, তারাও জিয়ার সঙ্গে যোগ দেয়। ফলে রাজনীতিতে বিভেদ ও হিংসার মনোভাব সৃষ্টিতে জিয়ার মতো পারদর্শী আর কেউ ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি দলীয় রাজনীতির চেয়ে ব্যক্তি রাজনীতিকে উৎসাহিত করেছিলেন। ১৯৭৭ সালের নির্বাচন বাতিল করে ধাপে ধাপে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ গ্রহণ করে প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, পরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং সবশেষে সংসদ নির্বাচনের পরিকল্পনা করেন। ইতিমধ্যে বিচারপতি সায়েমকে স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে অপসারণ করে নিজে প্রধান মার্শাল ল প্রশাসক হন। এভাবে গড়ে ওঠে একটি আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের আঁতাত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তারপরও লাতিন আমেরিকার মতো বাংলাদেশেও আসল ক্ষমতার অধিকারী থাকে সামরিক বাহিনী এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো।

সেটি লাতিন আমেরিকায় ৯০-এর দশক থেকে লক্ষ করা গিয়েছিল, যখন ধীরে হলেও লাতিন আমেরিকার অভ্যন্তরীণ বাজার আন্তর্জাতিক প্রভাবের আওতায় আসে। অনিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তি উদ্যোগ এবং বাণিজ্যে উদারনৈতিকীকরণের মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো লাতিন আমেরিকায় প্রচুর বিনিয়োগ করে। অর্থনীতিতে

বাজারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বামপন্থী সমবিতরণের যে নীতির ঢেউ লাতিন আমেরিকায় প্রবহমান ছিল এবং যার কিছু প্রভাবে উন্নয়নকে বিভিন্ন রাষ্ট্র তার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে এগিয়েছিল, সেই নীতির ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। এই সময়ে তিনটি প্রধান শক্তির মধ্যে অংশীদারি গড়ে ওঠে। সেগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রীয় খাত, ব্যক্তিগত খাত এবং বহুজাতিক করপোরেশন। এই তিন শক্তির প্রভাবে আগের কৃষি রপ্তানিভিত্তিক এবং স্বনির্ভর অর্থনৈতিক মডেল যা কিনা একটি স্বনির্ভর বাজারের চাহিদা মেটাত, তার স্থান দখল করে নেয় বৃহৎ ব্যক্তিমালিকানা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা। সেই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাজার সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিকীকরণের শিকার হয়। ফলে শহরকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে মাস সোসাইটি। যে গ্রাম এত দিন এই প্রভাবের বাইরে ছিল এবং সব ধরনের প্রভাব থেকে নিজের গা বাঁচিয়ে রাখছিল সেখানেও পুরোনো কাঠামোর অভ্যন্তরে পুঁজির সঞ্চয়ন ঘটতে থাকে এবং আধুনিকীকরণের প্রভাব দৃশ্যমান হয়।

এই প্রক্রিয়ার শেষ ফলাফল হচ্ছে, সামরিকতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্রায়ণের বাণী চারদিকে ছড়িয়ে পড়া। এরই মধ্য দিয়ে যে নতুন শ্রেণি গড়ে ওঠে সেই শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরোনো সব শ্রেণি থেকে ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবসায়ী, কারিগর, পরামর্শদাতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাজীবী শ্রেণি এবং ছাত্রসমাজ এদের চিন্তার জগতে বিশাল পরিবর্তন আসে। তারা এখন কথা বলে উৎপাদন নিয়ে, প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক বিনিয়োগ, বাণিজ্য, লাভ-লোকসান ইত্যাদি নিয়ে। তারা সামরিকতন্ত্রের সংকীর্ণ সাংস্কৃতিক জগতের দিকে তাকিয়ে নিজেদের সীমানাকে চিহ্নিত করতে আর প্রস্তুত নয়। সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনও বিশেষ ভূমিকা রাখে। চেতনাগত ওই পরিবর্তনের সঙ্গে আরও যুক্ত হয় ধর্মযাজক, বিশপ শ্রেণি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক বন্দীদের আত্মীয়স্বজন। তাঁরাও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তার ফলে সামরিকতন্ত্রের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব বা বিবর্তন দেখা দেয়, যার প্রভাবে উদারনীতির প্রতি বিশেষ আগ্রহ জন্মে এবং তা থেকে গণতন্ত্রে। এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে গণতন্ত্রায়ণের গভীর সম্পর্ক আছে। চিলি ছাড়া অন্যান্য দেশে অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসেছে গণতন্ত্রের পরে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন গণতান্ত্রিক সরকারের ভিতকে আরও শক্ত করতে সাহায্য করেছে। ব্যক্তি খাতের প্রসারের কারণে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমে এসেছে। সিভিল সমাজের বিস্তার নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিয়ে ব্যক্তি খাতকে শক্ত করার কারণে সমাজে দারিদ্র্য ও অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

Atilio Boron (১৯৯৮)-এর মতো অনেক গবেষক লাতিন আমেরিকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে সেখানে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়ে স্বৈরশাসনের দিকে ঢলে পড়বে বা সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করবে, এ ধরনের

ঝুঁকি সেখানে নেই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু গণতন্ত্রের বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, গণতন্ত্র সেখানে মানুষের মনে কোনো আশা জাগাতে পারেনি।[১১] সেই আশা জাগানোর জন্য দুটি প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে, গণতন্ত্র মানুষের মধ্যে ন্যূনতম সমতার লক্ষ্যে কাজ করল কি না বা ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করল কতটুকু। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় নাগরিক সমাজের প্রতিটি সদস্য কথায় বা বাস্তবে স্বাধীনতা অনুভব না করলে, অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক সমতার কথা না ভাবলে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়।[১২] এগুলো অন্তর্ভুক্ত না হলে গণতন্ত্র সম্পর্কে মানুষের মনে কোনো গভীর অনুভূতি গড়ে ওঠে না এবং মানুষের অনুমোদন লাভ সে কারণে সম্ভব হয় না। এটি লাতিন আমেরিকার মতো আমাদের দেশের এলিট শ্রেণির ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা কাটিয়ে না উঠলে গণতন্ত্র যে উভয় ক্ষেত্রে ব্যর্থ হবে, সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না।

Sheri Berman দেখিয়েছেন যে ইউরোপে গণতন্ত্র সফল হয়েছে কেবল উদারনীতির কারণে নয় বা সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার কারণেও নয়। সেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মুখ্য ভূমিকা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে এবং জনগণের সমর্থন পেয়েছে। ইউরোপে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলো যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক তাদের অর্থনীতিতে জনকল্যাণমূলক নানা নীতি প্রবর্তন করে ভিন্ন ধাঁচের এক সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। গণতন্ত্র বিকশিত হওয়ার জন্য সমাজকে কেবল কাঠামো হিসেবে ভাবা যথেষ্ট নয়।[১৩] ফলে সুম্পিটার বা ডাল গণতন্ত্র সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এলিট শ্রেণির ভূমিকাসংক্রান্ত যে তত্ত্বের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন সেটি পুরোপুরি আমাদের দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভাবা যায় না। জনগণের অংশগ্রহণ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এলিট শ্রেণি যদি আন্তর্জাতিক পুঁজির পক্ষে কথা বলে, দেশীয় বুর্জোয়া গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে গণমানুষের ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত ক্ষেত্রগুলোকে যদি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাহলে সেই গণতন্ত্র আমাদের মতো দেশে সফল হবে না এবং এলিট শ্রেণির পক্ষে গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশ শাসনও বাধাগ্রস্ত হবে।

টিকা :

১. ফুকুয়ামা লিখেছে What we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such: that is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government.' Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (1992).

২. Plamenatz রুশো সম্পর্কে বলেছেন He turns his minds…to consider how the social order affects the structure of human personality (vol.1, p. 440), and it is the psychological impact of social and political institutions that is Rousseau's main concern, which aspect of men's characters do particular institutions develop? (দেখুন Pateman, 1974, p. 24).

৩. মিলস তাঁর Political Ecomony তে লিখেছেন a democratic constitution not supported by democratic institutions in detail, but confined to the central government, not only is not political freedom, but often creates a spirit precisely the rverse (দেখুন Pateman 1974, p. 30).

৪. মিলসের দাবিটি এ রকম : It is no use having universal suffrage and participation in national government if the individual has not been prepared for this participation at local level. It is at this level that he learns how to govern himself (দেখুন Pateman 1974, p. 30).

৫. কোল লিখেছেন, The object of social organization is not merely material efficiency, but also essentially the fullest self expression of all the members. Self expression involves self government and this means that we must call forth the people's full participation in the common direction in the affairs of the community. (দেখুন Pateman 1974, p. 36).

৬. He also says, the abstract democracy of the ballot box did not involve real political equality, the equality of citizenship implied by universal suffrage was only formal and it obscured the fact that political power was shared very unequally. (Pateman 1974: 39). His conclusion is- individuals and their institutions cannot be considered in isolation from one another.

৭. Liberal democracy is not meant to be so much about empowering people as it is about protecting their liberties and allowing them to pursue their own interests unimpeded….. This approach to democracy corresponds with Schumpeter's seminal definition of democracy. (Hudson, C 2012, p. 444).

৮. A political movement that emphasizes the interests, cultural traits, and spontaneous feelings of common people, as opposed to those of a privileged elite. For legitimation, populist movements often appeal to the majority directly-through mass gatherings, referendums, or other forms of popular democracy-without much concern for checks and balances or the rights of minorities. (Taken from Plattner Mark 2010, p.88)

৯. As a political method, that is to say, a certain type of institutional arrangement for arriving at political – legislative and administrative – decisions. (Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy,

1943, p 242)?

১০. ডালের রচনার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে, A Preface to Democractic Theory (1956) and Hierarchy, Democracy and Bargaining in Politics and Economics? এখানে গণতন্ত্রকে এভাবে দেখা হচ্ছে, Democracies are political systems characterized by popular participation, genuine competiton for executive office, and institutional checks on power. (নেওয়া হয়েছে Joseph Siegle and etal 2004, p.1 থেকে)

Necessity for individual attitudes and psychological qualities to be developed. Major function is therefore educational in a very widest sense (democratic skills, procedures etc)? All political systems to be democratized Industry and local governments. (Pateman 1974, p. 42-43)

Dahl has defined political system as "any persistent pattern of human relationship that involves to a significant extend power, rule or authority" in (Pateman 1974: 44). (এই সংজ্ঞা ডালের ১৯৬৩ সালে লেখা পৃষ্ঠা ৬-এ পাওয়া যাবে)

১১. The fact that the major threat besieging democracy in Latin America (and it should be added, in industrialized democracies as well) is not so much a "blatant authoritarian regression" but the loss of purpose and meaning of democracy due to its lack of depth, poor quality, unfairness, and incompleteness (Aguero 1994, 5-7) in Boron Atilo A (1998) Faulty Democracies? A Reflection on the Capitalist "Fault Lines" in Latin America.

১২. আলেন টোরেন লিখেছেন, democracy is more than a political project; it is also a moral ethical project. According to Touraine "democracy is the subordination of the organization of society – and of political power in particular- to one objective that is not social but moral; the liberation of everyone" (Varas, 1998, p.148 থেকে নেওয়া).

১৩. The success of democracy in Western Europe since World War Two has been misattributed to liberalism. The consolidation of democracy in Europe was due to the protection of economic and social rights through the welfate state. (Berman 2006, 2010, p. 50).

গ্রন্থপঞ্জি

Agustin Cueva (1976) *El desarroll del capitalism en America Latina*, Siglo XX1, Mexico City.

Berman, S (2006) *The Primacy of Politics*, Cambridge University Press, Cambridge.

Berman Sheri (2007) How Democracies Emerge: Lessons from Europe, *Journal of Democracy*, Volume 18, Number 1. pp. 28-41

Berman, S (2011) The past and future of social democracy and the consequences of democratic promotion. In: Hobson C and Kurki M (eds) *The Conceptual Politics of Democracy Promotion*. Routledge, London.

Boron Atilo A (1998) Faulty Democracies? A Reflection on the Capitalist "Fault Lines" in Latin America, In Aguero, Felipe and Jeffrey Stark (ed) Fault *Line of Democracy in Post-Transition Latin America,* North-South Centre Press, University of Miami

Bryan Caplan (2007) *The Myth of Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies,* Princeton University Press, Princeton

Cardoso, Fernando Henrique, (1986), Democracy in Latin America, in: *Politics Society*, 15: 23.

Cohen Carl (ed) (1962) *Communism, Fascism and Democracy: The Theoretical Foundation,* Random House, New York, 1962, P. 424.

Diamond, Larry (1999), *Developing Democracy: Towards Consolidation*, The John Hopkins University Press, Baltimore.

Fukuyama, Cardoso, Fernando Henrique (1986) Democracy in Latin America, *Politics & Society*, 1986, 15:23

Fukuyama, Francis (1992) *The End of History and the Last Man*, Free Press, NY.

Gilley, Bruce, (2009) Is Democracy Possible? *Jornal of Democracy*, Vol 20, N 1, pp. 113-127

Held, David (1987), *Models of Democracy,* Polity Press, Oxford.

Held, D (2006) *Models of Democracy*, 3rd edn, Polity Press, Cambridge.

Huntington, (1991) Democracy's Third Wave, Journal of Democracy Vol. 2. No. 2, pp.12-34

Macpherson, CB (1977) *The Life and Times of Liberal Democracy*, Oxford University Press, Oxford.

Masoud Tarek (2014) The Ups and Downs of Islamism. A book review on Shadi Hamid's book "Temptations of Power: Islamists and Illiberal Democracy in a New Middle East" in *Journal of Democracy*, Volume 25, Number 3, pp. 170-174

Pateman Carole, (1970) *Particiption and Democratic Theory*, Cambridge University Press, Cambridge

Pinkney, Robert, (2003) *Democracy in the Third World*, Lynne Rienner Publishers, London.

Plattner Marc (2010), Populism, Pluralism, and Liberal Democracy, *Journal of Democracy,* Volume 21, Number 1 pp. 81-92

Posner Richard (2003) *Law, Pragmatism and Democracy*, Harvard University Press, Cambridge

Plattner, Mark, (2015) Is Democracy in Decline, *Journal of Democracy*, January, Volume 26, Number 1.pp. 5-10

Raby, D. L. (2006) *Democracy and Revolution: Latin America and Socialism* Today, Pluto Press, London.

Reece Jones, (2011) Dreaming of a Golden Bengal: Discontinuities of Place and Identity in South Asia, *Asian Studies Review*, September 11, Vol.35, pp. 373-395

Robert Goodin, (2010) Global Democracy: in the Begining, *International Theory* 2.2, pp. 175-209

Roy Olivier (2012) The Transformation of The Arab World, *Journal of Democracy*, Volume 23, Number 3, PP 5-18

Roy Olivier and Wittes, Tamara Cofman (2008) Three Kinds of Movements, *Journal of Democracy*, Volume 19, Number 3, pp. 7-27

Schedier, Andreas (2000), The Democratic Revelation, *Journal of Democracy*, Volume 11, Number 4, October, pp. pp. 5-19

Schumpeter, J. A (1943), *Capitalism, Socialism and Democracy,* Geo, Allen and unwin, London

Sorensen, George *(*1998) *Democratisation in the Third World, The Role of Western Politics and Research,* Purdue University: West Lafayette.

Spina, Nicholas & others (2011). Confusianism and Democracy: A Review of the Opposing Conceptualisation, *Japanese Journal of Political Science* 12(1), 143-160.

Stockton, David (2002) *The Classical Athenian Democracy*, Oxford, Oxford University Press.

Vali, Nasr, (2005) The Rise of "Muslim Democracy", *Journal of Democracy*, Volume 16, Number 2, pp. 13-27.

খাতি
সমাজ
চিন্তা

সেক্যুলারিজমের রূপ ও রূপান্তর

আলী রীয়াজ

সারসংক্ষেপ

কয়েক দশক ধরে বিশ্বজুড়ে সমাজবিজ্ঞানী ও নীতিনির্ধারকদের অন্যতম আলোচনার বিষয় হচ্ছে সেক্যুলারিজম। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই নানাভাবে সেক্যুলারিজম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা পরিবর্তন চলমান এই আলোচনায় যোগ করছে নতুন নতুন মাত্রা ও বৈচিত্র্য। সেক্যুলারিজম নিয়ে অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যা এবং গভীর বিশ্লেষণ উভয়ই বিদ্যমান। সুতরাং এটা দাবি করা যায় যে, সেক্যুলারিজম বৈচিত্র্যহীন একক কোনো বিষয় নয়। মতাদর্শ এবং রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে এর বিভিন্ন ধরন আছে এবং এটি একটি বিতর্কিত এবং বিতর্কযোগ্য বিষয়। এসব বিষয় মাথায় রেখে এই প্রবন্ধে সেক্যুলারিজম ধারণাটির বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গির একটি সমালোচনামূলক আলোচনা হাজির করা হয়েছে। একই সাথে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সেক্যুলারিজম ধারণাটির রূপান্তরসমূহ, রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি হিসেবে সেক্যুলারিজমের ধারণাগুলো এবং অপশ্চিমা সমাজগুলোতে রাষ্ট্র ও সেক্যুলারিজমের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি হিসেবে সেক্যুলারিজমকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে 'সেক্যুলার রাষ্ট্রের' চারটি মডেলের উদ্ভব হয়েছে। এগুলোকে সাধারণভাবে ফরাসি, ব্রিটিশ, আমেরিকান এবং ভারতীয় মডেল হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই মডেলগুলো সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

সেক্যুলারিজম, সেক্যুলারকরণ, ধর্ম এবং রাজনীতি, জনপরিসর ও ব্যক্তিপরিসর।

বিশ্বজুড়ে কয়েক দশক ধরে ধারণা, প্রপঞ্চ, বিশ্ববীক্ষা এবং রাষ্ট্রপরিচালনার ধরন হিসেবে সেক্যুলারিজম সমাজবিজ্ঞানী এবং নীতিনির্ধারকদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আক্ষরিক এবং রূপক—দুই অর্থেই অত্যুৎসাহী প্রবক্তারা এবং কঠোর বিরোধীরা সেক্যুলারিজম নিয়ে লড়াইয়ে লিপ্ত আছেন। বিভিন্ন

দৃষ্টিকোণ থেকেই সেক্যুলারিজমের মান-নির্ণায়ক (বা নরমেটিভ) এবং প্রায়োগিক (ইম্পিরিকাল) দিক, এর শক্তি ও দুর্বলতা, এর অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বিতর্ক চলছে। নির্দিষ্ট জাতীয় অভিজ্ঞতা এই বিতর্কগুলোকে শুধু প্রভাবিতই করছে তা নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিতর্কগুলোর রূপ ও মাত্রাও নির্ধারিত হচ্ছে এসব অভিজ্ঞতা দিয়ে। বৈশ্বিক রাজনীতির দৃশ্যপটের রূপান্তর, বিভিন্ন রাষ্ট্রে দৈনন্দিন রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, বেশ কিছু রাষ্ট্রে গণতন্ত্রায়ণ-প্রক্রিয়ার সূচনা, রাজনীতি এবং জনপরিসরে (বা পাবলিক স্ফেয়ারে) ধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং অনেকগুলো ইউরোপীয় রাষ্ট্রের জনসংখ্যার পরিবর্তন ইত্যাদি সেক্যুলারিজম বিষয়ক আলোচনাকে সবার সামনে নিয়ে এসেছে। এর আরও কারণ রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, যা প্রচলিত প্রথাগত পাণ্ডিত্যকে চ্যালেঞ্জ করছে, এর একটি অন্যতম কারণ। আমরা এও দেখেছি যে গত কয়েক দশকে ধর্ম বিষয়ে বিদ্যায়তনে, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে উৎসাহ, আলোচনা, গবেষণা বৃদ্ধি পেয়েছে; সেক্যুলারিজম বিষয়ক আলোচনায় তা সমানভাবে প্রযোজ্য। এসব বিষয়ে সারা বিশ্বেই গণমাধ্যমে অতিসরলীকৃত মন্তব্য ও আলোচনা সহজেই লক্ষণীয়; রাষ্ট্র ও রাজনীতির নীতিনির্ধারকদের মধ্যেও রয়েছে অতিসরলীকৃত ব্যাখার প্রতি পক্ষপাত। কিন্তু আশার বিষয় হচ্ছে, একই সঙ্গে গভীর বিশ্লেষণও প্রকাশিত হচ্ছে এবং সেগুলোও জনমনে, উৎসাহীদের মধ্যে ছাপ ফেলতে সক্ষম হচ্ছে। বাংলাদেশে সেক্যুলারিজম কোনো অপরিচিত বিষয় নয়; সংবিধানে এবং রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় তার উপস্থিতি সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু ধারণা হিসেবে সেক্যুলারিজমকে তীক্ষ্ণভাবে খতিয়ে দেখার ধারা, বিশেষত নতুন বিতর্কগুলোর আলোকে এবং সমাজ ও রাজনীতিতে এই নতুন চিন্তার প্রভাব বিষয়ে আলোচনার ধারা খুব একটা শক্তিশালী নয়।

সেক্যুলারিজম বিষয়ক আলোচনা খুব সহজ নয়, বলা যায় সমস্যায় আকীর্ণ। আবেগপ্রসূত এবং বিতর্কযোগ্য কথাবার্তা থেকে এই আলোচনাকে দূরে রাখা যেমন দুরূহ, তেমনি দুরূহ হচ্ছে বিদ্যমান দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। বিদ্যমান দুই দৃষ্টিভঙ্গি বলতে আমি বোঝাচ্ছি সেক্যুলারিজমকে একটি সর্বজনীন মতবাদ হিসেবে দেখার ধারা এবং কনসেপ্ট হিসেবে এর বৃহত্তর দিককে অবজ্ঞা করে প্রেক্ষাপট ও নির্দিষ্ট দেশ-কালকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির কোনোটিই এককভাবে এই বিষয়ের প্রতি সুবিবেচনা করতে পারে না, বিষয়টিকে বিচক্ষণতার সঙ্গে তুলে ধরতে পারে না।

এসব বিষয় মাথায় রেখে আমি আমার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট এবং সীমিত লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি; তা হলো সেক্যুলারিজম ধারণাটির বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গির একটি সমালোচনামূলক আলোচনা হাজির করা। এটা ধরে নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু

করা দরকার যে সেক্যুলারিজম একটি বিতর্কিত ও বিতর্কযোগ্য বিষয়। বিশেষত, আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে 'সেক্যুলারিজম ঐতিহাসিকভাবে একটি পরিবর্তনশীল বিষয়, যার উদ্ভবের একটি বৈচিত্র্যময় ইতিহাস রয়েছে'।[১] সম্ভবত আমাদের প্রত্যেককে এটা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে যে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক যেমন বিভিন্ন রকমের হতে পারে, তেমনি সেক্যুলারিজম শব্দটির অর্থ কী হবে সে বিষয়েও আলোচনা এবং পুনঃআলোচনা হতে পারে। এর জন্য প্রত্যেককে একটি বিষয় কাটিয়ে উঠতে হবে, যেটাকে ইয়ুর্গেন হাবারমাস বর্ণনা করেছেন 'সংকীর্ণ সেক্যুলারপন্থী সচেতনতা'[২] হিসেবে।

সেক্যুলারিজম এবং সেক্যুলারকরণ কী?

সেক্যুলারিজম বিষয়ে সবচেয়ে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, এটি রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক কী হবে সেই বিষয়ে একটি মতাদর্শগত কাঠামো প্রদান করে। এই প্রচলিত ধারণার অর্থ হচ্ছে যে সেক্যুলারিজম এমন সব প্রতিষ্ঠান তৈরি করবে যেগুলো ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে সবার মতৈক্যের বাস্তবায়ন করবে এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথক্করণ বজায় রাখবে। এই মতাদর্শিক কাঠামোর মধ্যে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, 'সেক্যুলার যুক্তির কারণে রাজনৈতিক জীবন থেকে ধর্মকে বাদ দেওয়া উচিত'; 'ধর্মীয় যুক্তির ভিত্তিতে বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের সক্রিয় হওয়া উচিত নয়' এবং 'ধর্মীয়ভাবে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিবর্গ এবং গোষ্ঠীর ততক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করা উচিত নয় যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা তাদের ধর্মীয় প্রত্যয় ত্যাগ করে সেক্যুলার বিবেচনার ওপর নির্ভর করতে প্রস্তুত হচ্ছেন'।[৩] সেক্যুলারিজমের একটি অন্যতম পুরোনো সংজ্ঞা পাওয়া যায় জর্জ জ্যাকব হোলিওক থেকে; তাঁকে এই শব্দটির জনক বলেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ১৮৫১ সালে, হোলিওক তাঁর বই *দ্য প্রিন্সিপলস অব সেক্যুলারিজম*-এ সেক্যুলারিজমকে সংজ্ঞায়িত করেন :

> সেক্যুলারিজম হচ্ছে বস্তুবাদী উপায়ে মানবকল্যাণ বাড়ানো, উপযোগবাদী ধারায় মানবকল্যাণকে পরিমাপ করা এবং অন্যের সেবা করাকে জীবনের কর্তব্যে পরিণত করার জ্ঞান। সেক্যুলারিজম মানুষের বর্তমান অস্তিত্ব, এমন সব বিষয় এবং কাজের সঙ্গে যুক্ত যেগুলোকে জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করা যায়। এর লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের মুখ্য কর্তব্য হিসেবে মানুষের শারীরিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রার উন্নয়ন বিধান করা; আস্তিকতা, নাস্তিকতা বা খ্রিষ্টধর্মের বাইরে প্রাকৃতিক নৈতিকতার ব্যবহারিক পর্যাপ্ততার বিষয়টি মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা।[৪]

এরপর থেকে সংজ্ঞাটি পরিবর্তিত হয়েছে; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এর সংজ্ঞাটিতে এখন আর কোনো অস্পষ্টতা নেই। শব্দটির বহুল ব্যবহার সত্ত্বেও চার্লস টেইলর উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, 'সেক্যুলারিজম দ্বারা কী বোঝায় তা [এখনো] সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট নয়'।[৫] যেহেতু তিনটি ভিন্ন জ্ঞানের ধারায়, অর্থাৎ

দর্শন, সমাজতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে—সেক্যুলারিজম পঠনপাঠন করা হয়, তাই এই ধারণার সঙ্গে তিনটি ভিন্ন ব্যাখ্যা সাধারণভাবে প্রচলিত আছে। দার্শনিকভাবে এই বিষয়টিকে অতীন্দ্রিয়বাদ এবং অধিবিদ্যাকে বাতিল করে অস্তিত্ববাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের গ্রহণ হিসেবে দেখা হয়। সমাজতাত্ত্বিকভাবে এই ধারণা দিয়ে জনজীবন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ধর্মের প্রভাবের হ্রাস নির্দেশ করা হয়। রাজনৈতিকভাবে এটাকে ব্যক্তিগত (প্রাইভেট) এবং জনপরিসরের (পাবলিক স্ফেয়ারের) পৃথক্করণ হিসেবে দেখা হয়, যা ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথক্করণ নির্দেশ করে। এগুলোই হচ্ছে সেক্যুলারিজম ধারণাটির সবচেয়ে প্রচলিত ব্যাখ্যা।[৬] এই ব্যাখ্যাগুলো একটি আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন বলা যাবে না, বরং সবগুলো মিলিয়েই একটি রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে সেক্যুলারিজমের পরিচিতি। যেকোনো রাজনৈতিক মতবাদ তৈরি হয় বিরাজমান ব্যবস্থা বা ধারণায় যখন অপূর্ণতা, অসংগতি বা ত্রুটি আছে বলে মনে করা হয়। সেক্যুলারিজম তার ব্যতিক্রম নয়। সেক্যুলারিজমের ধারণার উদ্ভবের ক্ষেত্রে ধর্মকে ওই অপর্যাপ্ততা হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। এটাও মনে রাখতে হবে যে কোনো রাজনৈতিক মতবাদই সমাজের ক্ষমতা সম্পর্ক থেকে মুক্ত নয়। সেক্যুলারিজমের জ্ঞানভাষ্য বা ডিসকোর্স বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতার, অর্থাৎ রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ক্ষমতার মধ্যে অসম আদান-প্রদানের মাধ্যমে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। তুরস্কের সাংবিধানিক আদালতের দেওয়া সেক্যুলারিজমের আইনগত ব্যাখ্যার মধ্যে এর ব্যাপক প্রকৃতিটি উঠে আসে। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে দেওয়া এক রায়ে আদালত উল্লেখ করেন যে, সেক্যুলারিজম বলতে 'ধর্ম থেকে সামাজিক জীবন, শিক্ষা, পরিবার, অর্থনীতি, আইন, আচরণ, পোশাকের ধরন ইত্যাদির পৃথক্করণ বোঝায়'।[৭] এই দৃষ্টিকোণ থেকে মতবাদটি ব্যাপক এবং এর আওতায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সব আচরণকে বিবেচনা করতে হবে। সাবা মাহমুদ প্রায় এ রকমই একটি ব্যাখ্যা দেন, যখন তিনি বলেন, 'সাধারণভাবে রাষ্ট্রের একটি মতবাদ হিসেবে বা একগুচ্ছ বিচারসংক্রান্ত রীতিনীতি হিসেবে সেক্যুলার উদারতাবাদকে চিহ্নিত করা যাবে না: এটার বৃহদাকার তাৎপর্য বিবেচনা করলে এটাকে একার্থে জীবনাচরণ বলেই বুঝতে হবে'।[৮]

সেক্যুলারিজমের এই সংজ্ঞা সেক্যুলারিজম এবং সেক্যুলারকরণের মধ্যকার ব্যবধান কিছুটা অস্পষ্ট করে তুলেছে। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যায়তনিক জ্ঞানভাষ্যে এই পার্থক্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেক্যুলারিজম মতবাদ বা নীতি হিসেবে রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথক্করণের ওপর জোরারোপ করে, অন্যদিকে সেক্যুলারকরণ বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝা হয়, যা ব্যক্তিগত ও জনপরিসরের মধ্যে একটি পার্থক্য তৈরি করে এবং ধর্মকে ব্যক্তিপরিসরে সীমাবদ্ধ করে। সেক্যুলারকরণের

মাধ্যমে সমাজে ধর্মের প্রভাবের ক্রমাগত হ্রাসকেও নির্দেশ করা হয়।

পিটার বার্গার সেক্যুলারকরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, এটি 'সামাজিক জীবন এবং ব্যক্তিগত চেতনাবোধ উভয় ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকার সংকোচন ঘটায়'।[৯] যদিও একবিংশ শতাব্দীতে সেক্যুলারকরণের ধারণা ব্যাপক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়, কিন্তু এর একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজবিজ্ঞানীরা যেমন অগাস্ট কোঁৎ, হার্বার্ট স্পেন্সার, এমিল ডুর্খেইম, ম্যাক্স ওয়েবার, কার্ল মার্ক্স সবাই ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন এবং এই উপসংহার টেনেছেন যে সময়ের পরিক্রমায় সমাজে ধর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব হারিয়ে যাবে। এ যুক্তির ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল এই ধারণা যে 'আধুনিকায়ন' ধীরে ধীরে ধর্মকে জনপরিসর থেকে বিদায় করবে। হোসে ক্যাসানোভার মতে, সেক্যুলারকরণ তিনটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। প্রক্রিয়াগুলো হচ্ছে: ১. 'আধুনিক সমাজগুলোতে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চর্চার হ্রাস'; ২. 'ধর্মের ব্যক্তিগতকরণ'; এবং ৩. 'সেক্যুলার পরিসরসমূহের (রাষ্ট্র, অর্থনীতি, বিজ্ঞান) পৃথক্করণ'।[১০] সেক্যুলারকরণ প্রতিপাদ্যের প্রবক্তারা[১১] তাঁদের যুক্তির প্রমাণ হিসেবে গবেষণালব্ধ উপাত্ত উপস্থাপন করেন, যেখানে দেখা যায় প্রাথমিকভাবে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং অনেকে ধর্মকে একেবারেই ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় আন্দোলন এবং ধর্মীয়-রাজনৈতিক শক্তিগুলোর উত্থানের ফলে প্রথমোক্ত দাবি দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। যাঁরা ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের অবস্থানের পুনর্মূল্যায়ন করেন।[১২] সেক্যুলারকরণ প্রতিপাদ্যের প্রবক্তারা, যেমন পিটার বার্গার তাঁর ভুল স্বীকার করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি ঘোষণা করেন, 'এই ধারণাটি মিথ্যা যে আমরা একটি সেক্যুলার বিশ্বে বাস করি'।[১৩] যাই হোক এটা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তৃতীয় উপাদানটির, সেক্যুলার পরিসরগুলোর পৃথক্করণের গুরুত্ব সেক্যুলারিজমের আলোচনার বাইরেও আছে, কারণ এটি উদারবাদী ধনতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্রের নির্দেশক চিহ্নে (হলমার্ক) পরিণত হয়েছে; 'সমাজ' এবং 'রাষ্ট্র'কে আলাদা করা বা ব্যক্তিপরিসর এবং জনপরিসরের মধ্যে ফারাক তৈরি করার যে ধারণা এখন গ্রহণযোগ্য বলেই মনে করা হয় তাই প্রমাণ করে যে পৃথক্করণ ঘটেছে।

দুটো প্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক: সেক্যুলারকরণের ধারণাটিকে কীভাবে সর্বজনীন করে তোলা হয়েছে? সেক্যুলারিজম এবং সেক্যুলারকরণের মধ্যে সম্পর্ক কী? সেক্যুলারকরণের ধারণাকে সর্বজনীন করে তোলার বিষয়টি আধুনিকীকরণ বা মডার্নাইজেশন তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আধুনিকীকরণ তত্ত্ব

জোর দিয়ে বলে যে 'উন্নয়নশীল' বা 'পশ্চিমা নয়' এমন সমাজগুলো পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর অনুসরণে প্রগতির পথে চলতে বাধ্য, যার মাধ্যমে সমাজগুলো সনাতন সমাজ থেকে 'আধুনিক' সমাজে পরিণত হবে; যার ফলে ওই সমাজগুলোতে উন্নতি আসবে এবং একটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন চিরাচরিত মূল্যবোধগুলোকে প্রতিস্থাপন করবে, যার একটি অখণ্ড অংশ হচ্ছে ধর্ম। ফলে সংকীর্ণতা ও ধর্মীয় প্রভাবের হ্রাস ঘটবে। এই মতবাদ এবং উন্নয়ন মডেলের বাছবিচারহীন অনুসরণের ফলে সেক্যুলারকরণ একটি সর্বজনীন ধারণার রূপ লাভ করেছে। এই আলোচনায় সেক্যুলারকরণ এবং সেক্যুলারিজমের মধ্যকার সম্পর্ক বিশদভাবে আলোচনায় আসেনি। কিন্তু ইউরোপিয়ান ইতিহাসের যতটুকু আমাদের সবারই জানা তার ওপর ভিত্তি করে এটা বলা যায় যে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সেক্যুলারিজমের উদ্ভব হয় ইউরোপীয় ধর্ম-যুদ্ধের পর, যখন ধর্ম ও সমাজ উভয়ই ধীরে ধীরে নিজেদের মধ্যকার পার্থক্য মেনে নিয়েছিল। সত্যিকার অর্থে, 'পবিত্র ধারণা' বা 'সেক্রেড' অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্মের সেক্যুলারকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে সেক্যুলারিজমের উদ্ভব হয়।

পশ্চিমা দুনিয়ার বাইরে অর্থাৎ অ-পশ্চিমা সমাজগুলোতে এই প্রক্রিয়াটি স্পষ্টত উল্টোভাবে ঘটেছে। সেখানে আমরা দেখি যে সেক্যুলারিজমের ভিত্তি গড়ে ওঠার আগেই রাষ্ট্রীয় নীতি এবং রাষ্ট্রের একটি প্রকল্প হিসেবে সেক্যুলারিজমকে গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে আমরা আধুনিকতা বা মডার্নিটির চারটি পথ চিহ্নিত করতে পারি। প্রথম ঐতিহাসিক পথটি হচ্ছে পশ্চিমা এবং মধ্য-ইউরোপীয় পথ, যেখানে আধুনিকতা ছিল একটি অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন। দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে যেখানে ইউরোপীয় অভিবাসী বা বসতি স্থাপনকারীরা (স্যাটেলাররা) পৌঁছেছিল : যেমন আমেরিকা এবং অস্ট্রেলেশিয়া যাকে পশ্চিমারা বলে 'নতুন বিশ্ব'। সেখানে বসতি স্থাপনকারীরা সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয় এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আধুনিকতার বিরোধীদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়। তৃতীয় পথটি হচ্ছে 'ঔপনিবেশিক এলাকা', যেখানে আধুনিকতা এসেছিল বাইরে থেকে। প্রতিরোধের চেষ্টাগুলোকে দমন করা হলেও, তা একেবারে নির্মূল করা যায়নি। চতুর্থ পথটি হচ্ছে 'বাইরে থেকে প্ররোচিত আধুনিকায়ন', যেখানে এলিট শাসকশ্রেণি তাদের পছন্দমতো আধুনিকতার ধারণা আমদানি করেছিল। অধিকাংশ অ-পশ্চিমা সমাজগুলো তৃতীয় ও চতুর্থ পথে আধুনিকতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল, ফলে রাজনৈতিক আধুনিকতা অভ্যন্তরীণভাবে তৈরি না হয়ে বরং বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া বা প্রোথিত ধারণায় পরিণত হয়েছে।[১৪] টি এন মদনের মতে, আধুনিকতার মতোই সেক্যুলারিজমও আরোপিত ছিল : 'অ-পশ্চিমা সমাজগুলোর ধর্মীয় ঐতিহ্যকে বা এই সব ঐতিহ্য উপহার হিসেবে কী দিতে পারে তা আমলে

না নিয়েই আধুনিকায়নের মডেলগুলো অ-পশ্চিমা সমাজগুলোতে সেক্যুলারিজম স্থানান্তরের পরামর্শ দিয়েছিল'।[১৫] সে কারণেই, সেক্যুলারকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবার আগেই রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে সেক্যুলারিজম অ-পশ্চিমা সমাজগুলোতে পৌঁছে যায়। সাধারণভাবে ভাবা হয়েছিল যে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সেক্যুলারিজমকে গ্রহণ করলেই সমাজের সেক্যুলারকরণ প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে।

(আধুনিকতা বলতে আমি এখানে পশ্চিমা ধারার আধুনিকতার কথাই বলেছি, যদিও আমি মনে করি না যে আধুনিকতার একটাই অর্থ। এর একটি ঐতিহ্য বা একরৈখিক ইতিহাসেও আমার আপত্তি আছে। ইউরোপের আধুনিকতার ইতিহাসকে একমাত্র আধুনিকতা বলে আমি মানতে নারাজ এবং এই প্রশ্নে আমি তালাল আসাদের সঙ্গে একমত।)[১৬]

'সেক্যুলারিজম'-এর রূপান্তরসমূহ

আমরা এখন যে অর্থে সেক্যুলারিজমকে বিবেচনা করি তা তৈরি হয়েছে তিনটি স্বতন্ত্র রূপান্তরের মাধ্যমে। ব্যুৎপত্তিগতভাবে সেক্যুলারিজম শব্দটির উৎপত্তি সেক্যুলাম থেকে, যা সময় পরিমাপের একটি একক। রোমানরা এটাকে এক প্রজন্মের সমমান এবং সাধারণ জীবনচক্র হিসেবে ব্যবহার করত। ধীরে ধীরে এর প্রমিতকরণ হয় এবং এটি এক শতাব্দী হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই অর্থের প্রথম রূপান্তর ঘটে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, যখন খ্রিষ্টধর্মের যাজকদের কাজের মধ্যে দুটি আলাদা ধারা দেখা গেল। এই বিভক্তি ঘটে 'পারলৌকিক' এবং 'ইহজাগতিক'র মধ্যে : 'যেসব যাজক নিজেদের ইহজাগতিক বিষয় (সেক্যুলাম) থেকে প্রত্যাহার করে নেয়, তারা জন্ম দেয় ধর্মীয় যাজকমণ্ডলীর; আর যারা ইহজাগতিক বিষয়ে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখে, তারা জন্ম দেয় সেক্যুলার যাজকমণ্ডলীর'।[১৭] প্রথমোক্তরা নিজেদের কেবল ধর্মীয় বৃত্তিতে নিয়োজিত করেন এবং শেষোক্তরা সেক্যুলার বৃত্তিগুলোতে জড়িয়ে পড়েন। এই বিভেদ অগাস্টিনের 'দেবতার শহর' এবং 'মানুষের শহর' পার্থক্যের ভিত্তি গড়ে দেয়। দ্বিতীয় রূপান্তর ঘটে ষোড়শ শতাব্দীতে, যখন শব্দটির সঙ্গে ঈশ্বরহীনতার বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়; ফলে সেক্যুলারকৃত বলতে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে গির্জার মালিকানা থেকে পার্থিব মালিকানায় হস্তান্তর বা অন্যার্থে গির্জা-সম্পৃক্ততা থেকে নাগরিক-সম্পৃক্ততায় রূপান্তর বোঝানো হতো। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধগুলো যা 'ত্রিশ বছরের যুদ্ধ' (১৬১৮-১৬৪৮) বলে পরিচিত তার অবসানের পরে এই অর্থ প্রাধান্য লাভ করে। এ কথা বলা যায় যে, 'পিস অব ওয়েস্টফেলিয়া' (১৬৪৮) সেক্যুলারিজমের এই অর্থকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। কিন্তু ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তিগুলোর দুটি উপাদান ছিল : একটি হচ্ছে এই নীতিকে প্রতিষ্ঠা করা যে ধর্মের প্রসঙ্গ না টেনেই রাষ্ট্রগুলোর

মধ্যকার বিবাদগুলো সমাধান করা হবে; অপরটি হচ্ছে এটা মেনে নেওয়ায় যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে 'কিয়ুস রেজিও, ইয়ুস রিলিজিও' অর্থাৎ যার রাজত্ব, তার ধর্ম। যার অর্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে ধর্মকে বিদায় দেওয়া হলেও, ধর্মের ওপর ভিত্তি করে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে তা উড়িয়ে দেওয়া হয়নি; অন্য অর্থে 'এটি ধর্মভিত্তিক (কনফেশনাল) রাষ্ট্রের বৈধতা দান করেছিল'।[১৮] তৃতীয় রূপান্তরটি ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে, যখন হোলিওক সেক্যুলারিজম শব্দটির প্রচলন করেন। পরবর্তী সময়ে এটি ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যকার সম্পর্কের পৃথক্করণের আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। এরপরের শতাব্দীতে সেক্যুলারিজমকে প্রগতি ও উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

সেক্যুলারিজমের অর্থের এই রূপান্তরগুলো স্পষ্টতই এটাই দেখায় যে এটি কোনো নিশ্চল ধারণা নয় এবং গত সাত শতাব্দী ধরে এটি বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। সুতরাং, বর্তমানে প্রচলিত অর্থটিকে এই ধারণার চূড়ান্ত সংস্করণ হিসেবে ধরে নেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নাও হতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান দশকগুলোতে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে 'জনপরিসর এবং দৈনন্দিন জীবনচর্চার ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ পর্যায়ে রাজনীতি, আইন এবং জনজীবনে ধর্মের সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জগুলো পাঠ এবং ব্যাখ্যা করতে রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে সেক্যুলারিজম যথেষ্ট পরিপ্রেক্ষিত প্রদান করে কি না'।[১৯] শুধু শক্তিশালী রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে ধর্মের উত্থানই সেক্যুলারিজমের সঙ্গে বিবাদ এবং সেক্যুলারিজমের প্রতি চ্যালেঞ্জের কারণ নয়। এটা ঠিক যে জনজীবনে ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাবে বা অ-পশ্চিমা সমাজগুলোতে ধর্মের ব্যক্তিগতকরণ হবে বলে যে আশা করা হয়েছিল তা ভুল প্রমাণিত হওয়ায় এবং পশ্চিমা সমাজগুলোতে শক্তি হিসেবে ধর্মের পুনরাবির্ভাবের কারণে সেক্যুলারিজম ধারণাটির সমালোচনামূলক মূল্যায়নে উৎসাহ তৈরি হয়েছে। কিন্তু পুনর্মূল্যায়নের প্রাথমিক কারণ হলো ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, 'সেক্যুলারিজমের ধারণাগত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ কাঠামোর মধ্যেই' ত্রুটি আছে। বিভিন্ন ধারার সমাজবিজ্ঞানীরা 'সেক্যুলারিজমের', অন্ততপক্ষে সেক্যুলারিজমের প্রচলিত ধারণার, বিরোধিতার বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এসেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন: পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আশীষ নন্দী, টি এন মদন, তালাল আসাদ, চার্লস টেইলর, উইলিয়াম কনোলি, জন কেইন, ক্রেইগ ক্যালহিউন এবং য়ুরগেন হাবারমাস। তবে অন্যরা, যেমন রাজীব ভার্গভা এবং অচিন ভানায়েক ধারণাগতভাবে সেক্যুলারিজমের পক্ষে যুক্তি দিলেও তাঁরা ধারণাটির পুনর্বিবেচনার (বলা যায় পুনঃসূত্রবদ্ধকরণ বা নতুন করে সংজ্ঞায়নের) প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন। এই সমালোচনা যে কত প্রবল সেটা বোঝা যায় আশীষ নন্দীর দ্ব্যর্থহীন উক্তিতে।

নন্দীর মতে, সেক্যুলারিজম 'সাধারণভাবে সকলের সঙ্গে ভাগ করে জীবনের ধর্মমত হিসেবে গ্রহণ অসম্ভব, রাষ্ট্রীয় কাজের ভিত্তি হিসেবে অচল এবং সুদূর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা হিসেবে ব্যর্থ'।[২০]

এই সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে চিন্তার পার্থক্য বিস্তর, কিন্তু যে বিষয়গুলো তাঁদের এক কাতারে ধরে রেখেছে তার একটি হচ্ছে, তাঁরা সবাই সেক্যুলারিজমের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে 'রিজন' বা যুক্তির সমালোচনা করেন। অথচ এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত র‍্যাশনালিটি বা যৌক্তিকতার ওপর নির্ভর করায় সেক্যুলারিজমের প্রশংসা করা হতো। এটাকে দেখা হতো আলোকায়ন বা এনলাইটেনমেন্টের ফলাফল হিসেবে; এনলাইটেনমেন্ট ঐতিহ্য এবং ধর্মের বিপরীতে যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। তবে 'যুক্তি'র ওপর এর প্রাপ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল কি না তা এখন প্রশ্নবিদ্ধ, তা এখন বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। স্টিভেন স্মিথ তাঁর বই *দ্য ডিসঅ্যানচেন্টম্যান্ট অব সেক্যুলার ডিসকোর্স*-এ এই বিতর্কের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, কোনো যুক্তিই নিজে নিজে সেক্যুলার নয়, কেন একজন মানুষ এক ধরনের কর্মপদ্ধতির বদলে অন্য ধরনের কর্মপদ্ধতির সিদ্ধান্ত নেয় তার যৌক্তিকতা প্রমাণের কোনো সেক্যুলার যুক্তি নেই। সেক্যুলারিজম সম্পর্কিত বিতর্ক প্রসঙ্গে ক্রেইগ ক্যালহিউনের মত হচ্ছে:

> ধর্মের বিপরীতে যুক্তির সপক্ষে তর্ক করতে গিয়ে কিছু সমর্থক দুর্ভাগ্যবশত যুক্তির সরল, কার্যত মৌলবাদী (ফান্ডামেন্টালিস্ট) ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তাঁরা যুক্তিকে, যা সম্ভবপর তার চেয়েও কোনো না কোনোভাবে বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে কল্পনা করেন। এই ধরনের বিবরণ একই সঙ্গে সমর্থন অযোগ্য এবং নাগরিকদের [চিন্তার] মধ্যে ব্যাপকার্থে সমন্বয়সাধন ও একই ধরনের উপলব্ধিতে পৌঁছানোর পথে বাধা।[২১]

একইভাবে ফিলিপ গরস্কি ও অন্যরা যুক্তির ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাসের জন্য সেক্যুলারপন্থীদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে, 'সম্ভবত ধর্মবাদীরা নয়, বরং সেক্যুলারপন্থীরাই অন্ধ ছিল। তবে তা অন্ধকারের কারণে নয়, আলোকায়নের যুক্তির আলোকচ্ছটায়'।[২২]

সমালোচকেরা বিদ্যমান সেক্যুলারিজমের ধারণাগত অপর্যাপ্ততার দিকই শুধু নির্দেশ করেননি, অনুভূত দুর্বলতাগুলোর প্রতিকারও তাঁরা বাতলে দিয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে হোজে ক্যাসানোভার জনধর্মসমূহ[২৩], আলফ্রেড স্টেপানের 'দ্বৈত সহিষ্ণুতা'[২৪], চার্লস টেইলরের 'বৈপ্লবাত্মক সেক্যুলারিটি'[২৫] এবং রাজীব ভার্গভার 'নীতিনির্ভর দূরত্ব'[২৬]। স্টেপানের 'দ্বৈত সহিষ্ণুতা' রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে স্পষ্ট দূরত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর গুরুত্বারোপ করে। 'যখন সত্যিকার পৃথক্করণ সম্পন্ন হবে, তখন ধর্মীয় খাত কাজের স্বাধীনতা উপভোগ করবে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ না করেই

এর সদস্যদের শান্তিপূর্ণভাবে প্রভাবিত করতে সমর্থ হবে'।[২৭] একইভাবে রাজীব ভার্গভার 'নীতিনির্ভর দূরত্ব'ভিত্তিক সেক্যুলারিজম এটা বলে যে রাষ্ট্র বা জাতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে এবং আগে থেকেই লিখিতভাবে ধর্মের বিশেষ জনগুরুত্ব নাও থাকতে পারে। তবে এর অর্থ এই নয় যে ধর্মের কোনো জনগুরুত্বই নেই।[২৮] আমি এই ধারণাগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং সমালোচনা উপস্থাপন করছি না সময় এবং স্থানাভাবে; এদের মধ্যে কোনোটির প্রতি আমার কোনো পক্ষপাতও নেই। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটা নজরে আনা যে সেক্যুলারিজমের ধারণাটি আবার আলোচনায় উঠে এসেছে এবং এখন চতুর্থ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি হিসেবে সেক্যুলারিজম

সেক্যুলারিজমের দুটি দিকের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী দিকটি হচ্ছে রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি। কারণ, এটি জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি হিসেবে সেক্যুলারিজম বলতে ধর্ম এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের পৃথক্করণের কিছু নীতিকে বোঝায়। এই নীতি বিভিন্ন কারণে মেনে চলা হতে পারে: প্রতিটি ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে বা প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতার সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্তে, অথবা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে ধার্মিক বা অধার্মিক সব নাগরিকের সমান সুবিধা নিশ্চিত করতে। এ ধরনের রাষ্ট্রপরিচালনার মতবাদ 'ধর্ম' সম্পর্কে কোনো স্বতন্ত্র 'তত্ত্ব'কে, তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক যা-ই হোক না কেন, পূর্বশর্ত হিসেবে ধরে নেয় না বা এর প্রয়োজনও হয় না।[২৯]

সাধারণভাবে এটা ধরে নেওয়া হয় যে রাষ্ট্রপরিচালনার মতবাদ হিসেবে দুটি নীতির প্রয়োজন: পৃথক্করণের নীতি এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নীতি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই দুটি নীতিকে আলাদা করা যায় না। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে, উনবিংশ শতাব্দী থেকে 'সেক্যুলার রাষ্ট্রের' চারটি মডেলের উদ্ভব হয়েছে। এগুলোকে সাধারণভাবে ফরাসি, ব্রিটিশ, আমেরিকান এবং ভারতীয় মডেল হিসেবে অভিহিত করা হয়। তবে কিছু পণ্ডিত এই মডেলগুলোকে দুটি বৃহৎ ধারায় ভাগ করেছেন: অ্যাসার্টিভ সেক্যুলারিজম এবং প্যাসিভ সেক্যুলারিজম।[৩০] তবে এগুলোর মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যের কারণে আমরা চারটি মডেলের আকারে আমাদের আলোচনা করব। ফরাসি মডেলের মূল ভিত্তিগত ধারণা হচ্ছে এই যে রাষ্ট্র ধর্ম থেকে নাগরিকদের সুরক্ষা দেয় এবং এর পরিবর্ধিত বিষয় হচ্ছে যে রাষ্ট্র ধর্মীয় বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। লেইসিটে (laïcité) নামে পরিচিত এই মডেল জনপরিসর—রাজনৈতিক এবং সামাজিক উভয় পরিসর—থেকে ধর্মকে নির্বাসিত করে। সংক্ষেপে এটাকে বলা যায় যে ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে রাষ্ট্র নিরপেক্ষতা

পালন করে এবং ধর্মীয় পরিসর ও জনপরিসরকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে। অলিভিয়ার রয়ের মতে, লেইসিটে 'পশ্চিমা সেক্যুলারিজমের একটি আতিশয্যিক (এক্সাসারেটেড), রাজনীতিকৃত এবং মতাদর্শগত ধরন' এবং এটার আইনগত ও মতাদর্শগত দুই ধরনের উপাদানই রয়েছে।[৩১] তিনি ঠিকই বলেছেন যে 'লেইসিটেকে রাষ্ট্র এবং ধর্মের মধ্যে একটি সাদাসিধে সম্পর্ক হিসেবে চিন্তা করা নিরর্থক; এটা বরং সমাজ কীভাবে নিজেকে রাজনৈতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করে, সেই পথই ঠিক করে দেয়।'[৩২] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে সেক্যুলারিজমের ধারণাটি সংবিধানে বিধিবদ্ধ হয়; 'কংগ্রেস ধর্মীয় সংস্থাপনাকে সম্মান জানিয়ে বা ধর্মের অবাধ চর্চাকে বাধা প্রদান করতে কোনো আইন প্রণয়ন করবে না।' এটা সাধারণভাবে 'পৃথক্করণের প্রাচীর' ('wall of separation') বা 'রাষ্ট্র এবং চার্চের মধ্যে পৃথক্করণ' হিসেবে পরিচিত। এটাকে জনপরিসরে ধর্মকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার পরিবর্তে, একটিকে অপরটি থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য চার্চ এবং রাষ্ট্রের পৃথক্করণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। পৃথক্করণের এই ব্যাখ্যার কারণে সমাজে ব্যাপকাকারে ধর্মচর্চা থাকলেও রাষ্ট্র ধর্ম থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। ব্রিটিশ মডেলে সমাজ অধিক মাত্রায় সেক্যুলার, কিন্তু রাষ্ট্র প্রতীকীভাবে হলেও ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ব্রিটিশ রাজা/রানি চার্চ অব ইংল্যান্ডের সুপ্রিম গভর্নর এবং সরকারের উচ্চকক্ষ, হাউস অব লর্ডসের ২৬ জন সদস্য বিশপ। তবে কমপক্ষে পৃথক্করণ অর্থে হলেও সমাজের সেক্যুলারকরণ বেশ গভীর। সেক্যুলারিজমের ভারতীয় মডেলের মূল কথা হচ্ছে 'সর্বধর্মসম্ভাবা' (অর্থাৎ সব ধর্মই সত্য এবং সমান)। এটা এই মতের ওপর জোর দেয় যে 'সব ধর্মই অর্থপূর্ণ এবং জাতীয় জীবনে সব ধর্মেরই যথাযথ স্থান থাকা উচিত।'[৩৩] এই নীতি রাষ্ট্রকে নির্দেশনা প্রদান করে, কিন্তু রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক কী হবে তা অস্পষ্টই থেকে গেছে। এই নীতির ফলে জনসমাজের সেক্যুলারকরণের বিষয়টি, অচিন ভানায়েকের ভাষায়, 'কার্যকরভাবে [একটি] প্রশ্নাতীত' বিষয়ে পরিণত করেছে।[৩৪] তার অর্থ হলো এই যে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে জনসমাজ সেক্যুলার, বাস্তবে তা থাকুক অথবা না থাকুক।

সেক্যুলার রাষ্ট্রের এই মডেলগুলো নিছক বিশ্ববীক্ষা হিসেবে সেক্যুলারিজমের প্রতিচ্ছবি নয়, বরং অধিক গুরুত্বের বিষয় হচ্ছে, এগুলো সেই সব সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনেরও ফল: 'পশ্চিমা গণতন্ত্রগুলোতে সেক্যুলার রাষ্ট্রের উদ্ভব বিমূর্ত সেক্যুলার আদর্শগুলোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ছিল না, বরং তা ছিল নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার নির্দিষ্ট প্রায়োগিক ফল। যখন এই ধরনের দূরত্ব কার্যকর ছিল না, তখন ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক বিবাদের ইতিহাস থেকে চার্চ এবং রাষ্ট্র উভয়ই যে শিক্ষা গ্রহণ করেছে তার ফসল হচ্ছে এই সব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা।[৩৫] উদাহরণ

হিসেবে ফরাসি মডেলের কথাই বিবেচনা করা যাক। ফ্রান্সে কঠোর সেক্যুলার রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ হচ্ছে যাজকদের শক্তি, ফরাসি বিপ্লবের সময়ে এবং পরে তাঁদের ভূমিকা এবং সমাজে যাজকতন্ত্রের বিরোধিতা। ফরাসি রিপাবলিকের প্রতি ডানপন্থী ক্যাথলিক জাতীয়তাবাদীদের বৈরিতার কারণে রিপাবলিকের সমর্থকদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিক্রিয়ার ফসল হচ্ছে এই কঠোর ব্যবস্থা। 'সেক্যুলারিজমের এই কঠোর সংস্করণ ছিল চার্চের সংস্রব ত্যাগসংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার, যাজকীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফল। এটা ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতেও চলমান ছিল।'[৩৬]

সুতরাং, রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি হিসেবে সেক্যুলারিজমের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। সেক্যুলার রাষ্ট্রের কোনো একক মডেল নেই।

সমালোচনার কাঠগড়ায় সেক্যুলার রাষ্ট্র?

সেক্যুলারিজম-সম্পর্কিত আলোচনায় একটি বিষয় ঘুরে-ফিরে আসে, তা হলো অপশ্চিমা সমাজগুলোতে সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলোর কার্যক্রম; এই রাষ্ট্রগুলো কী করেছে, কী করেনি। সাধারণত এটা দেখা যায় যে আধিপত্যবিরোধী একটি মতাদর্শ হিসেবে ধর্মের এবং রাষ্ট্রের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধর্মীয়-রাজনৈতিক শক্তির উত্থানের পেছনে সেক্যুলার রাষ্ট্রের কার্যক্রমের ভূমিকা রয়েছে। সেক্যুলারিজমের বিরোধীরা (বিরোধীরা, সমালোচকেরা নয়) প্রায়ই জোর দিয়ে বলেন যে সেক্যুলার রাষ্ট্রসমূহ ব্যর্থ হয়েছে এবং এই ব্যর্থতার কারণ রাষ্ট্রগুলোর মতাদর্শিক অবস্থান।

সেক্যুলার রাষ্ট্রের কার্যক্রম এবং সেক্যুলারিজমের প্রতি চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য অপশ্চিমা সমাজগুলোতে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে কিছু বিষয় মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমত, ইতিহাস থেকে দেখা যায়, অপশ্চিমা সমাজগুলোতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে ঔপনিবেশিকভাবে বা যেখানে তা ঔপনিবেশিক কারণে বিকশিত হয়নি (যেমন : থাইল্যান্ড, চীন, রাশিয়া বা তুরস্ক) সেখানে রাষ্ট্রগুলো সচেতনভাবেই ইউরোপীয় মডেলের ওপর ভিত্তি করে আধুনিকায়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যদিও এটা সত্য যে এই রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের কিছু স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু এগুলোকে যেন ঔপনিবেশিক শাসনের সময় প্যারাসুটের মতো করে আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতারা তাকেই, সেই সীমান্ত, সেই প্রশাসন, সেই আইনি কাঠামোসহ সবকিছুকেই গ্রহণ করেছেন, অব্যাহত রেখেছেন।[৩৭] যে রাষ্ট্রগুলো এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে, সেগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে কিছু মতাদর্শ, যার মধ্যে সেক্যুলারিজমও আছে।

দ্বিতীয়ত, সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের—বিশেষত উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোতে—'বৈধতা ইতিহাস বা অতীতের কাছ থেকে উদ্ভূত হয়নি, বরং তা

হয়েছে দেয় প্রতিশ্রুতিগুলো থেকে; এই বৈধতার উৎপত্তি উৎস থেকে নয়, এর প্রত্যাশিত প্রভাবগুলো থেকে।'[৩৮] সুতরাং, রাষ্ট্রগুলোকে বিচার করা হয় প্রতিশ্রুতি পালনের সাফল্যের বিবেচনা থেকে, তাদের কর্মদক্ষতার ওপর, তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার ভিত্তিতে।

তৃতীয়ত, অপশ্চিমা, বিশেষত উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজগুলোতে রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং প্রায়ই রাষ্ট্র সমাজের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। রাষ্ট্র শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবেচনাতেই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় না, বরং তারও বাইরে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার জন্য যে কাজগুলো দরকার, সেগুলোর সঙ্গেও রাষ্ট্র জড়িত থাকে। এই সব সমাজে রাষ্ট্র হেজিমনির এজেন্সি/কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে শাসকশ্রেণি, সে যেই হোক না কেন, রাষ্ট্রকে হেজিমনি/কর্তৃত্বের এজেন্সি হিসেবে ব্যবহার করে এবং এর মাধ্যমে একটি নতুন মতবাদ (বা মূল্যবোধ ব্যবস্থা) চাপিয়ে দেয়, যে মতবাদকে অন্য সব মতবাদ থেকে শ্রেয় বলে ধারণা দেওয়া হয়। প্রায়ই এই নতুন মতবাদ সেক্যুলার জাতীয়তাবাদেরই একটি ভিন্ন রূপ হয়। সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ তখন শাসকশ্রেণির এবং সর্বব্যাপ্ত, হস্তক্ষেপবাদী ও লুণ্ঠনপরায়ণ রাষ্ট্রের বৈধতা দানকারী মতবাদে পরিণত হয়। এই অবস্থায় সেক্যুলারিজম শুধু রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতাই ভোগ করে না, তা রাষ্ট্রের একটি প্রকল্পেও পরিণত হয়।

অপশ্চিমা সমাজগুলোতে রাষ্ট্রের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের কারণে সেক্যুলারিজম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য রূপ লাভ করে। ফলে রাষ্ট্রের কার্যক্রম, তাঁর সাফল্য-ব্যর্থতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। ১৯৯৪ সালে মার্ক য়ুর্গেনস্মায়ার দেখান যে 'পৃথিবীর অনেক অংশে সেক্যুলার রাষ্ট্রসমূহ তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি।'[৩৯] ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম মাইলসের গবেষণায় এই দাবিগুলো পুনর্ব্যক্ত হয় এবং তিনি আরও উল্লেখ করেন যে 'গোষ্ঠী পরিচিতিতে এবং রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে ধর্মীয় মাত্রা' নতুন বিষয় হিসেবে যুক্ত হয়েছে।[৪০] আমরা বলতে পারি যে শাসক এলিট শ্রেণির কার্যক্রমের বৈধতার অভাব (অর্থাৎ সাধারণ কল্যাণ প্রদানে সেক্যুলার এলিটদের সামর্থ্যহীনতা) কর্তৃত্ববাদ যা সেক্যুলার সিভিল সোসাইটিকে দুর্বল বা ধ্বংস করে দেয় এবং যার ফলে জনপরিসর হিসেবে এককভাবে ধর্মীয় কেন্দ্রগুলো (যেমন : মসজিদ, মন্দির, গির্জা) টিকে থাকে। নগরায়ণসহ অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সেক্যুলারপন্থী রাজনীতির হেজিমনির অবসান এবং সেক্যুলার দলগুলোর সুবিধাবাদী রাজনীতি সারা দুনিয়াজুড়ে ধর্মীয়-রাজনৈতিক শক্তিগুলোর উত্থানের গুরুত্বপূর্ণ কারণ।[৪১] এখানে স্মরণ করা দরকার যে রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশের অন্য পথগুলোর অনুপস্থিতিতে ধর্মীয় ও ধর্মভিত্তিক

কেন্দ্রগুলো সবার দৃষ্টিগোচরে আসে। এই অবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ মানুষের সক্রিয়তার জন্য ভৌত ও নৈতিক পরিসর, নৈতিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রদানের সুযোগ তৈরি করে। গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, এসব বিষয় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, আবার এই সব বিষয় একসঙ্গেই ঘটতে হবে তেমনটিও জরুরি নয়।

কয়েক দশক ধরে উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম এশীয় এবং দক্ষিণ এশীয় অনেক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা। উদাহরণ হিসেবে আলজেরিয়া, মিসর, ইরাক, সিরিয়া, সুদান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং নেপালের কথা উল্লেখ করা যায়। নাগরিকদের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা অনুভব না করা এসব রাষ্ট্রের ইতিহাসের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। এসব ব্যর্থতা রাষ্ট্রগুলোকে এবং এলিট শাসকশ্রেণিকে বৈধতাহীন করেছে। যেহেতু শাসক এলিট শ্রেণি সাধারণ জনগণের ওপর আর হেজিমনি বা কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারছে না, ফলে এসব সমাজের মধ্যে পরস্পরবিরোধী, যুযুমান বিভিন্ন ধারার উদ্ভব হচ্ছে। একদিকে এলিট শাসকশ্রেণি ক্ষমতার ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব ধরে রাখতে নানা পন্থার আশ্রয় নিচ্ছে; অন্যদিকে ধর্মীয়-রাজনৈতিক শক্তিগুলো এটা দেখাতে চেষ্টা করছে যে এসব ব্যর্থতা সেক্যুলারপন্থী উদারনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে মজ্জাগতভাবে সম্পৃক্ত। একটি হেজিমনিক মতাদর্শের অনুপস্থিতির কারণে ধর্ম সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে সচেষ্ট হচ্ছে এবং দৈনন্দিন জীবন, ডিসকোর্স ও রাজনীতি ধর্মীয় বা ধর্মসংশ্লিষ্ট প্রতীক, কথাবার্তা এবং বুলিতে পূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে যে দেশকে বর্ণনা করা হয়, সেই ভারতের ক্ষেত্রেও এই কথাটি সত্য। ভারতে যখন ইন্দিরা গান্ধীর সরকার (১৯৭১-১৯৭৭) অধিক কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠে এবং স্বল্পমেয়াদি লাভের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা শুরু করে, তখন জনগণ কংগ্রেসের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। আশুতোষ ভার্সনে উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় কংগ্রেস 'জাতি তৈরি এবং গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত একদা শক্তিশালী একটি সংগঠন,... [১৯৮০-এর দশকে] একটি বিবর্ণ, দুর্বল চরিত্রের, অতিকায় মূর্তিতে পরিণত হয়।'[৪২] অধিকন্তু, '১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি সাংগঠনিক এবং মতাদর্শিক শূন্যতা তৈরি হয়েছিল। সাংগঠনিকভাবে কংগ্রেস ছিল অবসন্ন। মতাদর্শিকভাবে ঠিক কোন বিষয়ে বিশ্বাস করত, সে সম্পর্কে নিজেরাই নিশ্চিত ছিল না।'[৪৩] সেই সময়েই ধর্মীয়-রাজনৈতিক শক্তিগুলো মূলধারার রাজনীতিতে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সেক্যুলারিজমের উদ্ভবের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, তা হলো রাষ্ট্র এবং জনসমাজের ভেতরে পার্থক্য। রাষ্ট্রের আধুনিকায়ন-সেক্যুলারকরণের দাবি ও আচরণ সত্ত্বেও জনসমাজে বাস্তবে পরিবর্তন ঘটে ধীরগতিতে। স্পষ্টত রাষ্ট্রের দাবি আর 'পরিবর্তনের বাস্তবতার মধ্যে

থাকে স্পষ্ট অসমতা'। সেক্যুলারকরণের অনুপস্থিতির কারণে রাষ্ট্র ধর্মের সামগ্রিক প্রভাব হ্রাস করতে প্রায়ই ব্যর্থ হয়। সেখানে তার প্রভাব কেবল রাষ্ট্র থেকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হয় সমাজে। সেখানে ধর্ম থাকে সুপ্ত অবস্থায়, সম্পূর্ণভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর এবং রাষ্ট্রীয় প্রভাববলয়ে প্রবেশ করার সামর্থ্য তার অবসিত হয় না।[৪৪]

উপসংহারের বদলে

আমার এই আলোচনার, বিশেষ করে সেক্যুলারিজম বিষয়ে যেসব নতুন দৃষ্টিভঙ্গির, আলোচনার, চিন্তার কথা আমি উল্লেখ করেছি তার সারসংক্ষেপ দেওয়া আমার লক্ষ্য নয়। আলোচনার উপসংহার আমি কেবল কয়েকটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথমত, প্রচলিত দ্বিধা বিভাজিত চিন্তা—'রক্ষণশীল' ধর্ম বনাম 'প্রগতিশীল' সেক্যুলারিজম—নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা দরকার, এই বিভাজনকে চ্যালেঞ্জ করার বিষয়টি সম্ভবত জরুরি হয়ে পড়েছে। এর কারণ হচ্ছে, সেক্যুলারিজম সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা ঐতিহাসিকভাবে এবং জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে একটি বিশেষ ধর্মের নির্দিষ্ট ব্যাখ্যার সঙ্গে জড়িত। সেক্যুলারিজমকে আধুনিকতা, যুক্তি এবং মুক্তির সমকক্ষরূপে বিবেচনা করার বিষয়টি এখন প্রশ্নবিদ্ধ। আধুনিকতা, যুক্তি এবং মুক্তির পথ কেবল প্রচলিত অর্থে সেক্যুলারিজমের মধ্যেই নেই। অনেকের কাছে এটি একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয়। কারণ, এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেক্যুলারিজমের সমালোচনা করার একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে। তবে বাংলাদেশে সেক্যুলারিজম বিষয়ে আলোচনার অবস্থাদৃষ্টে আমার কাছে মনে হয়েছে এই বিষয়টি মনে করিয়ে দেওয়া অতীব জরুরি।

দ্বিতীয়ত, আমি এই বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যে সেক্যুলারিজমের নির্দিষ্ট কোনো একক ধারণা নেই। মতাদর্শ এবং রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে এর বিভিন্ন ধরন আছে। আমরা দেখি যে নরমেটিভ বিবেচনায় এবং বাস্তবে সেক্যুলারিজম বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে। এই সব বৈচিত্র্য নির্দিষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রের নিজস্বতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। তবে সেটাই বৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ নয়। সেক্যুলারিজম সম্পর্কে একবচনে কথা বলার অর্থ হলো এটা বলা যে আদর্শ হিসেবে সেক্যুলারিজমের একটি সর্বজনীন ধারণা আছে। সুতরাং, ধারণাটি সম্পর্কে সম্ভবত আমাদের বহুবচন ব্যবহার করার, সেক্যুলারিজমগুলো বলার বোধ তৈরি করা উচিত।

তৃতীয়ত, সাধারণভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় এবং নির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশে সেক্যুলারিজমের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং গতিপ্রকৃতি বিষয়ে জোরালো আলোচনার দাবি রাখে। এই বিষয়ে আমি টি এন মদনের সঙ্গে একমত, 'দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলোতে সেক্যুলারিজম ধারণাটির হস্তান্তরযোগ্যতা [অর্থাৎ বাইরে থেকে এনে

চালু করার বিষয়] সমস্যায় আকীর্ণ এবং এটাকে অবধারিত বলে ধরে নেওয়াও উচিত নয়। সেক্যুলারিজমকে অবশ্যই যথাযথভাবে বিবেচনা করতে হবে; যার অর্থ এটিকে বাতিল করে দেওয়া নয়, বরং এর অভিব্যক্তির উপযুক্ত উপায় খুঁজে বের করা। এটা মেনে নেওয়া উচিত যে দক্ষিণ এশিয়ার মতো বহুধর্মমতের সমাজগুলোতে সেক্যুলারিজমকে কেবল যুক্তিবাদের মধ্যে আটকে রাখা যাবে না, এটি ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যুক্তিবাদ (পশ্চিমে যেভাবে বোঝা হয়) জাতিরাষ্ট্রের একক প্রেরণাশক্তি নয়। এ রকম অবস্থানের প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলো কী হবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে।'[৪৫]

চতুর্থত, পূর্ববর্তী আলোচনার সঙ্গে আমি আরও যোগ করতে চাই যে এই প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত অবশ্যই একটি অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হওয়া উচিত, যাতে করে জনগণ মতাদর্শিক বিশ্বাসের পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্নভাবে এই আলোচনায়, নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রচনায় সমানভাবে অংশ নিতে পারে। এই বিষয়ে আমি চার্লস টেইলরের সঙ্গে একমত যে 'আমরা মনে করি সেক্যুলারিজমের (বা লাইসেটির) বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কের বিষয় কিন্তু আসলে এটি হচ্ছে সমাজে বিরাজমান বৈচিত্র্যের প্রতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের (সঠিক) প্রতিক্রিয়ার বিষয়।'[৪৬] ফলে আমি যে আলাপ-আলোচনার, মিথস্ক্রিয়ার কথা বলছি তা অবশ্যই মৌলিক গণতান্ত্রিক নীতির ওপর ভিত্তি করে হতে হবে অর্থাৎ বহুত্ববাদ এবং বৈচিত্র্যের সুরক্ষা এবং সহনশীলতা হবে তার মূল ভিত্তি। গণতন্ত্র সবার জন্য—ধর্ম, লিঙ্গ, রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং এই রকম সব বিষয়ের ঊর্ধ্বে উঠে ব্যক্তির অধিকার এবং স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। সেক্যুলারিজমকে ন্যায্যতা দান করতে এসব নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়া ইতিবাচক তো নয়ই, এমনকি তা সেক্যুলারিজমের জন্যই ক্ষতিকর।

পঞ্চমত, যদি আমার পূর্বোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট না হয়, তবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি এই কথাটি পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে আমি সেক্যুলারিজমের কোনো বিকল্পকে সমর্থন করছি না, বরং আমি বিকল্প অনেক ধরনের সেক্যুলারিজমের কথা বলছি। কোনো একটি পূর্ব-নিরূপিত সমাধানের কথা মাথায় না রেখে এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসকে লক্ষ্য হিসেবে আগেই ধরে না নিয়ে রাজনীতি এবং জনজীবনে ধর্মের ভূমিকা-সম্পর্কিত চলমান আলোচনায় সবার অংশগ্রহণের গুরুত্ব আমি তুলে ধরতে চেয়েছি। এমনকি যখন সেক্যুলারিজমকে একবচনে বলা হয় তখনো সেক্যুলারিজম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ এবং বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসকে ধারণ করে। যেহেতু বিভিন্ন ধরনের শক্তিসম্পর্কের পরিণতি হিসেবে সেক্যুলারিজমের ধারণার উত্থান ঘটেছে, তাই এটাকে সচল এবং পরিবর্তনশীল ধারণা হিসেবে দেখা প্রয়োজন।

ভিনসেন্ট পিকোরা বলেছেন, 'সেক্যুলারিজম নিজে কেবল একটি সাধারণ শব্দ নয়, যা ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুপস্থিতির—তার অর্থ যা-ই হোক না কেন—সেই রকম একটি নেতিবাচক অবস্থাকে প্রতিনিধিত্ব করে; বরং এটি এমন একটি শব্দ, যা প্রায় "ধর্ম"র মতোই অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে।' আশীষ নন্দী মনে করেন, সেক্যুলারিজম অর্থ হচ্ছে অপশ্চিমা ধর্মীয় গোষ্ঠীর ওপর পশ্চিমা মূল্যবোধ আরোপ করার শামিল, তালাল আসাদ মনে করেন সেক্যুলারিজম একটি নির্দিষ্ট শাসকশ্রেণির কার্যক্রম। আমরা যদি এই সব বক্তব্যের সঙ্গে একমত নাও হই, তবুও আমরা আর সেক্যুলারকে নিরপেক্ষ, ইতিহাসবর্জিত, রাজনীতিবর্জিত এবং বিশুদ্ধ যৌক্তিকতার আলোয় দেখার বিলাসিতা করতে পারি না।[৪৭]

তথ্যসূত্র :

১. Saba Mahmud, 'Secularism, Hermeneutics, and Empire: The Politics of Islamic Reformation.' *Public Culture*, 18 (2), 2006, 323 (323-347)

২. Jurgan Habermas, 'Religion in the Public Sphere', *European Journal of Philosophy*, 14 (1), 2006, 16 (1-25)

৩. Richard Ekins, 'Secular Fundamentalism and Democracy', *Journal of Markets and Morality*, 8 (1), Spring 2005, 82 (81-93).

৪. George Jacob Holyoake, *The Principles of Secularism*. 3rd ed rev. London: Austin, 1870, 11.

৫. Charles Taylor, 'Modes of Secularism', in Rajeev Bhargava, ed., *Secularism and Its Critics*, New Delhi: Oxford University Press, 1998, 31.

৬. Nader Hashmi, Islam, *Secularism and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies*, Oxford: Oxford University Press, 2009, 106.

৭. The Turkish Constitutional Court, 16 January 1998, no. 1998/1.

৮. Saba Mahmood, *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*, Princeton: Princeton University Press, 2005, 191.

৯. Peter L Berger, 'Some Second Thoughts on Substantive versus Functional Definitions of Religion', *Journal for the Scientific Study of Religion*, 13 (2), June, 1974, 132, (125-133).

১০. Jose Casanova, *Public Religions in the Modern World*, Chicago: University of Chicago Press, 1994.

১১. সেক্যুলারকরণের কোনো একক তত্ত্ব কখনো ছিল না, তবে এসব তত্ত্বের মধ্যে সেক্যুলারকরণ প্রক্রিয়ার শেষ পরিণতি বিষয়ে একটি বৃহত্তর মতৈক্য রয়েছে।

১২. দেখুন, ১৯৬৬ সালের ৮ এপ্রিলের সাপ্তাহিক *টাইম* ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ; সাপ্তাহিক *দ্য ইকোনমিস্ট* পত্রিকার ২৩ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত The 'obituary' of God; তবে *দ্য ইকোনমিস্ট* ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর সংখ্যায় লিখেছে 'এই শতকের রাজনীতিতে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

১৩. Peter L. Berger, 'Secularism in retreat', *The National Interest*. 46, Winter 1996; 3

১৪. David Herbert, *Religion and Civil Society: Rethinking Public Religion in the Contemporary World*. Aldershot, England: Ashgate, 2003

১৫. T N Madan, 'Secularism in Its Place,' in Rajeev Bhargava (ed.), *Secularism and Its Critics*, New Delhi: Oxford University Press, 2005, 308 (297-320).

১৬. তালাল আসাদের সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার নেন Saba Mahmood, *SEHR*, 5 (1), 1996 (http://web.stanford.edu/group/SHR/5-1/text/asad.html).

১৭. Elizabeth Shakman Hurd, *The Politics of Secularism in International Relations*. Princeton: Princeton University Press, 2008, 13.

১৮. Craig Calhoun. 'The Political Future of Religion and Secularism.' *La Clé des Langues* (Lyon: ENS LYON/DGESCO). ISSN 2107-7029. Mis à jour le 21 février 2013. http://cle.ens-lyon.fr/anglais/the-political-future-of-religion-and-secularism-180922.kjsp

১৯. Anders Berg-Sorensen, 'Introduction: Contesting Secularism' in Andres Berg-Sorensen (ed.), *Contesting Secularism*, Surrey, England: Ashgate, 2013, 2.

২০. Ashish Nandy, 'The Politics of Secularism and the Recovery of Religious Tolerance' in Rajeev Bhargava (ed.), *Secularism and Its Critics*, New Delhi: Oxford University Press, 2005, 321 (321-343). ‰es

২১. Craig Calhoun. 'The Political Future of Religion and Secularism.' 2013

২২. Philip Gorski, David Kyuman Kim, John Torpey and Jonathan VanAntwerpen, 'The Post-Secular in Question' in Gorski et al (eds.), *The Post-Secular in Question: Religion in Contemporary Society*, New York: NYU Press, 2012, 6.

২৩. Jose Casanova, *Public Religions in the Modern World*, Chicago: University of Chicago Press, 1994; 'Public Religions Revisited,' in Hent de Vries (ed.). *Religion: Beyond the Concept,* Fordham: Fordham University Press, 2008, pp. 101-119; এবং 'Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective', *The Hedgehog Review*, Spring & Summer 2006, 7-22.

২৪. Alfred Stepan, 'The World's Religious Systems and Democracy: Crafting the "Twin Tolerations",' in *Arguing Comparative Politics* Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 218-225.

২৫. Charles Taylor, 'Why We Need a Radical Redefinition of Secularism', in *The Power of Religion in the Public Sphere*, Judith Butler, Jurgen Habermas, Charles Taylor, Cornel West, Edited by Eduardo Mendieta and Jonathan VanAntwerpen. New York: Columbia University Press, 2011

২৬. Rajeev Bhargava, 'Multiple Secularisms and Multiple Secular States' in Andres Berg-Sorensen (ed.), *Contesting Secularism*, Surrey, England: Ashgate, 2013, 17-42.

২৭. Larry Diamond, in Larry Diamond, Marc F. Plattner and Philip J. Costopoulos (eds.) *World Religions and Democracy*, Stanford: Stanford University Press, 2005.

২৮. Bhargava, 'Multiple Secularisms and Multiple Secular States', 2013, 34 (17-42).

২৯. Jose Casanova, 'The Secular and Secularisms', *Social Research*, 76 (4), The Religious-Secular Divide: The U.S. Case, Winter 2009, 1051 (1049-1066).

৩০. Ahmet T. Kuru, *Secularism and State Policies toward Religion*. New York: Cambridge University Press, 2009.

৩১. Oilvier Roy, *Secularism Confronts Islam*, New York: Columbia University Press, 2007, xii

৩২. Roy, Secularism Confronts Islam, 2005, 11.

৩৩. Stanley J Tambiah, 'The Crisis of Secularism in India' in Rajeev Bhargava (ed.), *Secularism and Its Critics*, New Delhi: Oxford University Press, 2005, 422 (418-452).

৩৪. Achin Vanaik, *The Furies of Indian Communalism: Religion, Modernity and Secularization*, London: Verso, 1997, 68.

৩৫. Vanaik, The Furies of Communalism, 1997, 66.

৩৬. Craig Calhoun, 'Time, World, and Secularism', in Philip Gorski, David Kyuman Kim, John Torpey and Jonathan VanAntwerpen (eds.), *The Post-Secular in Question: Religion in Contemporary Society*, New York: NYU Press, 2012, 346 (335-364).

৩৭. Teodor Shanin, 'Class, State and revolutions: Substitutes and Realities', in Hamza Alavi and Teodor Shanin (eds.), *Introduction to the Sociology of the 'Developing Societies,'* New York: Monthly Review Press, 1982, 315.

৩৮. Vanaik, *The Furies of Communalism,* 1997, 39.

৩৯. Mark Juergensmeyer, *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State*. California: University of California Press. 1994, 2

৪০. William F.S. Miles, 'Political Para-theology Rethinking Religion, Politics and Democracy', *Third World Quarterly*, 17, 1996: 525 (525-536)

৪১. Ali Riaz, *God Willing: The Politics of Islamism in Bangladesh*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2004; Salwa Ismail, *Rethinking Islamist Politics Culture, the State and Islamism.* London: I B Tauris. 2006; Francois Burgat, *Face to Face with Political Islam.* London: I B Tauris. 2003; Bobby S Sayyid, *A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism.* London: Zed Books. 1997. দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Ali Riaz (ed.), *Religion and Politics in South Asia*, London: Routledge, 2010.

৪২. Ashutosh Varshney, 'Contested Meanings: India's National Identity, Hindu Nationalism, and the Politics of Anxiety', *Daedalus*, 122 (Summer 1993): 242.

৪৩. Ashutosh Varshney, 'Contested Meanings', 243

৪৪. Vanaik, *The Furies of Communalism*, 1997, 38.

৪৫. T N Madan, 'Secularism in Its Place', *The Journal of Asian Studies*, 46 (4), Nov 1987, pp. 753 (747-759).

৪৬. Charles Taylor, 'The Meaning of Secularism', *The Hedgehog Review*, Fall 2010, 25 (23-34).

৪৭. Vincent Pecora, 'Rethinking secularism: Secularism, secularization, and why the difference matters', *The Immanent Frame*, SSRC, 2010; http://blogs.ssrc.org/tif/2010/06/18/why-the-difference-matters/

খ্যাতি
সাক্ষাৎকার
চিন্তা

অজয় রায়ের সাক্ষাৎকার

যদি কোনো মতবাদে বিশ্বাস থেকে থাকে মার্ক্সবাদের ওপর বিশ্বাস অবশ্যই আছে

জন্ম ১৯২৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে। রাজনীতিবিদ ও লেখক। স্কুলজীবনেই কমিউনিস্ট নেতাদের সান্নিধ্য পান এবং তখন থেকেই সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠেন। ১৯৪৬ সালে মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজে ডিগ্রি ক্লাসে ভর্তি হন। প্রথম কারাবাস ১৯৪৮ সালে। ষাটের দশকে কারা-অভ্যন্তরে থাকা অবস্থায় এমএ পাস করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনসহ মুক্তিযুদ্ধে রয়েছে বিশেষ অবদান। রাজনৈতিক মামলায় কারাগারে কাটিয়েছেন প্রায় ১৫ বছর। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *বাঙলা ও বাঙালী*, *আমাদের জাতীয়তার বিকাশের ধারা*, *বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলন ১৯৪৭-৭১*, *গণ-আন্দোলনের নয় বছর*, *তীরের অন্বেষায়* প্রভৃতি। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। এখনো তিনি রাজনীতি ও লেখালেখিতে সক্রিয়।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, ষাটের দশকের আন্দোলন-সংগ্রাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন—এই কালপর্বে কমিউনিস্ট পার্টির পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়ে পার্টির তৎকালীন সক্রিয় নেতা **অজয় রায়**-এর সঙ্গে **মতিউর রহমান**-এর আলাপচারিতা।

মতিউর রহমান : শুরুতেই জানতে চাইছি, মার্ক্সবাদে কি আপনার এখনো বিশ্বাস আছে?

অজয় রায় : যদি কোনো মতবাদে বিশ্বাস থেকে থাকে—বিশেষ করে ইতিহাসের

বিবর্তন সম্পর্কে কার্ল মার্ক্সের যে বক্তব্য, সমাজবিকাশের বিষয়ে যে বক্তব্য, সেই জায়গায় মার্ক্সবাদের ওপর আমার ধারণা-বিশ্বাস অবশ্যই আছে। সেটা আক্ষরিক অর্থে নয়, তাঁর মূল যে বিষয়, সেখানে বিশ্বাস অবশ্যই আছে।

মতিউর রহমান : মূল বিষয়টি কী? যেভাবে বলা হয়, আদিম সাম্যবাদ, দাসপ্রথা, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের পরে সমাজতন্ত্র, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এই যে ব্যাখ্যা এটার কথা কি আপনি বলছেন?

অজয় রায় : শুরু থেকেই একটা প্রশ্ন আমার ভেতরে ছিল। যেমন দাস-সমাজব্যবস্থা নিয়ে যেটা ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের বইতে পড়েছি, তার কোনো ধরন চীন বা ভারতে কখনো দেখিনি। তবে, মিসরসহ প্রাচীন সভ্যতার বেশির ভাগ দেশেই ছিল। শুনেছি, মিসরে পিরামিড তৈরিতে যে বিপুলসংখ্যক মানুষের শ্রম ব্যবহৃত হয়েছে, এটার সবই দাসদের। স্বাভাবিকও সেটা। তবে ভারত ও চীন সম্পর্কে এটা খাটে না।

মতিউর রহমান : তাহলে তাজমহলে ২২ হাজার শ্রমিক ২০ বছর কাজ করেছিল, তারা কি দাস হিসেবে, না শ্রমিক হিসেবে? নাকি বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে?

অজয় রায় : তারা বনডেড লেবার (বাঁধা শ্রমিক) ছিল। বনডেড লেবার তো এখনো আছে। আগেও ভারতবর্ষে বনডেড লেবার ছিল।

মতিউর রহমান : হ্যাঁ, বিশ্বের বহু জায়গায় সেটা এখনো আছে।

অজয় রায় : একটা বিষয় বলা দরকার, ভারতের কমিউনিস্ট নেতা ডাঙ্গে [শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে (১৮৯৯-১৯৯১)] ছিলেন লেখাপড়া জানা লোক, সংস্কৃত জানা পণ্ডিত এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আদিযুগের পরের নেতা। তিনি যখন জেলে ছিলেন, লিখলেন *ফ্রম প্রিমিটিভ কমিউনিজম টু স্ল্যাভারি*। আমরা তখন ভাবলাম, এই হলো আসল কমিউনিস্ট। কিন্তু ইতিহাসবিদ ডি ডি কোসাম্বি লিখলেন যে ডাঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা হলেই ইতিহাস জানবেন, এমন কোনো কথা নেই। খুব কঠিনভাবে কথাটা বলেছিলেন তিনি।

মতিউর রহমান : মার্ক্সবাদের পর্ব বা এর ধারাবাহিক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে যদি আপনি আসতে থাকেন, বিশেষ করে অর্থনীতি ও দর্শনের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রভাব...

অজয় রায় : আমার কাছে যেটা মনে হয় দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া সব সমাজেই যে একই রকম হবে, তার কোনো মানে নেই। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের পরস্পরের যে সংঘাত, এর মধ্য দিয়ে সমাজের যে পরিবর্তন, সেটা আমি গ্রহণ করি।

মার্ক্সবাদ শেখা নিয়ে আমাদের একটা সমস্যা আছে। কারণ আমরা মার্ক্সবাদ শিখেছি কার কাছ থেকে? আপনারা শিখেছেন পাকিস্তান আমলে। আর আমরা শিখেছি আরেকটু আগে থেকে। আমাদের উৎস ছিল প্রধানত বিলেত। বিলেত কোত্থেকে শিখেছে? উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিএসইউ) নিয়ন্ত্রণাধীন তৃতীয় আন্তর্জাতিক অর্থাৎ মস্কো থেকে। তার পরবর্তী সময়ে আমরা আরও শিখলাম চীন থেকে। তা ছাড়াও কিন্তু মার্ক্সবাদের আরও কিছু কেন্দ্র ছিল। এর মধ্যে ছিল জার্মানি, ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্স। পরে যেহেতু মস্কো তাদের মতভিন্নতা গ্রহণ করতে পারল না; তাই আমরাও বাতিল করলাম।

মতিউর রহমান : সবকিছুর পরে আপনি কী বলবেন, সমাজতন্ত্র বা মার্ক্সবাদ কি শেষ হয়ে গেল? এর কি পুনরুজ্জীবন আর সম্ভব? কিংবা নতুন কেন্দ্র কি তৈরি হওয়া সম্ভব?

অজয় রায় : আমি তো একটা দেখছি, যেমন ওয়ান পার্সেন্ট ভার্সেস নাইন্টি নাইন পার্সেন্টের লড়াই। বিশ্বে তো দেখলাম—আজকের পুঁজিবাদ ঘুরে ঘুরে একটা জায়গায় আবর্তিত হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় যে নানা ধরনের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে, সেগুলো তো গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি আমাদের এখানে শাহবাগ স্কয়ারে তার কিছুটা স্ফুরণ দেখেছি। তবে এসবের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে সমাজ পরিবর্তিত না হোক, দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে যে অগ্রগতির পথ, সেটা তো দেখাই যায়।

মতিউর রহমান : বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত সমাজতন্ত্র বা পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়ার মধ্য দিয়ে মার্ক্সবাদ কি ব্যর্থ হয়ে গেল? এর পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা কতটুকু?

অজয় রায় : পুনরুজ্জীবনের কোনো উপায় নেই। কারণ পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা জীবনই ঠিক করে দেবে। ড. নজরুল ইসলাম (বর্তমানে জাতিসংঘে কাজ করছেন) ১৯১৭ সালের অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে 'ফল্‌স স্টার্ট' বলেছেন। কিংবা যা-ই বলুক, একটা বিষয় হলো সোশ্যালিজম ওয়াজ প্র্যাকটিসড বাই মস্কো। এর কিছু সুফল তো আছে।

সুতরাং সারা বিশ্বে সামগ্রিক পরিবর্তন না আনতে পারলেও ইতিবাচক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী বড় ভূমিকা তো রেখেছেন কমিউনিস্টরা। তার মধ্যে উপনিবেশবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ ইত্যাদিতে অনেক বড় অবদান রেখেছে। মার্ক্সবাদের একটা বড় দর্শন হচ্ছে জীবনের চলিষ্ণুতা। বারবার সমাজের এই পরিবর্তন, এটা কিন্তু জীবনই দেখিয়ে

দিচ্ছে। এই জীবনটা ডগম্যাটিক মার্ক্সিজম, তা না।

মতিউর রহমান : তাহলে এই যে ডগম্যাটিক ধারণার মার্ক্সবাদ, রাশিয়া বা চীনে ছিল, সেটা কি অচল হয়ে গেছে? নতুনভাবে নানা তর্কবিতর্ক, দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে—আপনি বলছেন, জীবনের চলিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে যা টিকে আছে, সেটাকে ভবিষ্যতে কি আমরা মার্ক্সবাদ বলতে পারব?

অজয় রায় : মার্ক্সের আগেই অ্যাজিউম অব মার্ক্সবাদ কথাটা চালু হয়ে গিয়েছিল এবং বিশ্বে সেটা গৃহীত। মার্ক্স যে বিষয়টা দেখিয়েছেন, সমাজটা স্থির নয়, সমাজটা চলমান। সুতরাং এই পরিবর্তনশীলতা তো আমরা অনেক জায়গায় দেখি। আর পরিবর্তনের মধ্যে মানুষের একটা ভূমিকা রয়েছে। সেটাও তো দেখি।

আজ ফল্‌স স্টার্ট বলি আর যা-ই বলি, যে সংকটটা সৃষ্টি হয়েছে, সেটা হলো তৃতীয় আন্তর্জাতিকের (কমিন্টার্ন) আগে তো দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ছিল। সেখানে তো শ্রমিক আন্দোলন বা বিপ্লবের মাধ্যমে সারা বিশ্বে পরিবর্তন আনার মতো নানা ধরনের সক্রিয়তা লক্ষ করা গেছে। কিন্তু তারপরে? সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি আন্ডার দ্য কন্ডিশন অব রাশিয়ান হোয়াইট টেররে—তৎকালে কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র একটা হয়েছিল। তারা করেছিল সেটা। তারা করেছিল বলশেভিক পার্টি। তার পরবর্তীকালে যখন তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠন করা হয়, সেই গঠনকাঠামোটি, আমাদের দেশে অথবা ইংল্যান্ডে অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্যের মতাদর্শের হুবহু কেন প্রয়োগ হবে? আমাদের দেশ—যেখানে শ্রমিকশ্রেণিই গড়ে ওঠেনি, শ্রমিকশ্রেণি বাস্তবে সেভাবে ছিলও না, সেখানে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে কীভাবে বিপ্লব হবে? এসব অবাস্তব অনেক কিছু আমরা ভেবেছি। অনেক ভুল করেছি।

মতিউর রহমান : বিভিন্ন দেশে তো মার্ক্সবাদী বড় বড় পণ্ডিত, নেতা, সংগঠক ছিলেন, তাঁরাও বিকল্প কিছু করতে পারলেন না, শুধু সোভিয়েত নীতি বা পরামর্শ অনুসরণ করলেন। তাঁদেরও পতন হলো। এর দায় কি শুধু দ্বিতীয় বা তৃতীয় আন্তর্জাতিককে দেবেন, নাকি ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক ধরে দেশে দেশে যাঁরা নেতৃত্ব দিলেন, তাঁদের? মার্ক্সবাদ যদি আপনার কথামতো চলমান-চলিষ্ণু একটা ব্যাপার হয়, তবুও বলা যায়, বড় বড় পণ্ডিত-বিপ্লবী-পরিবর্তনমুখী মানুষ তো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেও ছিলেন, তাঁরাও তো পারলেন না নতুন কোনো পথের সন্ধান দিতে।

অজয় রায় : ভারতবর্ষের কথা বলছেন, সেটাই বলি। ভারতের কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করতেন। কংগ্রেস-নেতৃত্বের কাছে ব্যাপারটা জানা

ছিল—অন্তত পণ্ডিত নেহরু ও মাওলানা আজাদ জানতেন চিনতেন তাঁদের। মন্বন্তররটা শুরু হলো ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনের সময়। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে সম্ভবত ১২-১৫ জন কমিউনিস্ট ছিলেন। যদি আমার ভুল না হয়, খুব সম্ভবত সরদার শাহ ছিলেন তাঁদের মুখপাত্র। তাঁরা বিরোধিতা করলেন 'কুইট ইন্ডিয়া' (ভারত ছাড়) মুভমেন্টের। কেন? ওয়ার ইজ পিপল'স ওয়ার অর্থাৎ যুদ্ধটা সাধারণ মানুষের হয়ে গেছে। যখন কমিউনিস্টরা বিরুদ্ধে ভোট দেবেন, তখন মাওলানা আজাদ সরদার শাহকে মঞ্চে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁকে বললেন, তোমাদের যুক্তি আমি বুঝি। কিন্তু এখন এটার বিরুদ্ধে তোমরা যেয়ো না—তোমরা বিরুদ্ধে ভোট দিয়ো না। ভোট দিলে তো তোমাদের ১৫-২০টা ভোটে কিছু আসবে-যাবে না। তারপর কী হলো?

আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমি তখন বেনারসে থাকি। ক্লাস নাইনে পড়ি। এক দিন বেনারস ইউনিভার্সিটির গেটে ছাত্ররা মিছিল করতে বেরোবে, বাইরে পুলিশসহ সরকারের বাহিনী আছে। তারা বেরোলেই আক্রমণ করা হবে। তার আরেক পাশে কয়েকজন কমিউনিস্ট মাইকে প্রচার করছেন, এই আন্দোলন ভুল। তাঁরা ওই আন্দোলনের পুরোপুরি বিরুদ্ধাচরণ করছেন। এই ঘটনা, এই বিচ্ছিন্নতা, এর দায়টা কার?

১৯৪২-এর পরে '৪৫-'৪৬-এ গান্ধী সম্পর্কে যে নিন্দাসূচক কথাবার্তা কমিউনিস্টরা বলেছেন, তা ঠিক ছিল না। আমার মনে আছে, পাকিস্তান হওয়ার পরপরই তো আর সংকীর্ণ অতি বিপ্লবী বামধারা আসেনি। পাকিস্তান হওয়ার পর কয়েক মাস সময় ছিল। ১৯৪৮ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর তা শুরু হলো। এসবের আগে কমিউনিস্ট পার্টির একটা বুকলেট বের হলো 'স্বাধীন সুখী পাকিস্তান গড়ে তুলুন'। তখন তো একটাই পাকিস্তান ছিল। আমিও রংপুরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এটা বিক্রি করেছি ছাত্রদের কাছে। অনেক বিক্রি হয়েছে। কারণ, সেটা ছিল জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। যেই উল্টোটা হয়ে গেল, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের সিদ্ধান্ত হয়ে গেল—সবকিছুর বদল ঘটে গেল।

মতিউর রহমান : হ্যাঁ কলকাতায় পার্টির বৈঠকের সিদ্ধান্তের পর ১৯৪৮ থেকে শুরু হয় 'ইয়া আজাদি ঝুটা হ্যায়' সশস্ত্র আন্দোলন। '৪৯-'৫০-'৫১-তে এ রকম আন্দোলনের অবস্থা কি ছিল?

অজয় রায় : শোনেন, মুন্সিগঞ্জ শহরে আমাকে চিনত না, এ রকম লোক কম ছিল। আমাকে সমর্থন করুক আর না করুক, মানুষ আমাকে চিনত। কারণ ছোট্ট শহর মুন্সিগঞ্জে তখন ১ হাজার লোকের বাস। আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা

হলো '৪৯ সালের প্রথমে—বজ্রযোগিনী গ্রাম থেকে। গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে গ্রাম থেকে হাঁটিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছিল পুলিশ কেন্দ্রে। একটা লোকও সহানুভূতি জানায়নি। আমি মোটেও কোনো অপরিচিত লোক ছিলাম না। সবেমাত্র পাকিস্তান হয়েছে। মানুষের মধ্যে তখনো আশাবাদ আছে। তখন সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক অসম্ভব-অবাস্তব ভাবনা ছিল।

মতিউর রহমান : ওই ভুলের দীর্ঘস্থায়ী একটা প্রভাব পড়ল গ্রেপ্তার-অত্যাচার-নির্যাতন, রাজশাহী জেলের অভ্যন্তরে খাপড়া ওয়ার্ডে হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। ইতিমধ্যে পার্টির মধ্যে চিন্তার পরিবর্তন এল কিছুটা। আবার তো বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। আবার কলকাতা বৈঠকের পর পার্টির পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে '৫১ থেকে '৫২ ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা-উদ্যোগ তো ছিল।

এরপর '৫৪-এর নির্বাচন এল। এরপর ১৯৫৮ সাল। আবার আমরা যেভাবেই দেখি না কেন, ১৯৬২-তে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন বা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিশাল একটা গণ-আন্দোলন গড়ে উঠল। সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা ছিল। আবার বলতে পারেন কমিউনিস্ট পার্টি আত্মগোপনে থাকলেও ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আবার তারা সমাজে ও দেশে প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো।

কমিউনিস্ট পার্টি এই যে ভূমিকা রাখল '৫২ থেকে '৬২ কিংবা '৬২ থেকে '৬৮ পর্যন্ত, সেখানে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টির কি প্রভাব ছিল? নাকি এই আন্দোলনটা নিজেদের উদ্যোগেই গড়ে তোলা হয়েছিল? সেই সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) পরামর্শ কি আমরা নিতাম? নাকি নিজেরা স্বাধীনভাবে চলতাম?

অজয় রায় : কিছু পরামর্শ হয়তো নেওয়া হতো। কিছুটা যোগাযোগ ছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে নিজেরাই নিতাম। ফলে আমার বিবেচনা হচ্ছে, মাঝখানে একটু বিরতি বাদ দিলে কমবেশি একাত্তর পর্যন্ত—জাতীয় আন্দোলনকে প্রভাবিত করার মতো কিছু কাজ আমরা করেছি। আর সেটা শুধু কমিউনিস্ট বা মার্ক্সবাদের জন্য নয়, এ দেশের স্বাধীনতার পক্ষে, এ দেশের বিকাশের পক্ষে। এমনকি এখানকার মননশীলতা বিকাশের ক্ষেত্রেও কিন্তু কমিউনিস্টরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পেরেছেন। এখানে সেই রকম ঘটেছিল বলেই তো হয়েছিল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সেই বিখ্যাত গল্প 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' পড়লে এখনো চোখে জল আসে। এটা ঠিক গল্প-কবিতা-গান-গণসংগীত-সংস্কৃতিচর্চা, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন—এসবের ক্ষেত্রে আদর্শগত অবস্থানে থেকেও বেশ বড় ভূমিকা পালন করেছেন কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা। কমিউনিস্টদের-

বামপন্থীদের বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল এই সময়টায়। তাঁদের এই প্রভাব বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একেবারে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

মতিউর রহমান : কমিউনিস্ট পার্টি সাংগঠনিকভাবে ছোট ছিল, দুর্বল ছিল। কিন্তু আদর্শগতভাবে চিন্তাচেতনার দিক থেকে ছিল বেশ অগ্রসরমাণ। যে কারণে প্রভাবকের একটা ভূমিকা ছিল। কমিউনিস্ট নেতৃত্ব যত ছোট, যা-ই হোক না কেন, তারা এটা ভেবে করেছে। আপনার মতেও তারা এটা স্বাধীনভাবেই করেছে।

অজয় রায় : তবে একটা বিষয়ে আমি বলতে পারি। সেটা জেলখানার অভিজ্ঞতা। তখন ওই সময়ের কমিউনিস্টরা একটা কৌশল নিলেন। সেটা হলো আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যে থেকে কাজ করো, পরে আবার আওয়ামী লীগের মধ্যে থেকেও কাজ করো। এর বিরুদ্ধে একটা প্রবল অভিমত ছিল তখনকার পার্টিতে। যাঁরা এর বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন খুলনার ডা. মারুফ হোসেন প্রমুখ। আমার মনে আছে, রাজশাহীর পার্টিও এর বিরুদ্ধে ছিল। আমরা যাঁরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলাম, তাঁরা ছিলাম এই নীতির পক্ষে। আমাদের বোঝানোর জন্য স্বদেশ বোস আর নলিনী দাশকে পাঠানো হলো রাজশাহী জেল থেকে। তাঁরা দুজন এসে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমাদের বোঝাতে থাকলেন। তাঁরা বললেন, কমিউনিস্টদের স্বতন্ত্র লাইন, স্বাধীন লাইন আছে। যুক্তফ্রন্টে যেহেতু কমিউনিস্টরা নেই, তাহলে কেন এদের সঙ্গে থাকবে। অ্যাট দ্যাট টাইম পার্টি লিডারশিপ সিদ্ধান্ত নেয়, এদের সঙ্গে অর্থাৎ আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যেই থাকতে হবে। পরে আওয়ামী লীগ হলে আওয়ামী লীগের সঙ্গে থেকে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়। আর ন্যাপ যখন বিভক্ত হয়, পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগ থেকে তখনই পদত্যাগ করার পক্ষে ছিল না।

মতিউর রহমান : তাহলে কি ন্যাপ করার পেছনে মারুফ হোসেনদের মতো যাঁরা ভাবতেন, তাঁদেরই দায়? তাঁরাই প্রাধান্য সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগ ভেঙে ন্যাপ করলেন?

অজয় রায় : আপনি ঠিক ধরেছেন। তেমনটিই ঘটেছিল।

মতিউর রহমান : তাহলে ঘটনাটা কী? পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে মাওলানা ভাসানীর বিরোধিতা করা? আর কে কে ছিলেন এ রকম চিন্তার?

অজয় রায় : গুলিস্তান সিনেমা হলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের (১৯৫৭ সাল) দ্বিতীয় দিনে পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী

জিতে গেলেন আর মাওলানা ভাসানী হেরে গেলেন। মাওলানা ভাসানী বাইরে এসেই তৎক্ষণাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে কয়েকটি তার পাঠালেন। তার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানীর কাছে একটা তারবার্তা পাঠালেন। আরও কয়েকজনের কাছে পাঠালেন। তিনি তাঁদের ঢাকায় ডাকলেন। মোজাফ্ফর আহমদ মাওলানার সচিব হিসেবে কাজটা করতেন। এই যে ডেকে বসলেন, তার আগে ন্যাপ নেতৃত্বের সঙ্গে পার্টির নেতৃত্বের কোনো আলোচনা হয়নি।

মতিউর রহমান : তখন কি পার্টি-নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের মধ্যে এই বিভেদ চায়নি?

অজয় রায় : অন্তত তখন চায়নি। আওয়ামী লীগের ভেতরে থেকে কিছু পরিবর্তন না এনে এটা তো পার্টি চাইতে পারে না। এটা যখন হয়ে গেল, তখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বড় বড় নেতা এলেন। বেলুচিস্তান থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গার নেতারা এলেন আলোচনা করার জন্য। ইতিমধ্যে শহীদুল্লা কায়সারের সঙ্গে কথা হলো। তিনিও এই বিভক্তির পক্ষে ছিলেন না। তিনি তখন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন। তিনি আমাকে এর সঙ্গে থাকতে বললেন। পরে দেখলাম এই প্রভাব পড়েছে মন্ত্রিসভায়।

এটা জানেন বোধ হয়, সেই সময়ে প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাপের ২৯ জন এমএলএ ছিলেন। তখন বিভেদ ছিল কৃষক প্রজা পার্টি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে। ন্যাপই ছিল ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বিশেষ শক্তি। বিষয়টা এমন দাঁড়াল যে ন্যাপে এসে লোকজন বলতে লাগলেন, আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসেছি, আমরা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেব। কিন্তু পার্টির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল, না, এটা ঠিক হবে না। আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসেছি, ঠিক আছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের সরকারকে টিকিয়ে রাখতে হবে। কারণ, যে সংবিধান হয়েছে, সেই সংবিধানের ভিত্তিতে একটা নির্বাচন হতে হবে পাকিস্তানব্যাপী। সেটাই হবে অ্যাডভান্সমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি। কারণ পার্টি জানত, মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে আইয়ুব খানের দেওয়া-নেওয়ার আলোচনা হচ্ছে। ঢাকার ইয়ার মোহাম্মদ খানের মাধ্যমে এটা হতো। তাই ন্যাপের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে আমরা ভোট দিইনি। তবে একবার ভোট দিতে হয়েছিল। যখন কেন্দ্রীয় ন্যাপ সিদ্ধান্ত নিল, তখন পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপকে এটা করতে হয়েছে।

মতিউর রহমান : আপনি যা-ই বলুন, পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে পার্টি তেমন শক্ত ভিতের ওপর কিন্তু ছিল না। ওই সময় কিছু ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা পালন করে কিছু

স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু বড় পরিসরে কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার মতো জনভিত্তি কিংবা সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি কমিউনিস্ট পার্টি করতে পারেনি। ন্যাপও পারেনি। এ বিষয়ে কী বলবেন?

অজয় রায় : ১৯৫৭ সালের দিকে অনিল মুখার্জি, শহীদুল্লা কায়সার—তাঁদের সঙ্গে আমার নামটা যুক্ত করে দিয়েছিলেন। আমরা একটা প্রস্তাব দিই। এখনকার সমাজে মধ্যবিত্তের যে বিকাশ ঘটছে, তাতে কমিউনিস্ট পার্টি কি ভিত্তি পাবে? পাবে না। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টির উচিত, একটা প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলে পার্টির কাজ করা।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলন ১৯৫৬ সালে হয়। ওটাও কলকাতাতেই হয়েছিল। এর আগে ১৯৫১ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে ডাঙ্গে (শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে) এসেছিলেন গোপনে। সেখানে রণনীতি-রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ডাঙ্গে বললেন, শোনো, তোমরা এসব রণনীতি-রণকৌশল বাদ দাও। বরং সমাজতন্ত্র কী, তোমরা কমিউনিস্ট যারা আছ, সেটা বিভিন্ন সংগঠন থেকে প্রচার করো। সেটাই তোমাদের আসল করণীয়। সেখানে ওই সময় যাঁরা ছিলেন, সবাই তাঁর কথাটা গ্রহণ করলেন। এই বিষয়গুলো যদি ধরেন, তাহলে বলা যায়, কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে এই ধরনের চিন্তা তো ছিলই।

মতিউর রহমান : ১৯৫৬ সালের সম্মেলনে কি আপনি গিয়েছিলেন?

অজয় রায় : না, আমি তখন জেলে ছিলাম।

মতিউর রহমান : ওই সময় বা ওই সম্মেলনে কি এই ধরনের কোনো আলোচনা হয়েছিল? কোনো দলিলে তা পাওয়া যায় না?

অজয় রায় : না, পাওয়া যায় না।

মতিউর রহমান : ১৯৬০ সালের দিকে কি এ রকম আলোচনা হয়েছিল?

অজয় রায় : অনিলদারা তো এ রকম আলোচনা করেছেন।

মতিউর রহমান : পার্টির কোনো ফোরামে আলোচনা হয়েছে কি না?

অজয় রায় : পার্টির কোনো ফোরামে না হলেও পার্টির নেতৃত্ব মণিদা, খোকাদা—তাঁদের সঙ্গে তো আলোচনা হতোই। তাঁদের আলোচনায় আমি থাকতাম। তবে '৬০ সালের পরে নতুন করে আর আলোচনাটা আসেনি। তত দিনে তো আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে গেছেন।

মতিউর রহমান : তখন তো আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের মতো, ন্যাপ ন্যাপের মতো। আর সিপিবি আত্মগোপনে থেকে ন্যাপের ভেতরেও কাজ করে। এই

আলোচনা তো সত্তরের দশকেও কিছুটা এসেছিল। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে '৮৭-তে তো এল—কমিউনিস্ট পার্টি নামে কোনো সংগঠন না করে অন্য নামে প্রগতিশীল দল গঠনের কথা। তখন তো মোহাম্মদ ফরহাদরাও এই রকমই ভেবেছিলেন।

অজয় রায় : মোহাম্মদ ফরহাদ দলিল উত্থাপন করেননি। তবে তাঁর হয়ে উত্থাপন করেন বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। নাহিদ তখন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন।

মতিউর রহমান : পরে তাঁরা মস্কোতে গেলেন।

অজয় রায় : ফরহাদ গেলেন, অনিলদা ওখানেই ছিলেন। সালাম ভাই ভিন্নমত পোষণ করলেন। তিনিও গেলেন।

মতিউর রহমান : আর কে গেলেন?

অজয় রায় : সালাম ভাই গিয়েছিলেন, মণি সিংহ ছিলেন। নাহিদ গিয়েছিলেন।

মতিউর রহমান : নাহিদ গিয়েছিলেন?

অজয় রায় : নাহিদ গিয়েছিলেন। কারণ, দলিল নাহিদের নামে ছিল। নতুন প্রস্তাব ছিল ভিন্ন নামে প্রগতিশীল দল গঠন করার। ফরহাদ ভাই নিজের নামে দলিল দেননি।

মতিউর রহমান : তাঁরা তো দুইটা ডকুমেন্ট নিয়ে মস্কো গেলেন। কিন্তু মস্কোতে সোভিয়েত-বন্ধুরা ফরহাদ ভাই ও নাহিদের প্রস্তাবটা গ্রহণ করলেন না।

অজয় রায় : হ্যাঁ, তাঁরা সমর্থন করেননি।

মতিউর রহমান : বলল কী, কমিউনিস্ট নামেই কাজ করতে হবে? যুক্তিগুলো কি মনে আছে আপনার?

অজয় রায় : বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দেশের গণতান্ত্রিক দিকটা অনেক দূরে সরে যায়। সুতরাং এই দিকটা কোনো দিন ফিরে আসবে না। সুতরাং পরের ধাপে যেতে হলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যেতে হবে—এ রকম সাধারণ যুক্তি ছিল।

মতিউর রহমান : তার মানে, '৫০ থেকে শুরু করে '৮০ পর্যন্ত কমবেশি আলোচনাটা ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের মতো দুর্বল অর্থনীতির ভিত্তি, মুসলিমপ্রধান দেশ, শ্রমিকশ্রেণির অনুপস্থিতি, সামন্তবাদের প্রভাব ইত্যাদি—এসব কারণে কমিউনিস্ট পার্টির নামে অগ্রসর হওয়া কঠিন। অন্য একটা মত ছিল, কমিউনিস্ট পার্টির নামেই কাজ করতে হবে। আরেকটা হলো ভিন্ন নামে প্রগতিশীল কোনো দল ন্যাপ বা অন্য কোনো দলের মধ্যে থেকে কাজ করা।

অজয় রায় : গণতান্ত্রিক পর্যায়ে বিষয়টা সেই রকমই—সমাজতন্ত্র বাদ দেন। গণতন্ত্রকে স্থিতিশীল করা ইত্যাদি নিয়ে প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া আরকি।

মতিউর রহমান : তাহলে দুর্বলতাগুলোর মধ্যে একটা দেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতা, আদর্শগত দুর্বলতা, তাত্ত্বিকভাবে বিভক্তি বা অস্পষ্টতা...এসবই ছিল। কিন্তু এটা একটা বাস্তব কারণ, আদর্শগত চিন্তার বিভক্তি—এ রকম একটা দুর্বল অবস্থানেই পার্টি সব সময় থেকে গেল।

অজয় রায় : কিন্তু এর মধ্যে এসে গেল স্বাধীনতাসংগ্রাম।

মতিউর রহমান : আপনি তো কেন্দ্রীয় কমিটিতে এলেন ১৯৭৩ সালে?

অজয় রায় : হ্যাঁ।

মতিউর রহমান : '৬৯-৭০ সালের দিকে কি সিপিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো সুযোগ ছিল? যোগাযোগ হতো?

অজয় রায় : খুব বেশি ছিল না।

মতিউর রহমান : তখন সোভিয়েত পার্টির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হতো?

অজয় রায় : সিপিএসইউয়ের সঙ্গে কিছুটা ছিল।

মতিউর রহমান : সেটা কি প্রভাবিত করার মতো কোনো যোগাযোগ?

অজয় রায় : তারা প্রভাবিত করতে চাইলে সেই বার্তাটাও সেভাবেই আসত।

মতিউর রহমান : তাহলে '৬০ থেকে শুরু করে '৭০-৭১—এই সময়কাল পর্যন্ত পার্টি নেতৃত্ব মোটামুটি স্বাধীনভাবেই কাজ করেছে বলা যায়?

অজয় রায় : হ্যাঁ, কমবেশি নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মতিউর রহমান : এই সময়টা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল বলেই সামগ্রিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজগুলো পার্টি করতে পেরেছিল?

অজয় রায় : যদি বাঁধনটা থাকত, তাহলে এ রকমটা হতো না। আবার, আমি স্পষ্টভাবেই বলি, এই সময়ে পার্টির বড় দলের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না।

মতিউর রহমান : আমি '৮৭ কি '৯০-এর দিকে কলকাতায় গিয়েছিলাম। সেখানে নেপাল নাগের স্ত্রী আমাকে একটা প্যাকেট দিয়েছিলেন। সেটাতে দুটো পুরোনো *শিখা* আর নেপালদা মস্কোতে '৮১-এর সম্মেলনে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে কী আলাপ করবেন, সেসব পয়েন্ট ছিল। সেখানকার আলোচ্যসূচির কিছু বিষয় আমার মনে আছে। সেসব নিয়ে হয়তো পরামর্শ করা

হয়েছে। তারপরও আমরা ধরে নিতে পারি, একাত্তরে নিজেরা স্বাধীনভাবেই যুদ্ধে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে জাতীয় আন্দোলনে বড় ভূমিকা পালন করেছে কমিউনিস্ট পার্টি।

অজয় রায় : ঠিক তা-ই।

মতিউর রহমান : যোগাযোগটা...

অজয় রায় : যোগাযোগটা কিছু ছিল।

মতিউর রহমান : নেপাল নাগ তো মস্কোতে দুবার গেলেন—'৮১-তে পার্টির কংগ্রেসেও গেলেন। পরে আবার গেলেন।

অজয় রায় : আর অনিলদা তো চিকিৎসার জন্য গেলেন।

মতিউর রহমান : ষাটের দশকের শেষের দিকে চট্টগ্রাম থেকে একটা জাহাজে করে তিনি গিয়েছিলেন গোপনে, তাই না?

অজয় রায় : না না, কলকাতা থেকে। চট্টগ্রাম থেকে না। তাঁর একটা কঠিন অসুখ হয়েছিল। সে জন্য প্রথমে কলকাতায় গিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য। সেখান থেকেই সোভিয়েত জাহাজে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

মতিউর রহমান : আমাকে কিন্তু বলেছিলেন, তিনি চট্টগ্রাম থেকে সেখানে গিয়েছিলেন কঠিন এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। পাসপোর্ট ছাড়া।

অজয় রায় : হ্যাঁ, পাসপোর্ট ছাড়া গিয়েছিলেন।

মতিউর রহমান : তাহলে তিনি ফিরলেন কেমন করে?

অজয় রায় : ওভাবেই এসেছেন। প্রথমে কলকাতায় এসে নেমেছেন। তখন তো মুক্তিযুদ্ধ চলছে।

মতিউর রহমান : কিন্তু অনিলদা এ নিয়ে কোথাও লেখেননি?

অজয় রায় : না, এটা লেখেননি।

মতিউর রহমান : আমরা যদি এভাবে দেখি, '৫০-৬০-এর দশকে একধরনের উত্থানপতন-দ্বন্দ্বসংঘাত এসবের মধ্য দিয়ে এগোল সিপিবি। পঞ্চাশের দশকে ছাত্র-যুবক আর ষাটের দশকের দিকে কিছুটা শ্রমিক আর কৃষকশ্রেণির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ে। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা—গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন, ভাষা-সংস্কৃতির জন্য কাজ করার ব্যাপারে নেতৃত্বে না থাকলেও পার্টি বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল। এই পর্বটাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

অজয় রায় : আমি মনে করি, সেটা ছিল সঠিক ভূমিকা এবং আমাদের দেশের

মানুষের জন্য স্বাধীনতা যদি একটা ল্যান্ডমার্ক হয়, তাহলে স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের ব্যাপারে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পেরেছি। স্বাধীনতা আনার ক্ষেত্রে চিন্তাচেতনা বিনির্মাণে দ্বিজাতিতত্ত্বের বাইরে আসার চেষ্টা করা হয়, সেখানেও আমরা ভূমিকা রাখতে পেরেছি।

মতিউর রহমান : ষাটের দশকে সিপিবির নেতৃত্বে চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বটা নিয়ে কিছু বলবেন? এখন কীভাবে দেখেন ব্যাপারটাকে? একদিকে হক-তোয়াহার নেতৃত্বে চীনের নীতির প্রতি সমর্থন আর একদিকে মণি সিংহ, খোকা রায় প্রমুখের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠরা...।

অজয় রায় : চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বটাকে দেখি পার্টির ভেতরে যুক্তফ্রন্টে থাকা কি থাকা-না—এই রকম যে তীব্র বিভাজনটা সৃষ্টি হলো, এটারই ধারাবাহিকতা হিসেবে। দুর্ভাগ্যবশত, মোহাম্মদ তোয়াহা-আবদুল হকরা বলতে থাকলেন, আশু সমাজতন্ত্র হয়ে যাবে। বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ষাটের দশকের শেষে এসেও স্লোগান তোলে, 'তোমার বাড়ি আমার বাড়ি; নকশালবাড়ি, নকশালবাড়ি।'

মতিউর রহমান : '৫০-এ মারুফ হোসেন-স্বদেশ বোস হয়ে হক-তোয়াহার চীনপন্থী বিপ্লবী লাইন সৃষ্টি হলো। যার ফল মূলত চীনপন্থার উত্থান—সিপিবিতে বিভক্তি, ছাত্র ইউনিয়নে বিভক্তি, ন্যাপের মধ্যে বিভক্তি, কৃষক সমিতিতে বিভক্তি এবং সব মিলিয়ে একটা গুরুতর ক্ষতের সৃষ্টি। যাঁরা এই উগ্র এবং অতি বাম ছিলেন, তাঁরা ভাসানীর সঙ্গে মিলেমিশে গেলেন। এই ধারাটি পাকিস্তানি সমর্থকদের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল। তাঁরা ভাসানীর কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকলেন সচেতনভাবে, নাকি অসচেতনভাবে? এটা নিয়ে আপনার কোনো ধারণা আছে?

অজয় রায় : ১৯৫৮ সালে যখন আইয়ুবের মার্শাল ল হলো, এর পরের বছর সারফুদ্দিন চৌধুরী (মোয়াজ্জেম চৌধুরীর পরিবারের সদস্য) একজন প্রধান ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলেন। পার্টির সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল। সারফুদ্দিন চৌধুরীদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে। তিনি দিল্লিতে গেলেন। নেহরুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। তা কেন? কারণটা হচ্ছে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে আলোচনা করা। সেখানে নেহরুর সঙ্গে দেখা হলো না। একসময় সিলেটে নেহরু জনসভা করেছেন। এই সারফুদ্দিন চৌধুরীর মা খোদেজা খাতুন চৌধুরী ছিলেন কংগ্রেসের নেত্রী। তাঁদের বাড়িতে ছিলেন নেহরু। সেই সূত্রেই একটা যোগাযোগ ছিল। নেহরু বার্তা পাঠালেন, তোমাদের যদি কিছু করতে হয়, কলকাতায় যাও। সেখানে গিয়ে বিধানচন্দ্র

রায়ের সঙ্গে দেখা করো। পরে নেহরুর সঙ্গেও দেখা হলো তাঁদের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নেতা কে? তাঁরা তো আর কাউকে নেতা বানিয়ে নিয়ে যাননি। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি বলেন, আমাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি তখন বলেন, যদি মাওলানা ভাসানীকে যুক্ত করতে পারো, তাহলে আমরা সাহায্য করতে পারি। এটা একটা বিশেষ ঘটনা। এখানে এলেন তাঁরা। মাওলানা ভাসানীকে তখন ধানমন্ডিতে কোনো এক বাড়িতে আটকে রেখেছে আইয়ুব সরকার। ওটা একধরনের কারাগার ছিল। তার মধ্যেও গিয়ে সেখানে দেখা করলেন। মাওলানা ভাসানী বললেন, দেখো বাবা, আমি পারব না। আমার সঙ্গে আইয়ুবের বোঝাপড়া হয়ে গেছে। আমি চীনে যাব। তোমাদের যদি এ ব্যাপারে কিছু করতে হয়, তাহলে মুজিবের সঙ্গে দেখা করো। শেখ মুজিব তখন কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। সারফুদ্দিন চৌধুরী তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। শেখ মুজিব অনেক কথাই বলেন। তবে শুধু মনে আছে এটুকুই, 'আমি দেশ ত্যাগ করতে পারব না। আমি দালাই লামা হতে পারব না।'

মতিউর রহমান : এটা কি '৬২ সালে?
অজয় রায় : না, আরেকটু আগে। মণি সিংহ ও খোকা রায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে। সেটা হতে পারে ১৯৬০ বা ১৯৬১ সালে। তবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের এটুকু পরিপক্কতা ছিল, এ খবর জানার পরও মাওলানাকে একেবারে অচ্ছুত করে দেয়নি তারা। যদিও পরে ন্যাপ ভাঙল। আর তেমন কিছু থাকল না।

মতিউর রহমান : ১৯৫০ থেকে শুরু করে চীন-রাশিয়ার ভিত্তিতে ভাঙন পর্যন্ত কিংবা তোয়াহা-হকদের একাত্ম হওয়া, আরও পরে যদি দেখি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি—ওদের তো ধারাবাহিক আদর্শগত পতন শুধু নয়, পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতার নীতি ওদের মধ্যে থেকে গেল বিপ্লবের নামে...। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। স্বাধীন হওয়ার পরও বাংলাদেশকে তাঁরা মানতে পারলেন না। তোয়াহা-মতিনের দলের নাম থাকল পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি আর সত্তরের দশকের শেষ পর্যন্ত আবদুল হকের দল হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি। আপনি এটাকে কীভাবে দেখেন?
অজয় রায় : সম্পূর্ণ ঠিক ধরেছেন। তা না হলে আবদুল হক কী করে ভুট্টোর কাছে অস্ত্র চেয়ে, অর্থ চেয়ে চিঠি লেখেন?

মতিউর রহমান : অতি বাম কমিউনিস্টদের ধারাটাকে আপনি কীভাবে দেখেন? তাঁরা লড়াই করেছেন, জেল খেটেছেন, আত্মগোপনে ছিলেন, খাপড়া ওয়ার্ডে গোলাগুলির মধ্যে পড়েছেন। উগ্র রাজনীতি থেকে এই যে রাজনৈতিক সুবিধাবাদী

চরিত্রে পরিণত হওয়া বা এই যে পতন—এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? সুযোগ-সুবিধা বা অর্থ কি এখানে খুব বড় ভূমিকা পালন করেছে?
অজয় রায় : অর্থের চেয়েও জাতীয় পরিচয় আর জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

মতিউর রহমান : কিন্তু তাঁদের যদি বাম ধারার চিন্তাচেতনা থেকে থাকে, তবে জাতীয় পরিচয়ের সংকট থাকবে কেন?
অজয় রায় : সেই সময়ের অবস্থায় বাম ধারা মানেই হচ্ছে, আমরা যারা কমিউনিস্ট তারা প্রো-ইন্ডিয়া। আর ওরা হচ্ছে ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে।

মতিউর রহমান : পরে দেখা গেল, যাঁরা চীনপন্থী ছিলেন, তাঁদের অনেকে বিএনপিতে যোগ দেন। আবার কেউ কেউ জাতীয় পার্টিতে চলে যান। আর আমরা যারা মস্কোপন্থী, তারা ভারত ও সোভিয়েতের সঙ্গে সব সময় বন্ধুত্বের ওপর জোর দিয়েছি।
অজয় রায় : আমরা হয় আওয়ামী লীগ হয়েছি, না হয় অন্য কিছু হয়েছি, বিএনপি হইনি।

মতিউর রহমান : তাহলে তো এখানে একটা আদর্শগত দিকও বিবেচনায় নিতে হবে। এই যে মণি সিংহ, খোকা রায়, নেপাল নাগ বা অনিল মুখার্জি—তাঁরা তো সোভিয়েতপন্থী হওয়ার পাশাপাশি ভারতপন্থী হয়ে থাকলেন, নাকি? এর কারণ কী? অতীত সম্পর্ক, নাকি অন্য কোনো কারণে এই ভারতপ্রীতিটা ছিল? আর সে কারণেই কি আদর্শগতভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনার সঙ্গে মিলে যায় আমাদের অবস্থান?
অজয় রায় : আমি আমার নিজেরটা দিয়ে বুঝি, যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমরা উঠে এসেছি—সর্বভারতীয় একটা অবস্থান থেকে, রাজনীতি-সংস্কৃতি-অর্থনীতির দিক থেকে। এরা সবাই কিন্তু তা-ই। এর কিন্তু প্রভাব থাকেই। আরেকটা বিষয় নিয়ে আমাকে মোয়াজ্জেম চৌধুরী বলেছিলেন। পার্টিশন হওয়ার আগে, কলকাতা থেকে চলে আসার আগে—দেশভাগের ঘোষণা হয়ে গেছে। সব ঠিকঠাক। সবার জিনিসপত্র পাঠানো হচ্ছে, সেই সময়ে পার্ক সার্কাসে একটা মিটিং হয়েছিল। দ্যাট ওয়াজ অর্গানাইজড বাই শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে 'ল্যাংড়া আনোয়ার' ছিলেন, গ্রিন অ্যান্ড হোয়াইটের নূরুদ্দিন ছিল, আমাদের শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন, আহমদুল কবীর ছিলেন, আমাদের পটুয়া কামরুল হাসান ছিলেন। এ রকম কথা এসেছিল, 'পাকিস্তান হয়ে গেছে। আমরা এখানে এসেছি, সবাই তো পূর্ব পাকিস্তানেই যাব। যে যে দলই করি, একটা বিষয় সম্পর্কে সবাইকে ঠিকঠাক

থাকা দরকার—হিন্দুদের সঙ্গে থাকা যাবে না।'

এই কথাটা আহমদুল কবীর সাহেবের সঙ্গে আমি যাচাই করেছি। এটা আসলে ঠিকই ছিল। পাকিস্তান তো একটা নয়। যদিও লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান শব্দটাও ছিল না, তবুও দুটো স্টেটের কথা বলা হয়েছিল জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

মতিউর রহমান : পঞ্চাশ-ষাটে সিপিবির নেতৃত্বকে আপনি কীভাবে দেখলেন—মণি সিংহ, খোকা রায়, অনিল মুখার্জি, জ্ঞান চক্রবর্তী প্রমুখ। তাঁদের আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন? তখন বা এখন—অতীত মিলিয়ে যদি বলেন...।

অজয় রায় : আমি মনে করি, তাঁরা যদি এখানে না থাকতেন, তাঁরা ওপারে থাকলে পরবর্তী সময়ে এমএলএ বা এমপিও হয়ে যেতে পারতেন। আরও ওপরে উঠে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা এখানে থাকলেন—এমনকি পঞ্চাশের দাঙ্গার পরও—আত্মগোপনে গেলেন, অনেক কষ্টের মধ্যে থাকলেন, তবু তাঁরা গেলেন না। এটা নিঃসন্দেহে এখানকার কাজের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি দরদ থেকেই। দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন প্রগতিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে।

মতিউর রহমান : এটা আদর্শগত দিক থেকে বললেন। কিন্তু রাজনৈতিক ভূমিকার কথা যদি জিজ্ঞেস করি?

অজয় রায় : রাজনৈতিক ভূমিকা তো তাঁরাই নিয়েছেন। ভুল নিলেও তাঁরাই, সঠিক নিলেও তাঁরাই নিয়েছেন। আবু হোসেন সরকারের সময় একটা জনসভাও করেছিলেন তাঁরা পল্টনে। পুলিশই অনুমতি দিয়েছিল। এরপর খোকাদা একটা প্রেস কনফারেন্সও করেছিলেন, আমরা কী চাই পাকিস্তানে? *ইত্তেফাক*-এর ফাইল ঘাঁটলে পেতে পারেন—এটা ১৯৫৫ সালের ঘটনা। আমরা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরি করতে সচেষ্ট ছিলাম।

মতিউর রহমান : মাসটা মনে আছে?

অজয় রায় : মাসটা বছরের শেষের দিকে হবে। তখন খোকাদা, আমরা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক বিকাশ চাই ইত্যাদি কথা বলেছিলেন। পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা কারা? উই আর সেলফ স্টাইল কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট পার্টির নাম তো তখন প্রকাশ্যে বলতে পারেননি।

মতিউর রহমান : তাহলে পার্টির প্রকাশ্য দল যেটা হয়েছিল, সেটা ১৯৫৬ সালের আগে? আলী আকসাদ বা খাপড়া ওয়ার্ডে গুলিতে পা-হারানো নূরুন্নবী, বগুড়ার আবদুল মতিন, মির্জা আবদুস সামাদ প্রমুখ ছিলেন এই টিমটাতে?

অজয় রায় : এটা হয়েছিল চুয়ান্ন সালে। এর বাইরে নূরুন্নবী (খাপড়া ওয়ার্ডের নূরুন্নবী নন, সাংবাদিক) ও কে জি মুস্তাফাও ছিলেন।

মতিউর রহমান : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে এখন কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

অজয় রায় : আমি মূল্যায়ন করি এভাবে, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, আগে থেকে যদি আরও প্রস্তুতি থাকত, তবে কমিউনিস্ট ও সমগোত্রীয় আন্দোলনগুলো আরও বেশি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হতো। কারণ, স্বাধীনতা আন্দোলনটা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম কি না, অনেক সময় পর্যন্ত তা নিয়ে আমাদের মধ্যে দোদুল্যমানতা ছিল। সমগ্র পাকিস্তান একটা ফেডারেল কাঠামোর মধ্যে থাকবে, যদি ফেডারেল কাঠামো অসম্ভব হয়ে ওঠে, তাহলে সেটা স্বাধীনতাসংগ্রামে পর্যবসিত হবে—এ রকম একটা অবস্থান ছিল।

মতিউর রহমান : পঁচিশে মার্চের পরেও এমন চিন্তা ছিল কি?

অজয় রায় : না। এই চিন্তা অনেক আগে থেকে ছিল।

মতিউর রহমান : পঁচিশে মার্চের পর কী হলো?

অজয় রায় : আপনার কি মনে আছে, ময়মনসিংহ জেলা কমিটির একটা বৈঠক হয়েছিল? কোনো একজন অবাঙালি সহানুভূতিশীল ব্যবসায়ীর বাসায়—জায়গাটা ছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কাছাকাছি। তখন অনিল মুখার্জি, খোকা রায়, বারীণ দত্ত—এঁরা দেশে ছিলেন না। বড় ভাই (মণি সিংহ) জেল থেকে বেরিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন। আন্ডারগ্রাউন্ড অবস্থা থেকেই বড় ভাই সেই মিটিংয়ে এসেছিলেন।

মতিউর রহমান : ১৯৬৯ সালের মে দিবসে মণি সিংহ কমিউনিস্ট ছাত্র-সংগঠকদের এক বৈঠকে বলেছিলেন, সোভিয়েত বিপ্লবের আগে, ১৯০৫ সালের বিপ্লব যেমন অক্টোবর বিপ্লবের 'ড্রেস রিহার্সেল' ছিল, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান তেমনই ছিল।

অজয় রায় : তারও ছয়-সাত মাস পর সেই ময়মনসিংহ জেলা কমিটিরই আরেকটি সভা হয়। খোকা রায় সেখানে যান। তিনি সেখানে গিয়ে এটাকে কনটেস্ট করেন। সুতরাং দোদুল্যমানতা ছিল বলেই যদি এটাকে 'ড্রেস রিহার্সেল' হিসেবে ধরা হতো, তাহলে সে রকম কর্তব্য সামনে চলে আসে। আর যদি এটা মনে হয় যে, ট্রাইং টু হ্যাভ আ ফেডারেশন, তাও যদি হতো, তবুও শেষ পর্যন্ত আমরা মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা সম্পর্কে আগাম কিছুটা আঁচ করতে পারতাম।

মতিউর রহমান : কিন্তু একাত্তরের মার্চ মাসে অনিল মুখার্জি মস্কোতে ছিলেন। পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের পর তিনি সেখান থেকে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন, যেটা *নিউ এজ*-এ ছাপা হয়েছিল। সেটাও স্বাধীনতার পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান ছিল না।

অজয় রায় : পরবর্তীকালে এই ঘটনা নিয়ে কথা হয়েছে। আমি তো আগরতলা গিয়েছি পরে, আগস্ট মাসে। তার আগে দেশেই ছিলাম। সেখানে গিয়ে যা জানতে পেরেছিলাম, তার একটা হলো অনিল মুখার্জি বাংলাদেশে গণগত্যার ভয়ংকর ঘটনাগুলো সম্পর্কে জানতেন না। অন্যটা হলো স্বাধীনতার প্রতি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাটাও শুরুর দিকে স্পষ্ট ও ইতিবাচক ছিল না। তবে দ্রুতই তারা পাকিস্তানের গণহত্যার নিন্দা করে।

মতিউর রহমান : সব দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে। এই নয় মাসে পার্টির ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন? কতটুকু করতে পারল, কতটুকু সুযোগ ছিল তাদের জন্য। তখনো পার্টি ছোট। সদস্যসংখ্যাও বেশি না। সাধারণ ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে কিছু প্রভাব ছিল। তারা দলে দলে আগরতলা, কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয়ের সীমান্ত দিয়ে গেল। তারা চেষ্টা করল নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে। এমনকি সিপিবি-ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে চেষ্টা করল একটা কমান্ড দাঁড় করানোর।

অজয় রায় : হ্যাঁ, তারপর পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে একটা প্রস্তাব নেওয়া হয় আগরতলায় বসেই। তারপরই সিপিবি চেষ্টা করেছে, মুক্তিযুদ্ধটা যাতে এক দলের যুদ্ধ না হয়। সেটা করতে গিয়ে নানাভাবে নিজেদের ভূমিকাটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। এই অবস্থানটা তখনই ফলপ্রসূ হয়েছে, যখন সিপিআইয়ের সহযোগিতায় ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আমাদের নেতাদের সরাসরি বৈঠক হয়।

মতিউর রহমান : আমরা জানি, মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে সিপিবির নেতৃত্বে মণি সিংহ, আবদুস সালাম ও মোহাম্মদ ফরহাদ দিল্লিতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন।

অজয় রায় : ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা হয় দিল্লিতেই। সেখানে তাঁরা ইন্দিরার কাছে প্রস্তাব করেন, আলাদা প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যাপারে। সেই সময়ে সিপিআইয়ের চাপও ছিল। এমনকি শুধু সিপিআইয়ের প্রভাব নয়, ইন্দিরা গান্ধীর একাধিক উপদেষ্টা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা। তাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর ওপর একটা প্রভাব সৃষ্টি করে বলে আমি শুনেছি। শেষ পর্যন্ত তিনি সেটা মেনে নেন। একদিকে ছিলেন ভূপেশ গুপ্তসহ সিপিআইয়ের নেতারা। আরেক দিকে ছিলেন এঁরা। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাটা সব সময়

সপক্ষে ছিল, তা নয়। সেই সময় কেরালাতে সিপিআইয়ের একটা কংগ্রেস হয়; সেই কংগ্রেসে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতৃত্বও সেখানে আমন্ত্রিত ছিল—মণি সিংহ, খোকা রায় ও বারীণ দত্ত। সেখানে সোভিয়েত থেকে পার্টির উচ্চপদস্থ এক নেতা এসেছিলেন। আর তিনি এসেছিলেন মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে ভারতের ভূমিকা এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আরও জানতে। এরপর থেকে সোভিয়েত অবস্থানও বদল হতে শুরু করে।

মতিউর রহমান : আমরা দেখি, সিপিবি-ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়ন একটা যৌথ কমান্ড হলো এবং তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিল। এর বাইরেও কমিউনিস্ট পার্টি বা ন্যাপ নানাভাবে তাদের নানা কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সক্রিয় ছিল।

অজয় রায় : হ্যাঁ, সক্রিয় ছিল। সিপিবি-সিপিআইয়ের ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রভাবিত করা এবং বিশ্ব শান্তি আন্দোলন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জোগানোর ক্ষেত্রে সিপিআইয়ের বড় ভূমিকা ছিল। এটা ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এখানে একটা তথ্য বলি, বিশ্ব সংস্থাগুলোতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ডাঙ্গে ছিলেন ভারতীয় বড় নেতা। পঁচিশে মার্চের আগে আগে ডব্লিউএফটিওর একটা কনফারেন্স বা কনভেনশন হয়। সেখানে ডাঙ্গে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। একই সঙ্গে রমেশ চন্দ্র বিশ্ব শান্তি পরিষদের ভেতরে-বাইরে এবং ইউরোপে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। তাই বলা যায় সিপিআই ও তার পুরো নেতৃত্বের—ভূপেশ গুপ্ত, এন কে কৃষ্ণাণ, রমেশ চন্দ্রসহ অন্যদের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল।

মতিউর রহমান : তাঁরা ওই সময় ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সফর করেছিলেন। তাঁদের চিন্তা ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সমর্থন আদায় ও একসঙ্গে নেওয়ার...

অজয় রায় : হ্যাঁ, আর সিপিআইয়ের সহযোগিতার জন্যই তো প্রথম বাংলাদেশের যে প্রতিনিধিদল বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি পরিষদের সম্মেলনে গেলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা আবদুস সামাদ আজাদ, ন্যাপের নেতা দেওয়ান মাহমুদ আলী ও কমিউনিস্ট পার্টির ডা. সারওয়ার আলী।

মতিউর রহমান : স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সিপিবির সম্পর্ক ও ভূমিকাকে এখনকার বিবেচনায় আপনি কীভাবে দেখেন? বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সিপিবির ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি, সমর্থনের বা সহযোগিতার নীতিকে এখন কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

অজয় রায় : একটা কথা স্পষ্টভাবে বলি, মুক্তিযুদ্ধ তো হলো। অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীনও হলো। কিন্তু স্বাধীনতার পরও বিষয়টা আসলে কী হয়েছে, কী এর প্রভাব, সে সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট কোনো বোধ বা সামগ্রিক কোনো ধারণা ছিল না। মনে পড়ে, স্বাধীনতার পরপরই আবুল মনসুর আহমদ দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি সেখানে বলেছিলেন, স্বাধীনতাটা হলো লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন। দ্যাট ওয়াজ অলসো অ্যান্ড অ্যাসেন্স অব দ্য টোটাল স্ট্রাগল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ষাটের শুরুতে অনুষ্ঠিত এক গোপন বৈঠকে। ওই বৈঠকে মানিক মিয়ার সঙ্গে মণি সিংহ, খোকাদারাও ছিলেন। সেখানে স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের নেতারা সম্মত হননি। তখন বঙ্গবন্ধু বললেন, মানলাম কথা। তবে আই ডোন্ট অ্যাগ্রি উইথ ইউ।

মতিউর রহমান : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের ভূমিকা, সরকারের অবস্থান, তার সঙ্গে সিপিবির ভূমিকাকে কীভাবে দেখেন?
অজয় রায় : আমার ধারণা, সিপিবি ওই সময় তার কর্তব্যটাই ঠিক করতে পারেনি। আমি যদি মনে করি, এটা ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্ট—দ্যাট ওয়াজ মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তাহলে এক বিষয়। আর যদি মনে করি, আবুল মনসুর আহমদের বক্তব্যের মতো, তাহলে তো আরেক বিষয়। সুতরাং এভাবে নিজেদের ভূমিকাকে স্পষ্ট করা যায়নি।

মতিউর রহমান : তাহলে কি আপনি বলতে চাইছেন, ওই সময় সিপিবির নিজস্ব চিন্তাধারা বা ভূমিকা বা ভূমিকা কী হওয়া উচিত—মুক্তিযুদ্ধের পুরো একটা মূল্যায়ন বা পর্যালোচনা, মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে করণীয় এগুলোর প্রতি সামগ্রিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করতে পারেনি? ফলে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক, ঐক্য বা সহযোগিতার যে নীতি গ্রহণ করেছে, বিশেষ করে তত্ত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তাতে পার্টি সংকটে পড়েছিল?
অজয় রায় : সবচেয়ে বড় কথা হলো সিপিবির গঠন-কাঠামো। এর কি কোনো প্রয়োজন ছিল, সিপিবির এভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে একটা শ্রমিক শ্রেণির দল হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার? এর চেয়ে ভিন্ন পরিচয়ে, ভিন্ন নামে একটা থার্ড ফোর্স বা সেকেন্ড ফোর্স হিসেবে থাকলে হতো। কিন্তু ওই ভূমিকার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অন্তত মোজাফ্ফর আহমদের ন্যাপের মতো থাকলেও ভালো হতো (যদিও তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে নানা প্রশ্ন ছিল)।

মতিউর রহমান : সেই পুরোনো প্রশ্নটি তুললেন, যেটা পঞ্চাশের দশকে আপনার মধ্যে ছিল, প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে কাজ করবে, নাকি অন্য কোনো

প্রগতিশীল দলের ভেতরে থেকে কাজ করবে?
অজয় রায় : ঠিক সেটাই। আমি সেটাই বলতে চেয়েছি। কিন্তু আপনি তো একবার কমিউনিস্ট পার্টির দরজা খুলে দিয়েছেন, আবার তো সেটা বন্ধ করা যায় না।

মতিউর রহমান : কিন্তু '৭৩-এ আপনি তো সম্পাদকমণ্ডলীতে গেলেন, তখন কি বিতর্কটা ছিল?
অজয় রায় : না, তখন বিতর্কটা হয়নি।

মতিউর রহমান : তখন তো দল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টিকে বড় করা, সক্রিয় করা, উদ্যোগী করা এবং সিপিবি-ন্যাপ আওয়ামী লীগ যৌথভাবে দেশকে অগ্রসর করে নেওয়া প্রভৃতি ভাবনা ছিল।
অজয় রায় : একটা বিষয় আমাদের চিন্তার মধ্যেই ছিল না। শুধু আমরা কেন, সোভিয়েত পার্টির সঙ্গে আমাদের যতটুকু আলোচনা হয়েছে, তাদের চিন্তার মধ্যেও ছিল না। সেটা হলো এই যে স্বাধীনতাটা হলো এবং মুজিবের শাসন পর্যন্ত অগ্রসর হলো। এটা যে আবার পিছিয়ে যেতে পারে, এ রকম কোনো ধারণা আমাদের মধ্যেও ছিল না, আবার সোভিয়েত পার্টির মধ্যেও ছিল না।

মতিউর রহমান : তাহলে আপনি বলতে চাইছেন, বাহাত্তর-পঁচাত্তর সময়পর্বে সিপিবির ভূমিকাটা স্পষ্ট ছিল না বা বাস্তবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল না বা আমরা সম্যক ধারণা নিতে পারিনি যে, আমাদের করণীয়টা কী?
অজয় রায় : আমরা সে সময়ের নানা দেশের অভিজ্ঞতা ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন নীতির ওপর নির্ভর করেছি। কিন্তু নিজের দেশের সামগ্রিক অবস্থাকে পর্যালোচনা করে বাস্তব ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। স্বাধীনতাকে মূল্যায়ন করা কিংবা দেশে এত বড় ঘটনাটা ঘটল, সেটার কতটুকু কী প্রভাব, তার পর্যালোচনা করা দরকার ছিল।

মতিউর রহমান : তাহলে পুরো সময়ের কার্যক্রমকে কি আপনি নাকচ করে দিচ্ছেন?
অজয় রায় : নাকচ করে দিচ্ছি না। তবে নানা সময়ে অনেক বিষয়ের মধ্যে কোনো-না-কোনো ইতিবাচক দিক তো আছেই। কিন্তু 'যে ভূমিকা পালন করিতে পারিতাম...,' সেটা আমরা করতে পারিনি।

মতিউর রহমান : নাকি যে ভূমিকাটা পালনের চেষ্টা করা হয়েছে, সেটা বেশি ছিল অথবা সম্ভব ছিল না?

অজয় রায় : আমার মতে, এ জন্য আমি এখানকার যাঁরা, শুধু তাঁদেরই দায়ী করি না; বরং যাঁরা পীঠস্থান—সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, তাদের চিন্তা, প্রভাব, পরামর্শ ইত্যাদি আমাদের এমন ধারায় কাজের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেছে, ভূমিকা রেখেছে।

মতিউর রহমান : তার মানে সত্যিকার অর্থে নিজের দেশের অবস্থা, মানুষের চিন্তাজগতের অবস্থা, এখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি—এগুলো বিবেচনা করে সঠিক ও স্বাধীন রাজনৈতিক পথে সিপিবি অগ্রসর হতে পারেনি।
অজয় রায় : আমি এ কথাটিই বলতে চাচ্ছি। আমাদের করণীয় যা ছিল, আমরা তা করতে পারিনি।

মতিউর রহমান : যদি তা-ই হয়, তাহলে একটা কথা বিবেচনায় নিতে হবে যে, স্বাধীনতার পরপর ডাকসু, চাকসু, রাকসু নির্বাচনে সবখানে ছাত্র ইউনিয়ন জিতে গেল। তখন তরুণদের মধ্যে একটা উন্নত চিন্তা, সমাজ পরিবর্তন—এই চেতনা তাদের মধ্যে জোরালোভাবে ছিল, যেটা ধরে আমরা অগ্রসর হতে পারলাম না। যেটাকে জাসদ আবার একটা 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' নামে চরম হঠকারী বিভ্রান্তিমূলক উত্তেজনার রাজনীতির দিকে নিয়ে গেল। এটা কি তাহলে একটা কারণ যে, মানুষের চিন্তাচেতনা অনুযায়ী সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে এগোতে পারিনি আমরা?
অজয় রায় : মানুষ বলতে তো শুধু তরুণ-ছাত্রসমাজ নয়। মানুষ বলতে তো সব বয়সী মানুষকেই বোঝায়—কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত সবই। বাইবেলে একটা কথা আছে, সম্ভবত 'অরিজিন অব সিন'। সেভাবে দেখলে কমিউনিস্ট মুভমেন্টের অবদান তো বিশ্বে কম নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে দেখলে বিশ্বে বিভিন্ন দেশে-অঞ্চলে যথেষ্ট অবদান আছে। কিন্তু তারপরও বলব, সেই 'অরিজিনাল সিন'টির দায়দায়িত্বটা কে নেবে?

মতিউর রহমান : আপনি কি আমাদের সব ব্যর্থতার জন্য সোভিয়েত-বন্ধুদের দায়ী করছেন?
অজয় রায় : প্রকারান্তরে কিন্তু তা-ই। আজকে বিশ্বে মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, সবচেয়ে বড় বিপদ তো এটাই। এসবের পেছনে তাদের ব্যর্থতাও কাজ করেছে। সেটা কী করে হলো?

মতিউর রহমান : তাহলে যে সেই সময় ভাবতাম, অধনবাদী পথে সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীনতার পথে বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়া—সেই তাত্ত্বিক ভাবনাগুলোও সঠিক ছিল না?

অজয় রায় : তখনকার বাস্তবতায় নিশ্চয়ই না।

মতিউর রহমান : বাকশাল গঠিত হওয়ার পর আমরা তাতে সমর্থন দিলাম, তাতে যোগও দিলাম। তাতে কি কোনো ভিন্নমত ছিল?
অজয় রায় : যোগ দেওয়াতে ভিন্নমত ছিল না। তবে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল না। এর একটা কারণ হলো 'ফেইট আকমপ্লি' অর্থাৎ বাধ্য হলাম। আরেকটা হলো, না হলে ভালো হতো, কিন্তু হলো।

মতিউর রহমান : না হলে ভালো, কিন্তু হলো—হলে আমরা থাকব, সোভিয়েত পরামর্শটা এ রকমই ছিল?
অজয় রায় : এ রকমই ছিল। আমি সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলাম। অনেক আলোচনা হয়েছে। তবে পার্টির মধ্যে একমাত্র বড়ভাই এবং খোকাদা, বিশেষ করে বড়ভাই এর বিরুদ্ধে ছিলেন।

মতিউর রহমান : কিন্তু বঙ্গবন্ধু একক দল করে ফেললে আর তো উপায় নেই, ব্যাপারটি কি এ রকম?
অজয় রায় : হ্যাঁ, তিনি করে ফেললে তখন আর কী করব, আর উপায় নেই। আমরা যারা কমিউনিস্ট পার্টির, তারা যোগ দেব।

মতিউর রহমান : কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে কি আমরা বলতে পেরেছিলাম, আমরা চাই ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট, এক দল না হলে ভালো হয়?
অজয় রায় : বলেছি আমরা; খুব বেশি বলেছি, তা নয়। তবে এই কথাটা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বলতে পারবে পঙ্কজ ভট্টাচার্য। কারণ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে হওয়া ওই মিটিংগুলোতে ন্যাপের মোজাফ্ফর আহমদ আর পঙ্কজ ভট্টাচার্য থাকতেন। যখন ত্রিদলীয় জোট হলো, তখন এদিক থেকে মণি সিংহ-ফরহাদ থাকতেন আর ওদিক থেকে মোজাফ্ফর আহমদ-পঙ্কজ ভট্টাচার্য থাকতেন।

মতিউর রহমান : তাহলে বাকশালে যোগদান করা, পার্টিকে বিলুপ্ত করা (যদিও আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল, ছোট করে হলেও একটা সাংগঠনিক কাঠামো টিকিয়ে রাখা, যেটা বস্তুত কিছু ছিল না), এটাকে কি আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন, নাকি আমাদের ভুল হয়েছিল?
অজয় রায় : আমি মনে করি, বাকশালে যোগ দেওয়া আমাদের উচিত হয়নি। কারণ, তার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, বাস্তবতা ছিল না। এটা যে জনতার মতের বিরুদ্ধে, তা আমাদের বোঝা উচিত ছিল। এটা সিপিবি নেতৃত্বও বোঝেনি তখন। দুটি ঘটনার কথা বলি। এক. লাস্ট মিটিং অব শেখ মুজিব; সেটি সোহ্‌রাওয়ার্দী

উদ্যানে হয়েছিল। একসঙ্গে কোরআন, বাইবেল, গীতা, ত্রিপিটক পড়া হয়েছিল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখান থেকে লোকজন হাত নেড়ে নিষেধ করেছে। তারা চাইছে না এগুলো একসঙ্গে এখানে পড়া হোক। দুই. শেখ মুজিব তখন থাকতেন নিজের বাড়িতে—গণভবনে নয়। আমি এক দিন হেঁটে হেঁটে সংসদ ভবনের পাশ দিয়ে কেন যেন যাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখি শেখ মুজিব গাড়িতে করে আসছেন। আমরা সরে দাঁড়ালাম। তিনি হাত নেড়ে নেড়ে যাচ্ছেন। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখানে আরও পাঁচ-সাতজন ছিলেন। তাদের মধ্যে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

মতিউর রহমান : আমরা উৎসাহের সঙ্গে অনেক কিছু করলাম, অনেক উদ্যোগ নিলাম। ওই সময়ে বেগম সুফিয়া কামাল, কবীর চৌধুরী, শামসুর রাহমান—তাঁরা কেউ কিন্তু বাকশালকে গ্রহণ করেননি, বাকশালের সদস্য হননি।
অজয় রায় : অথচ রণেশদা ইতস্তত করতে করতে পার্টির সিদ্ধান্তের জন্য সদস্য হয়েছেন।

মতিউর রহমান : তাহলে আপনার মূল্যায়ন এখন, বাকশালের ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না?
অজয় রায় : না, এটা কোনো সঠিক কাজ ছিল না।

মতিউর রহমান : ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে আমাদের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমি ওই সময় রোমানিয়া হয়ে বুলগেরিয়ায় গিয়েছিলাম। বুলগেরিয়ান পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দুজন নেতার সঙ্গে লম্বা আলোচনা হয়েছিল। যখন অনিলদা তাঁদের বললেন, আমরা বাকশালে যোগ দিচ্ছি, তখন তাঁরা একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। বললেন, তোমরা কি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিএসইউ) সঙ্গে কথা বলেছ? অনিলদা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তাদের মত কী? তারা হ্যাঁ বলেছে। তখন তারা একদলীয় শাসনব্যবস্থার অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে আলজেরিয়া, ইরাক, সিরিয়ার অভিজ্ঞতার কথা বললেন। তাঁরা বললেন, এসব দেশে অধনবাদী পথ বা একদলীয় ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা তো ভালো নয়। তাতে বোঝা গেল, তাঁদের চিন্তা বা ধ্যানধারণা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির চেয়েও অনেক এগিয়ে ছিল।
অজয় রায় : ঠিক বলেছেন। তবে সমস্যা তো শুধু আমাদের মাথায় নয়। সমস্যা মস্কোর নেতৃত্বের মধ্যে ছিল।

মতিউর রহমান : আচ্ছা, আসলে সিপিআইয়ের সুস্পষ্ট মত কী ছিল?
অজয় রায় : সিপিআইয়ের মত ছিল বাকশালের মধ্যে না যাওয়া।

মতিউর রহমান : কিন্তু অনিলদা বুলগেরীয় নেতৃত্বকে বলেন, সিপিআইয়ের মত আছে। তবে সোভিয়েত পার্টির অবস্থান ছিল শর্তযুক্ত, যদি না পারো, তাহলে যোগ দিয়ো।
অজয় রায় : আর সিপিআইয়ের অবস্থান ছিল, যোগদান করে ফেললাম তো করে ফেললাম। আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আমি যত দূর জানি, যোগদানের আগে তাদের অবস্থান ছিল বাকশালে না যাওয়া। এগুলোর কোনো দলিল বা কাগজ নেই।

মতিউর রহমান : এখন যদি আমরা বলি, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশে সর্বত্র ভয়ভীতিকর অবস্থা বিরাজমান ছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থান চলে। কিন্তু সেখানে দেখা গেল, সিপিবি-ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার দাবি ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া, জনমত গঠন করা, লিফলেট বিলি করা, দেশে-বিদেশে প্রচার করা, বিদেশের তথ্য দেশে এনে প্রচার করা, জমায়েত ও মিছিল করলাম। এটাকে আপনি কীভাবে দেখেন?
অজয় রায় : এটাকে আমি সার্বিকভাবে ইতিবাচকভাবে দেখি। এখান থেকে এসে আবার মৌলিক জায়গায় ফিরে যাওয়া...। প্রথম কথা বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলা হলো—এমন ষড়যন্ত্র তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। এই ধরনের ঘটনা ঘটছিল নানা দেশে। কিন্তু তাঁকে হত্যা করার পরে মানুষের মধ্যে যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা, তা তো হলো না। বরং অনেক ক্ষেত্রে অভ্যুত্থানের পক্ষে সমর্থনের ইঙ্গিতই দেখা গেল। এই ধরনের ঘটনাও ঘটতে পারে, এর কোনো মূল্যায়ন আমরা করতে পারিনি। সেটা যদি করতে পারতাম, তাহলে কোথা থেকে আবার শুরু করতে হবে, সেটাও বুঝতে পারতাম।

মতিউর রহমান : আচ্ছা, বাকশাল হলো, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলো, আমরা প্রতিবাদ জানালাম, বিচার চাইলাম, আবার গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করলাম, মানুষকে জাগ্রত করারও চেষ্টা করলাম। কিন্তু জিয়া ক্ষমতায় এলে তাঁর প্রসঙ্গে একটা বিতর্ক আমাদের মধ্যে দেখা দিল। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ পাস করল, জিয়াউর রহমানের খালকাটা কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া এবং তাঁকে 'হ্যাঁ' ভোট দেওয়া। এ সম্পর্কে আপনার এখনকার মতামত কী?
অজয় রায় : এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সম্পাদকমণ্ডলীর মিটিংয়ে সবচেয়ে বেশি বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন আপনি। আর আপনার সঙ্গে মণি সিংহ ছিলেন।

মতিউর রহমান : তখনো কি সোভিয়েত পার্টি বা জিডিআর পার্টির অভিমত এমন ছিল—পার্টিকে রক্ষা করতে হবে, টিকে থাকতে হবে। সুতরাং সরকারকে সহযোগিতা করো?

অজয় রায় : এটা কিছুটা ছিল। এর চেয়ে বড় বিপদ ছিল বিমানবাহিনীর প্রধান তোয়াবের অবস্থান। পরে বিদেশে চলে গেলেন। এদিকটাও বিবেচনা করা হলো।

মতিউর রহমান : তার মানে জিয়ার প্রতি সিপিবি বা সোভিয়েত পার্টি কিছুটা ইতিবাচক ছিল—চরম দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে অবস্থানের কারণে। কিন্তু আমরা যখন হ্যাঁ ভোট দিলাম, তত দিনে তো তোয়াব বিতাড়িত।

অজয় রায় : কিন্তু জিয়া যা করল, সমাজ ও রাষ্ট্রকেও পেছনের দিকে নিয়ে গেল, সেটাও মূল্যায়ন না করে আমরা জিয়ার হ্যাঁ ভোটে সমর্থন দিলাম। 'খাল' কাটতে গেলাম।

মতিউর রহমান : এমনকি আমরা সংসদে ন্যাপ ও অন্যদের প্রভাবিত করলাম যে, তোমরা 'হ্যাঁ'র পক্ষে ভোটটা দাও। তাতে কৌশলটা কি এ রকম ছিল যে, পার্টিটা সংকটে আছে, পার্টিকে রক্ষা করতে হবে, কর্মীদের জেলজুলুম থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে? কারণ ফরহাদকে গ্রেপ্তার করল, মণি সিংহকে গ্রেপ্তার করল ইত্যাদি।

অজয় রায় : যতটুকু রক্ষা করা যায়, সেই কৌশলই ছিল। কারণটা ছিল এ রকম : বিপদের সময় 'সবকিছুই ত্যাগ করো, বিপদ থেকে রক্ষা করো'।

মতিউর রহমান : আপনার মতে, জিয়াকে পুরোপুরি আমরা বুঝতে পারিনি। তাঁকে সহযোগিতা করা, হ্যাঁ ভোট দেওয়া—এগুলো বামপন্থী হিসেবে ঠিক ছিল না। আবার ধরুন, জিয়া হত্যা হয়ে গেল, এরশাদ ক্ষমতায় এল—এই সময়টায় সিপিবির ভূমিকাটা কেমন দেখেন?

অজয় রায় : বরং এই সময়টায় একটু ভালো ছিল। চেষ্টা করেছে সবাইকে নিয়ে সবার সঙ্গে মিলে কাজ করার। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা। সেখানে সিপিবি-আওয়ামী লীগ-ন্যাপসহ অন্যান্য বাম দলকে নিয়ে এক থাকাটাও ইতিবাচক ছিল। এ ছাড়া কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন ও ছাত্রদের জাগ্রত করার মতো কিছু এ সময় হয়েছে।

মতিউর রহমান : একটা প্রশ্ন, ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে আমরা পাঁচ-ছয়টা আসনে জিতলাম—আমরা জিতলাম, ন্যাপেরও কয়েকজন জয়ী হলো। এটা নিয়ে কোনো সরকারের সঙ্গে সমঝোতা ছিল কি? ইউসুফের মতো প্রার্থী, শহিদুল্লাহর মতো প্রার্থী বিজয়ী হলেন।

অজয় রায় : আমি এটা জানি না। তবে আমার একটা সন্দেহ আছে যে, এটা নিয়ে হয়তো প্রশাসনের সঙ্গে কোনো সমঝোতা ছিল।

মতিউর রহমান : এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সিপিবির একটা ইতিবাচক ভূমিকা ছিল। কিন্তু ১৯৮৭ সালের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তন, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর পরিবর্তন হলো, তার প্রভাব সিপিবিতে এসে পড়ল এবং পার্টি ভাঙতে শুরু করল, আমাদের ভেতর বিভ্রান্তি বাড়তে থাকল। ফলে আমাদের পার্টি দ্বিখণ্ডিত হলো প্রথমে, পরে আরও খণ্ডিত হতে থাকলে। একপর্যায়ে পার্টির অনেকে আওয়ামী লীগ, গণফোরামে যোগ দিতে থাকল। এ সময়কাল সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?

অজয় রায় : এ সময়ের কথা আমি নিজেকে দিয়েই শুরু করি। আমি খুব স্পষ্ট ছিলাম না। থাকলে হয়তো আরেকটু জোরেশোরে ভূমিকা রাখতে পারতাম। সিপিবির যে অংশ অতি বাম পন্থার চিন্তার দিকে চলে গেল, তারা এখনো সেই নীতি দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত। আজকের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে আপনাকে খেয়াল করতে হবে, বিশ্বটা যদি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ভার্সেস ওয়ান পার্সেন্ট হয়, তবে তো নাইনটি নাইন পার্সেন্টকে অ্যাকোমডেট করতে হবে, নাকি?

মতিউর রহমান : কিন্তু তখনো সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙেনি, নাইনটি ওয়ানে ভাঙল। এর আগে বার্লিন দেয়ালের পতন হয়ে গেল। আমরা সরে এসেছি। তখন সিপিবির এই অস্থিরতা, এই বিভ্রান্তি, এই বিভক্তি, এটা নিয়ে কিছু বলুন।

অজয় রায় : সিপিবির একেকজন একেক রকম করে বুঝেছেন। আসলে কেউই ঠিকমতো ব্যাপারটি বোঝেননি। সবাই পুরো বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলেন। গভীরভাবে না বুঝে আমরা তর্ক-বিতর্ক করেছি।

মতিউর রহমান : আপনি বলতে চাইছেন, এই সংকটের গভীরতাটা, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের গভীরতা, সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায় মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা—এ থেকে সৃষ্ট ক্ষোভ-বিক্ষোভ যে হলো; এক দিকে কমিউনিস্ট, আরেক দিকে ন্যাশনালিস্ট, আবার সমাজে ধর্মের ব্যাপক প্রভাব—এসব থেকে আমরা আমাদের নিজেদের করণীয়টা বুঝতে পারিনি। সেই কারণে স্বাভাবিকভাবেই আমরা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলাম।

অজয় রায় : হ্যাঁ। সারা দুনিয়াতেই প্রায় তা-ই হয়ে গেল।

মতিউর রহমান : কিন্তু কিছু দেশে পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার একটা চেষ্টা এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নতুন করে দাঁড় করানোর

চেষ্টা কিছুটা লক্ষ করা যায়। এই সম্ভাবনা কি আমাদের এখানে ছিল? নাকি অতীতে ভুলভ্রান্তির কারণে আর কিছু করার ছিল না?
অজয় রায় : পরিবর্তন যে হলো, তা তো বাস্তব। আমি চাই বা না চাই পরিবর্তন হয়েছে। এটা আমার চাওয়া-না-চাওয়ার প্রশ্ন না। এই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এই রাজনৈতিক প্রভাব সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে হয়েছে। আসলে এই সংকটের ব্যাপকতা আমরা বুঝতে পারিনি। এসব নিয়ে আমাদের এখানে কোনো আলোচনাই হয়নি। আর আলোচনা না করে তো এগুলো করা যায় না।

মতিউর রহমান : এটা আলোচনা করার দক্ষতা-যোগ্যতা-সামর্থ্য আমাদের কতটুকু ছিল?
অজয় রায় : এখনো সেটা নাই। কিন্তু আমি যে বুঝি না, সেটা যদি বুঝি, তাহলে অন্যজন যে বোঝেন, তাঁর কাছে তো আমি যেতে পারি। পশ্চিমবঙ্গে একটা বিষয় ভালো হচ্ছে, কংগ্রেসের সঙ্গে বামদের একটা সমঝোতা হচ্ছে। কিন্তু বাচ্চাদের যেমন হাম হয়, ওদের এখনো সেই অবস্থা। অথচ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তো বাচ্চা নেই। তারা এখনো কংগ্রেসকে কোনো দিন বুঝতেই পারল না। এই কংগ্রেস নামক দলটির মধ্যে তো অনেক কিছুই আছে।

মতিউর রহমান : আমরাই কি আওয়ামী লীগকে বুঝতে পারলাম?
অজয় রায় : পারিনি।

মতিউর রহমান : এখন আপনি আওয়ামী লীগের মধ্যে কী দেখেন? স্বৈরতন্ত্রের পতনের পর তো বাংলাদেশের ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। স্বৈরতন্ত্রের পতনের পর আমরা খুব উৎসাহী ছিলাম, গণতন্ত্র ফিরে এল—ভাবনাটা ছিল, এই দুই দলের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রটা যদি ঠিকমতো চলে মন্দ কী? কিন্তু আজকে কী দেখি?
অজয় রায় : আমরা দেখি, অ্যাগেইন গো ব্যাক টু আবুল মনসুর আহমদ। অর্থাৎ সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত।

মতিউর রহমান : তার মানে আপনি দেখেন, ধর্মের প্রভাব বেড়েছে? যা থেকে জঙ্গিবাদসহ আরও কিছু সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। একই সঙ্গে এ রকম কিছু কি দেখেন, স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবও বেড়েছে? অগণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা-চিন্তাধারা বেড়েছে। তাহলে গত আড়াই দশকে কি এটাই পাওয়া?
অজয় রায় : না, কিছুই পাওয়া হলো না। এই না পাওয়া, এর পেছনে আমরাও

দায়ী। কারণ আমরা যদি একটা গণতান্ত্রিক ধারায় অপজিশন বা যেখানে থাকি, রাজনীতিটা গণতান্ত্রিক রাখতে পারতাম, তাহলে আওয়ামী লীগের ওপর কিঞ্চিৎ হলেও একটা প্রভাব পড়তে পারত। আওয়ামী লীগের মধ্যে তো এখন নানান চিন্তার লোক আছে। এর মধ্যে বর্তমান সময়ে শঙ্কা বা সংকটটা বোঝে, এমন লোকও আছে। সুতরাং আমরা আজ যদি আওয়ামী লীগকে দোষ দিই—হ্যাঁ, যেহেতু তারা ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি করে, তারা এখন ক্ষমতায়, তাই দায়িত্ব তাদের সবচেয়ে বেশি। কিন্তু আমাদেরও একটা ভূমিকা আছে বলে দাবি করি; সেটি যদি বুঝে থাকি, তাহলে সেই অনুসারে সুযোগ বা সম্ভাবনা কতটুকু ছিল, সেটা বাস্তবায়নের জন্য আমরা কি কোনো চেষ্টা করেছি?

মতিউর রহমান : আপনি তো আবার পঞ্চাশের দশকে ফিরে গেলেন। বাংলাদেশে পশ্চাৎপদ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, সামন্তবাদ তখনো বিরাজমান, পুঁজিবাদ তখনো দাঁড়ায়নি—এমন অবস্থায় সিপিবির নামে দল না করে আমাদের কি উচিত ছিল ন্যাপের মতো গণতান্ত্রিক দল করা?
অজয় রায় : ও রকমই কিছু একটা করার দরকার ছিল।

মতিউর রহমান : সেটাই আবার সামনে নিয়ে আসা হলো ১৯৭৭-এ। মোহাম্মদ ফরহাদ ওই প্রস্তাব করেন নূরুল ইসলাম নাহিদের নামে। আর মঞ্জু বোধ হয় পাল্টা একটা প্রস্তাব করলেন মণি সিংহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। কিন্তু মস্কো বলল, না, ঠিক আছে সিপিবি নামেই থাকতে হবে। আপনার অবস্থান কী ছিল? বাংলাদেশের সামনে অগ্রসর হওয়ার পথ ছিল কি?
অজয় রায় : আমি এটা বুঝি, গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতা—মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, উপকার করার মানসিকতা ইত্যাদি বিষয় তো থাকবেই। বিশ্বব্যাপী যদি বলেন, মানুষের উপকার স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে ভালো করেছে। সেটার ভিত্তিতে সেটা সম্ভব হতে পারে কিন্তু তাতে নেতৃত্ব কে দেবে?

মতিউর রহমান : আপনি যে আশার পটভূমি তৈরি করলেন, এখানকার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা—সামাজিক শক্তিগুলোর অবস্থা, নেতাদের অবস্থা দেখে সেই আশাবাদের কোনো ভিত্তি দেখা যাচ্ছে না।
অজয় রায় : আমিও এর কোনো ভিত্তি দেখি না।

মতিউর রহমান : তারা পারেনি বা পারল না, সেটা ঠিক। এ জন্য একটা অপূর্ণতা আছে। কিন্তু বামপন্থীরাও দেশে দেশে নিজেদের সমাজটাকে দেশটাকে বোঝেননি, জানেননি, চেনেননি। সেই কারণে নিজেদের জন্য নতুন পথের সন্ধান

করতে পারেননি।
অজয় রায় : ঠিক সেটাই।

মতিউর রহমান : অথচ আমাদের মতো সব দেশের পার্টিই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সব নীতি মেনে চলতে চেয়েছে। কিন্তু তা করে একে একে ভেঙে পড়েছে।
অজয় রায় : হয়তো সোভিয়েতরাই এটা চায়নি। ক্রুডলি বললে এটাই আসে।

মতিউর রহমান : এখন তো দিনে দিনে শুধু অধোগতিই দেখি। অর্থনৈতিক, চিকিৎসা, আয়ুর অগ্রগতি ও উন্নয়ন এগুলো ঠিক আছে। বইয়ের অবস্থা দেখেছেন? পঞ্চাশ-ষাটের দশকে যা হয়েছিল, সেগুলোই আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত।
অজয় রায় : যতটুকু মৌলিক চিন্তা ছিল, সব সেই সময়ের। এখন তো কিছুই নেই।

মতিউর রহমান : আপনাকে ধন্যবাদ।
অজয় রায় : আপনাকেও ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ৮ জানুয়ারি ২০১৫ ও ৬ মার্চ ২০১৬

সংস্কৃতি অধ্যয়ন

বিশ শতকের প্রথমার্ধে দক্ষিণ এশিয়ায় চলচ্চিত্রের দেশীয়করণ : আন্তর্দেশীয় থেকে স্বদেশীয় জনপরিসর

জাকির হোসেন রাজু

সারসংক্ষেপ

চলচ্চিত্র সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী মাধ্যম। পশ্চিমা আবিষ্কার হলেও, খুব দ্রুতই চলচ্চিত্র দক্ষিণ এশীয় জনপরিসরে জায়গা করে নেয়। বিনোদনের মাধ্যম ছাড়াও জাতীয় পরিচয় ও মনস্তত্ত্ব তৈরি এবং দেশীয় জনপরিসরে পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল চলচ্চিত্র। ভিনদেশি সংস্কৃতির একটি মাধ্যম কীভাবে দেশীয় অন্যান্য বিনোদন মাধ্যমের সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং গণমানুষের রুচি এবং রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষায় পরিবর্তন সাধন করেছিল তা অনুধাবন জরুরি। বিশ শতকের প্রথমার্ধে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে, উৎপাদন থেকে গ্রহণ পর্যায়ে, চলচ্চিত্র কীভাবে এ দেশের হয়ে উঠেছে, তা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে এখানে 'বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে যুগপৎ বিনিময় এবং বিরোধ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে বিশ শতকের প্রথম ছয় দশকে পূর্ব বাংলায় চলচ্চিত্র মাধ্যমের সাংস্কৃতিক গ্রহণ প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য বিবিধ কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত জনপরিসরের ভিত্তিতে দেখা যেতে পারে; যেখানে সব সময়ই জাতিসত্তা ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : চলচ্চিত্র, জনপরিসর, দেশীয়করণ, দক্ষিণ এশিয়া, সংস্কৃতি, জাতিসত্তা।

গত এক দশক বা তার কাছাকাছি সময়ে গবেষণার ক্ষেত্রে বলিউড বা ভারতীয় হিন্দি চলচ্চিত্র একটি জনপ্রিয় ধারায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিশ্বপরিসরে এখনো অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় চলচ্চিত্র—জাতীয় বা আঞ্চলিক, তেমন আলোচিত

নয়। পুরো দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র কীভাবে অধিকৃত হয়েছে, সে আলোচনাও সেভাবে হয়নি। এ অঞ্চলের চলচ্চিত্র অধ্যয়নের এ শূন্যস্থান পূরণের একটি প্রচেষ্টা হিসেবে নিবন্ধটির অবতারণা। চলচ্চিত্র আবিষ্কারের প্রাথমিক সময় থেকে মধ্য-বিশ শতকের বাংলাদেশে বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে, উৎপাদন থেকে গ্রহণ পর্যায়ে, চলচ্চিত্র কীভাবে এ দেশের হয়ে উঠেছে, তা-ই এখানে অনুসন্ধানের বিষয়। এ সময়টুকুতে বাংলাদেশ প্রথমে ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশাধীন পূর্ব বাংলা, ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তান। কীভাবে চলচ্চিত্রের মতো একটি আন্তদেশীয় (transnational) সাংস্কৃতিক আঙ্গিক এ অঞ্চলের সংস্কৃতিতে গৃহীত হলো? এ ক্ষেত্রে কী ঘটতে পারে যখন আগত মাধ্যম পশ্চিমের আর উপনিবেশ-উত্তর দক্ষিণ এশিয়া সেটির গ্রাহক?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য, সাংস্কৃতিক অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ায় কীভাবে চলচ্চিত্র মাধ্যমটি ১৯০০ থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত পূর্ব বাংলা/পাকিস্তানে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের একটি ক্ষেত্রে পরিণত হয়, তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে আমি 'বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে যুগপৎ বিনিময় এবং বিরোধ' হিসেবে নিয়েছি।[১] সুতরাং, আমার মতে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ছয় দশকে পূর্ব বাংলায় চলচ্চিত্র মাধ্যমের সাংস্কৃতিক গ্রহণ প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য বিবিধ কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত জনপরিসরের ভিত্তিতে দেখা যেতে পারে; যেখানে সব সময়ই জাতিসত্তা ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।

এই প্রবন্ধে জনপরিসর (Public sphere) ধারণাটি ব্যবহার করে বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের দেশীয়করণ প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান করা হবে। যেসব ঘটনা ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় চলচ্চিত্রের স্থানীয়করণ ঘটেছে, আমি এখানে সেগুলোর পুনর্বিচার করেছি। কারণ এগুলো বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প কিন্তু সম্পর্কিত জনপরিসর নির্মাণ-প্রক্রিয়ার উদ্যোগ। কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসকেরা, ঔপনিবেশিক পূর্ব বাংলার অবাঙালি এবং বাঙালি মুসলমানরা নানা উপায়ে চলচ্চিত্রকে নিজেদের করে নিয়েছে, তা আমি ব্যাখ্যা করেছি। পরবর্তী সময়ে উপনিবেশ-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানে একই সঙ্গে শহুরে ও গ্রামীণ বাঙালি মুসলমানরা নিজেদের পছন্দসই পরিচিতি নির্মাণে চলচ্চিত্রের দেশীয়করণ ঘটিয়েছে, তাও আমার আলোচনায় উঠে এসেছে। বিভিন্ন জনপরিসরে চলচ্চিত্রের আত্তীকরণের এ রকম ঘটনাগুলো আমি চিহ্নিত করেছি। এই জনপরিসরগুলোর মধ্যে আন্তর্দেশীয় এবং ঔপনিবেশিক থেকে সাংস্কৃতিক-জাতীয়তাবাদী এবং গ্রামীণ-স্বদেশীয় জনপরিসরগুলো রয়েছে।

আমার ব্যবহৃত জনপরিসরের ধারণাটিতে জনপরিসরগুলো নিজের মধ্যে এবং পরস্পরের সঙ্গে সর্বদা রূপান্তর ও মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত। এই ধারণাগুলো ব্যবহার করে এখানে আমি এমন একটি ধারণাগত কাঠামো নির্মাণ করতে চেষ্টা করেছি, যার মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত গ্রামীণ, কৃষিজীবী পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানীয় গোষ্ঠী কীভাবে চলচ্চিত্রের দেশীয়করণ ঘটিয়েছে, তা অনুধাবনের সুযোগ হবে।

জনপরিসর, চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও বাংলাদেশের জাতীয়তা

এশীয় চলচ্চিত্র বিষয়ে প্রথম সারির পণ্ডিত বিমল দিসানায়েক বলছেন, ভারতীয় চলচ্চিত্র (পড়ুন বলিউড) নিয়ে সম্প্রতি যে গবেষণাগুলো বেরিয়েছে, তার অধিকাংশগুলোতে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে তাত্ত্বিকভাবে বুঝতে জনপরিসরের ধারণাটি ব্যবহৃত হয়নি।[২] দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য জাতীয় ও আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের জন্যও এটি সত্য। তাই এ নিবন্ধ যেটি জনপরিসরের ধারণাকে ব্যবহার করে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রাথমিক পর্যায়গুলোর একটি পুনঃপাঠ, দক্ষিণ এশীয় চলচ্চিত্র বোঝার ক্ষেত্রে একটি নতুন প্রচেষ্টা বলে গণ্য হতে পারে।

১৯৭০ থেকে জনপরিসরের ধারণাটি নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, উত্তরাধুনিক শিল্পকলা, জেন্ডার স্টাডিজ, কুইয়ার পলিটিকসের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে। য়ুর্গেন হাবারমাসের ১৯৬২ সালের গবেষণা দ্য স্ট্রাকচারাল ট্রান্সফরমেশন অব দ্য পাবলিক স্ফেয়ার প্রকাশের পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে পশ্চিমা শিক্ষায়তনে।[৩] হাবারমাস জনপরিসরকে বিবেচনা করেছেন সামাজিক জীবনের সেই ক্ষেত্র হিসেবে, যেখানে সাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময়ের মাধ্যমে জনমত গড়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে হাবারমাস চিহ্নিত করেছিলেন আঠারো শতকে পশ্চিম ইউরোপে জনপরিসরের উত্থানকে, যেখানে সামন্ততন্ত্র ও তার কার্যকৌশল স্থানান্তরিত হয়েছিল জাতিরাষ্ট্র, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও মুদ্রণপ্রযুক্তি দিয়ে।[৪] জনপরিসরকে দেখা হয়েছে 'যোগাযোগের সেই জগৎ হিসেবে, যা বিতর্কের একটি নতুন ক্ষেত্র, একটি অধিকতর উন্মুক্ত, সুগম এবং সামাজিক, শহুরে জনবলের একটি অবয়ব'।[৫] হাবারমাস জনপরিসরকে কল্পনা করেছেন এমন এক পরিসর হিসেবে, যেখানে জনসাধারণ তাঁদের সাধারণ সমস্যা নিয়ে 'কথা' বলে। এমন একটি পরিসর, যা রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে।[৬] যেমনটা হাবারমাস উল্লেখ করেছেন, 'জনপরিসরকে প্রতিষ্ঠান কিংবা সংগঠন হিসেবে

কল্পনা করা যাবে না। এমনকি এটা নিয়মনীতির ভিত্তিতে একটি কর্মকাঠামোও না, যার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মদক্ষতা, রীতি, সদস্যপদের নীতিমালা প্রভৃতি আছে...বরং এটা উন্মুক্ত, সুগম এবং পরিবর্তনশীল।'[৭]

যা-ই হোক, যদিও বুর্জোয়া বা পশ্চিমা মডেলের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশমান গণতন্ত্রে উদারনৈতিক জনপরিসরের ধারণাটি আদর্শ মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে এখানে জনগণ বলতে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কিছু মানুষকেই বোঝায়। বুর্জোয়া-উদারনৈতিক জনপরিসরের ধারণার মধ্যে এই বৈপরীত্যটি স্পষ্ট করে তুলে ধরেন আলেক্সান্ডার ক্লুগে ও অস্কার নেগ্‌ট তাঁদের *পাবলিক স্ফিয়ার অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স* (১৯৭২) গবেষণায়।[৮] তাঁদের মতে, জনপরিসরের ধারণা অনুযায়ী এটি কোনো একক পরিসরকে বোঝায় না। এটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে জনপরিসর ধারণাটি একটি সামষ্টিক ব্যাপার। জনপরিসর হলো অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সামাজিকসহ বিবিধ অসংহত গঠনের জনজীবনের একটি মিশ্রণ, যা আঞ্চলিক থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। হাবারমাসের বুর্জোয়া জনপরিসর তত্ত্বকে অস্বীকার ও সমালোচনা করে ক্লুগে ও নেগ্‌ট বুর্জোয়া, শিল্প-বাণিজ্যিক ও সর্বহারা জনপরিসরের সীমানা চিহ্নিত করেছেন। তবে তাঁরা বলেন, এগুলোর কোনোটিই আলাদা থাকতে পারে না। বরং এদের মধ্যে সমঝোতাপূর্ণ সহাবস্থান, অধিক্রমণ ও মৌলিক বৈপরীত্য একই সঙ্গে থাকে। এভাবে তাঁরা জনপরিসরের ধারণাকে নির্দিষ্ট জায়গা ও কার্যক্রম, যা একটি অবাধ যোগাযোগের ক্ষেত্র, তার চেয়ে অনেক বিস্তৃত করে দেখার সুযোগ করে দেন। তারা জনপরিসরকে অভিজ্ঞতার সামাজিক দিগন্ত হিসেবে দেখেন, যে পরিসর বস্তুগত, মানসিক ও সামাজিক 'পুনরুৎপাদন' ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।[৯]

হাবারমাসের জনপরিসর ধারণা ঘিরে এসব সমালোচনাকে মনে রেখে ও মিরিয়াম হানসেনের ভাষ্যমতে আমিও মনে করি জনসম্পৃক্ততার দিক থেকে চলচ্চিত্র নিয়ে ভাবলে সামগ্রিকভাবে ভাবলে নানা পর্যায়ের অনুসন্ধান ও পদ্ধতি মিলিয়ে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়। একদিকে চলচ্চিত্র মাধ্যমটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন, বিতরণ ও প্রদর্শনের নির্ভরতার কারণেই একটি জনপরিসরের ক্ষেত্র তৈরি করে। অন্যদিকে, 'চলচ্চিত্র জনজীবনের অন্য অধ্যায়গুলোকেও স্পর্শ করে, তার সাথে আদান-প্রদান করে।... দুদিক থেকেই প্রশ্ন ওঠে: কোন অভিজ্ঞতার ডিসকোর্সগুলো সামনে আসবে? কোনগুলো গোপন (private) থাকবে? কীভাবে এই ডিসকোর্সসমূহ সংগঠিত হবে, *কে, কার জন্য, কী উদ্দেশ্যে,* নির্দিষ্ট অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে, কীভাবে জনগণ সামষ্টিক ও আন্তর্ব্যক্তিক ক্ষেত্র হিসেবে গঠিত হয় এবং নিজেদের গঠন করে'।[১০]

জনপরিসরের এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে হেনসেনের মতো আমিও মনে করি, 'এটি একটি ডিসকার্সিভ বিন্যাস বা প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সামাজিক অভিজ্ঞতাগুলোর নির্মাণ, ব্যাখ্যা, সমঝোতা এবং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়; যার কাঠামো মূলত আন্তর্ব্যক্তিক, সামষ্টিক এবং একই সাথে বিরোধধর্মী।'[১১] জনপরিসরের দিক থেকে চলচ্চিত্রকে দেখতে গিয়ে আমি এর দুটি দিক মিলিয়ে দেখি: এর টেক্সট ও তার সার্বিক প্রেক্ষাপট (কনটেক্সট)।

জনপরিসরের ধারণাকে ভিত্তি ধরে বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের দেশীয়করণ প্রক্রিয়া অনুসন্ধানকল্পে প্রথমে খুব সংক্ষেপে বাংলাদেশের জাতীয়তার ইতিহাস অন্বেষণ করব। বাংলাদেশ স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র হিসেবে জন্মানোর প্রায় সাত দশক আগে (১৮৯৮) এখানে চলচ্চিত্র প্রথম প্রদর্শিত হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, বাংলাদেশ হচ্ছে সেই বিরল জাতিরাষ্ট্র, যা দু'দুবার উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়েছে। প্রথমে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে এটি পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়। তারপর ১৯৭১ সালে একটি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এ থেকে বোঝা যায়, জাতীয়তার বোধ এখানে এক জায়গায় সুনির্দিষ্ট ছিল না, পূর্ব বাংলায় এবং বাংলাদেশে এ ধারণা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।

চলচ্চিত্র ইতিহাসবেত্তাদের কাছে চলচ্চিত্রের দেশীয়করণ একটি সোজাসুজি ব্যাপার। জাতীয়তাবাদী জ্ঞানভাষ্যের মধ্যে তাঁরা চলচ্চিত্রের ইতিহাসের পাতা থেকে কিছু 'মহামানব'কে চিহ্নিত করেন, যাঁরা 'প্রথম' চলচ্চিত্র উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ছিলেন এবং যাঁরা বিশ শতকের শেষভাগ ও একুশ শতকের প্রথম ভাগের প্রভাবশালী জনপরিসরের সঙ্গে খাপ খান। তাঁদের জন্য, চলচ্চিত্র হলো তার আধেয় (text), তাঁদের ইতিহাস অন্বেষণে চলচ্চিত্র প্রদর্শন বা বিপণনের তেমন গুরুত্ব নেই। সুতরাং চলচ্চিত্রের দেশীয়করণকে তাঁরা চিহ্নিত করেন কীভাবে বাঙালি মুসলমান দর্শকের আসন থেকে নির্মাতা বা প্রযোজকের আসনে বসল এবং চলচ্চিত্রের আধেয় নির্মাণের দায়িত্ব নিল।[১২] যা-ই হোক, আমি চলচ্চিত্রকে বুঝে থাকি তার আধেয়, তার সাথে সংশ্লিষ্ট সমাজ-সংস্থা ও দর্শক সবটা মিলিয়ে এবং এগুলোর মিথস্ক্রিয়া ও প্রেক্ষাপটের সম্পর্কের নিরিখে। এ জন্য বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের দেশীয়করণ কীভাবে হলো তা নির্ণয় করতে আমি শুধু বহুল আলোচিত প্রথম চলচ্চিত্র উৎপাদনের দিকে নির্দেশ করি না, বরং চলচ্চিত্র আস্বাদন, বিতরণ ও প্রচারসংক্রান্ত আরও অনেক কম উল্লেখিত ঘটনার দিকেও নির্দেশ করি। বাংলাদেশে জাতীয়তার বোধকে নির্মাণাধীন ধরে, আমি ১৮৯৮ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে সংঘটিত চলচ্চিত্রবিষয়ক ঘটনাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করেছি। এসব ঘটনা এ

দেশে চলচ্চিত্রের দেশীয়করণে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হলেও সেগুলো আমাদের চলচ্চিত্র ইতিহাসে বেশি গুরুত্ব পায়নি। কারণ, এসব ঘটনাকে সমসাময়িক বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী জ্ঞানভাষ্য ও প্রভাবশালী জনপরিসরে সহজে খাপ খাওয়ানো যায় না। এ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রের ঘটনা রয়েছে, যেগুলো চলচ্চিত্রের দেশীয়করণের অমসৃণ পথকে চিহ্নিত করে, কিন্তু বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের পাতায় এগুলো কেবল অগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান পায়।

চলচ্চিত্র মাধ্যমকে বাংলাদেশে গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে গতানুগতিক ধারার দৃষ্টিভঙ্গি, যা হাবারমাসের জনপরিসরের ধারণার সঙ্গে একমত পোষণ করে, তার বিপরীতে আমি একটি বিকল্প সামাজিক-ঐতিহাসিক উপায়ে ব্যাপারটিকে দেখার চেষ্টা করব, যেটি চলচ্চিত্রের দেশীয়করণকে দেখে বিভিন্ন ছোট-বড় ঘটনার মধ্য দিয়ে, যেগুলো একটি প্রভাবশালী জনপরিসরের ধারণার সঙ্গে সহজে খাপ খায় না। আমার যুক্তি, যদিও চলচ্চিত্র বহুজাতিক মাধ্যম হিসেবে বিশ শতকের প্রথম দিকে পূর্ব বাংলায় প্রবেশ করে, কিন্তু পরে এটি বেড়ে উঠেছে বিভিন্ন বিকল্প এবং দেশীয় জনপরিসরে, যেমন এটি ঔপনিবেশিক-আধুনিকতাপন্থী, সাংস্কৃতিক-জাতীয়তাবাদী এবং গ্রামীণ জনপরিসরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের অগ্রযাত্রায় এসব জনপরিসরকে প্রথম দৃষ্টিতে যদিও মনে হতে পারে একরৈখিক, কালানুক্রমিক পর্যায়, কিন্তু এগুলো অবশ্যই ছিল একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এভাবে চলচ্চিত্রের আত্তীকরণের প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন জনপরিসরের ধারণাগুলো পূর্ব বাংলায় চলচ্চিত্র মাধ্যমের সাংস্কৃতিক অনুবাদের অমসৃণ প্রক্রিয়াকে অনুধাবনে আমাদের সহায়তা করে।

পূর্ব বাংলায় প্রথম বিদেশি চলচ্চিত্র পৌঁছানো : আন্তর্দেশীয় জনপরিসর হিসেবে চলচ্চিত্র

১৮৯৮ সালে ঢাকায় প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন একটি বহুজাতিক উদ্যোগ, যেহেতু এটি এশিয়ার অন্যান্য অংশেও ঘটেছিল। পূর্ব বাংলায় প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় উপমহাদেশে প্রথম প্রদর্শনের ২১ মাস পর। ১৮৯৬ সালের ৭ জুলাই বোম্বের ওয়াটসন হোটেলে বিখ্যাত লুমিয়ার ভ্রাতৃদয় প্রথম চলচ্চিত্র দেখান। আর ঢাকার প্রদর্শনীটি হয় ক্রাউন থিয়েটারে (এখন বিলুপ্ত), কলকাতাভিত্তিক ব্রেডফোর্ড সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানি ১৭ এপ্রিল ১৮৯৮ সেখানে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে।[১৩] প্রদর্শনীর মধ্যে ছিল *দ্য ডায়মন্ড জুবিলি প্রোসেশন অব কুইন ভিক্টোরিয়া*, *দ্য গ্রিক-টার্কিশ ওয়ার অব ১৮৯৭*, *প্রিন্সেস ডায়ানা'স জাম্প ইন দ্য ওয়াটার ফ্রম অ্যাবভ ৩০০ ফিট*, *করোনেশন সিরিমনি অব রাশান জার*, *অ্যাক্টিভিটিজ অব এ ম্যাড বারবার*, *স্ট্রম ইন দ্য সি*, *গেম বিটুইন এ লায়ন অ্যান্ড ইটস ওনার*, *ক্রাউড ইন দ্য স্ট্রিট অব ফ্রান্স*, *ফ্রেঞ্চ সোলজারস রাইডিং অন হর্সেস*, *রেইল প্যাসেঞ্জারস ইন ফ্রান্স* এবং *প্লে অন দ্য আইস অব ইংল্যান্ড*। তখনকার ঢাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ক্রাউন থিয়েটার বিখ্যাত ছিল কলকাতার সুপরিচিত নাটকগুলো ঢাকায় মঞ্চায়নের জন্য। প্রবেশমূল্য ছিল আধা রুপি (আট আনা) থেকে তিন রুপি। তখনকার দিনে এটি ছিল বেশ ব্যয়বহুল বিনোদন, সেই সময় একজন দিনমজুরের দৈনিক আয় ছিল আধা রুপি। উচ্চ প্রবেশমূল্য ও ইউরোপকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র আধেয় প্রমাণ দেয় যে একটি আন্তর্দেশীয় জনপরিসর হিসেবে চলচ্চিত্রের আগমন ঘটে মূলত ঢাকার ঔপনিবেশিক অভিজাতদের জন্য।

২৪ এপ্রিল ১৮৯৮ তারিখে তখনকার ঢাকার প্রধান সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ*-এ প্রদর্শনীর ওপর যে প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছিল তাতে অন্যান্য স্থানীয় বিনোদনের ওপরে চলচ্চিত্র মাধ্যমকে প্রশংসা করা হয় একটি আন্তর্দেশীয়-ঔপনিবেশিক আবিষ্কার হিসেবে: 'এই চমৎকার জাদু সত্যিকার অর্থে বিস্ময়কর... এই সিনেমাটোগ্রাফের আবিষ্কারক অবশ্যই খুব জ্ঞানী। এই যন্ত্রের ব্যবহারকারীকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমরা মনে করি, এই বিস্ময় দেখার জন্য অর্থ ব্যয় করা বোকামি হবে না। আমরা না বলে পারছি না যে জীবন্ত মানুষের করা নাটক বা সার্কাস দেখার চেয়ে এটা (দেখা) হাজার গুণে ভালো।'[১৪]

প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পর আমেরিকান, ইউরোপীয় ও ভারতীয় চলচ্চিত্র পূর্ব বাংলার বিভিন্ন থিয়েটারে প্রদর্শন শুরু হয়ে যায়, ১৯১০-এর দশক থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত যা চলতে থাকে। ১৯০০ এবং ১৯১০-এর দশকের চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শিত হয় বাণিজ্যিক থিয়েটারের জন্য নির্ধারিত মিলনায়তনে এবং মেলা প্রাঙ্গণে যেখানে জাদু ও সার্কাসের মতো অন্য আকর্ষণগুলোও ছিল। নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ঢাকায় শুরু হয় ১৯১৩-১৪ সালের দিকে, আরমানীটোলার একটি পাটের গুদামে। এটাই পরিণত হয় পিকচার হাউসে, যেটি পূর্ব বাংলার প্রথম প্রেক্ষাগৃহ। গ্রেটা গার্বো অভিনীত একটি চলচ্চিত্র দিয়ে প্রথম প্রদর্শনী শুরু হয়। ১৯২০ দশকের শেষের দিকে আরও তিনটি প্রেক্ষাগৃহ ঢাকায় স্থাপিত হয়। সেগুলো ছিল সিনেমা প্যালেস (১৯২৪), পরে নাম হয় রূপমহল, লায়ন সিনেমা (১৯২৭) ও মুকুল (১৯২৯)। ১৯২০-এর দশকে পূর্ব বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রামেও দুটি প্রেক্ষাগৃহ স্থাপিত হয়—সিনেমা প্যালেস ও রঙ্গম।[১৫] পরবর্তী দশকে তখনকার পূর্ব বাংলার আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রেক্ষাগৃহ স্থাপিত হয়। ১৯৩০-এর দশকের মধ্যে পূর্ব বাংলায়

চলচ্চিত্র অবসর বিনোদনের লাভের জনপ্রিয় মাধ্যমে পরিণত হয়, যা অনেকাংশে বাণিজ্যিক থিয়েটারের জায়গা নিয়ে নেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ওই সময় অনেকগুলো বাণিজ্যিক থিয়েটার সরাসরি প্রেক্ষাগৃহে রূপান্তরিত হয়।

১৯০০ থেকে ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় স্থানীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ ছিল খুবই স্বল্প পর্যায়ে। বেশির ভাগ চলচ্চিত্র ছিল আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারত থেকে আমদানিকৃত এবং সেগুলো পরিবেশিত হতো অবাঙালি, অমুসলিম এবং পূর্ব বাংলার নব্য শহুরে বাঙালি মুসলমানদের সামনে। অনুপম হায়াতের *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস* বইতে বলা আছে, *চার্লি চ্যাপলিনের দ্য কিড* (১৯২১) ও *মডার্ন টাইমস* (১৯৩৬), সিডনি ফ্রাঙ্কলিনের *দ্য গুড আর্থ* (১৯৩৭) এবং রবার্ট স্টিভেনসনের *কিং সলোমন'স মাইনস* (১৯৩৭)-এর মতো মার্কিন ও ব্রিটিশ চলচ্চিত্র ঢাকার প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হয়েছিল ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে। হায়াত ভারতীয় বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের একটি তালিকাও দেন, যেগুলো তখন পূর্ব বাংলায় দেখানো হয়েছিল: জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বিল্বমঙ্গল* (১৯১৯) ও *জয়দেব* (১৯২৬), প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের *দুর্গেশনন্দিনী* (১৯২৭), আর্দেশির ইরানির *বোম্বাই কা বিল্লি (ওয়াইল্ডক্যাট অব বোম্বে)* (১৯২৭), দেবকী বসুর *চণ্ডীদাস* (১৯৩২) ও *সোনার সংসার* (১৯৩৬), শিশিরকুমার ভাদুড়ীর *সীতা* (১৯৩৩), প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর *কপালকুণ্ডলা* (১৯৩৩) এবং নিতিন বসুর *ডাকু মনসুর* (১৯৩৪)।[১৬] বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় চিত্রশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মরণ করেন আলফ্রেড হিচককের *স্পেলবাউন্ড* (১৯৪৫) ও *ডায়াল এম ফর মার্ডার* (১৯৫৪), উইলিয়াম ওয়াইলারের *দ্য বেস্ট ইয়ারস অব আওয়ার লাইভস* (১৯৪৬) ও *রোমান হলিডে* (১৯৫৩), ভিনসেন্ট মেনেলির *লাস্ট ফর লাইফ* (১৯৫৬) এবং চার্লস ভিদরের *এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস* (১৯৫৭)-এর মতো সুপরিচিত ইংরেজি ও হলিউডের চলচ্চিত্রগুলো ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে ঢাকার প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হয়েছিল।[১৭]

বিশ শতকের প্রথম ভাগে পূর্ব বাংলায় প্রদর্শিত বিদেশি চলচ্চিত্র আস্বাদনের ও গ্রহণের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরির প্রক্রিয়া এখনো অসম্পূর্ণ। তবুও এ পর্যায়ে আমার প্রস্তাবনা, এ ধরনের বহুজাতিক চলচ্চিত্রের প্রদর্শন ও গ্রহণের কারণে এখানে একটি অবাঙালি অমুসলিম আন্তসাংস্কৃতিক (transcultural) জনপরিসর এখানে তৈরি হয়েছিল। এই জনপরিসর ঔপনিবেশিক-এলিট (ব্রিটিশ ও বাঙালি হিন্দু) এবং উপনিবেশবিরোধী উঠতি মধ্যবিত্ত (যারা মূলত নব্য শহুরে বাঙালি মুসলমান), দুই পক্ষকেই সন্তুষ্ট করেছিল। এভাবে বিশ শতকের প্রথম ভাগে পূর্ব বাংলার প্রেক্ষাগৃহগুলো প্রায় আক্ষরিক অর্থেই পরিণত

হয়েছিল 'বহু, বিচিত্র ও অসম ক্ষেত্রের মানুষের ডিসকার্সিভ (discursive) প্রতিযোগিতার জায়গায়'।[১৮]

পূর্ব বাংলায় প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ : ঔপনিবেশিক-আধুনিকতাবাদী জনপরিসর হিসেবে চলচ্চিত্র

বিশ শতকের প্রথম ভাগে পূর্ববঙ্গে যেমন চলচ্চিত্রের কল্যাণে একটি বহুজাতিক জনপরিসর তৈরি হয়েছিল, চলচ্চিত্রের দেশীয়করণও এখানে বিভিন্ন ধরনের হয়েছিল। এমন একটি বিশেষ ধরনকে বলা যেতে পারে ঔপনিবেশিক-আধুনিকতাবাদী জনপরিসর। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার অভিজাতদের প্রথম দিককার চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রচেষ্টাকে এই আধুনিকতাবাদী জনপরিসরের উত্থানের সঙ্গে বিবেচনা করা যেতে পারে। পূর্ব বাংলায় প্রথম দিককার চিত্রধারণ ও চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারাকে এমন একটি জনপরিসরের মধ্যে চিহ্নিত করা যায়। এসব প্রচেষ্টা অবশ্য তাঁরাই নিয়েছিলেন, যাঁরা ঔপনিবেশিক আধুনিকতার কাছাকাছি ছিলেন। যেমন হীরালাল সেন ছিলেন সুপরিচিত বাঙালি হিন্দু চিত্রগ্রাহক এবং ঢাকার নবাবেরা ছিলেন অবাঙালি সামন্ততান্ত্রিক পরিবার, যাঁদের বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে ঔপনিবেশিক রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

ঢাকার কাছে মানিকগঞ্জের বাগজুরি গ্রামের হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭) ছিলেন একজন বিখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী। তিনি ১৮৯৮ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে বাস্তব জীবনের দৃশ্যধারণ শুরু করেন কলকাতা ও ঢাকায়। তিনি ছিলেন হিন্দু জমিদার ও আইনজীবী চন্দ্র মোহন সেনের পুত্র। তাঁর দাদা গোকুল কৃষ্ণ সেন মুন্সি ছিলেন একজন সুপরিচিত আইনজীবী। উনিশ শতকের ঢাকায় তিনি ছিলেন অভিজাত সমাজের সদস্য। হীরালাল শিক্ষা নিয়েছিলেন তাঁর গ্রামে, ঢাকায় ও কলকাতায়। তরুণ অবস্থায় তিনি স্থিরচিত্র তোলা শুরু করেন। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে তিনি সর্বভারতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতাগুলোতে ৭টি পুরস্কার পান। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল ভারতীয় ও ব্রিটিশ আলোকচিত্রীরা। ১৮৯০ সালে তিনি নিজের একটি স্টুডিও 'এইচ. এল. অ্যান্ড ব্রাদারস' খুলেছিলেন। ১৯০০-১৯০১ সালের মধ্যে তিনি তখনকার বিখ্যাত নাট্যকার অমরেন্দ্র নাথ দত্তের সহায়তায় কলকাতার ক্ল্যাসিক থিয়েটারে বিভিন্ন নাটকের মঞ্চাভিনয়ের চিত্র ধারণ করেন। মঞ্চে তোলা এসব দৃশ্য—আলী বাবা, সরলা, বুদ্ধ, ভ্রমর ও সীতারাম—প্রথম ক্ল্যাসিক প্রদর্শিত হয় ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে। নাটকের দৃশ্যধারণ ছাড়াও হীরালাল কলকাতা, মানিকগঞ্জ, দিল্লির দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনার দৃশ্য ধারণ করেছিলেন। এগুলোর

মধ্যে ছিল দিল্লির দরবার হল (১৯০৩-এ ধারণকৃত); ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে একটি মিছিল; স্বদেশি আন্দোলনের একটি মিছিল; কলকাতার চিতপুর রোডের মানুষ ও যানবাহন; মানিকগঞ্জের বাগজুরি গ্রামের পুকুরে স্নানরত মানুষ এবং ১৯১১ সালে দিল্লিতে রাজা পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের দৃশ্য।[১৯]

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসবেত্তা আশীষ রাজাধ্যক্ষ ও পল উইলমেনের মন্তব্য, হীরালাল সেনের *ডান্সিং সিনস ফ্রম দ্য ফ্লাওয়ার অব পারসিয়া*, ১৮৯৮ সালের কলকাতার দৃশ্যগুলো হলো একজন ভারতীয়ের তোলা সবচেয়ে প্রথম চিত্রধারণের উদাহরণ। তাঁরা আরও বলেন, ১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হীরালালের রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন সংস্থা।[২০] তবে বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের জরিপভিত্তিক ইতিহাসবেত্তা অনুপম হায়াতের মতে, হীরালাল ৪ এপ্রিল ১৮৯৮-এ কলকাতায় কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর ভাই মতিলাল সেন, দেবকী লাল সেন ও ভাইপো ভোলানাথ গুপ্তের সঙ্গে। তাঁর মতে, হীরালাল প্রথম চলচ্চিত্র দৃশ্য ধারণ করেন পূর্ব বাংলার মানিকগঞ্জ মহকুমায়, ১৯০০-১৯০১ সালের দিকে। তিনি বিশ শতকের গোড়ার দিকে বটকৃষ্ণ পাল অ্যান্ড কোম্পানির তৈরি এডওয়ার্ডের ম্যালেরিয়ারোধী ওষুধ, সি কে সেন অ্যান্ড কোম্পানির জবা কুসুম তেল ও ডব্লিউ মেজর অ্যান্ড কোম্পানির সলসপিলার মতো আরও কিছু বিজ্ঞাপনী চলচ্চিত্র তৈরি করেন।[২১]

ভারতীয় বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম ইতিহাসবেত্তা কালীশ মুখোপাধ্যায় তখনকার সময়ের বহুল পঠিত পাক্ষিক *বঙ্গবাসী* (২১ আগস্ট ১৯০৩)-এ ছাপা প্রতিবেদন থেকে হীরালালের রয়্যাল বায়োস্কোপের অর্জনকে তুলে ধরেন: 'সত্যিকার অর্থেই রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি প্রশংসার দাবিদার। চমৎকার এবং সুপরিচিত ঘটনাগুলোর জীবন্ত এবং চলমান ছবি দেখানোর মাধ্যমে তারা ভারতীয় জনগণকে বিনোদন জুগিয়েছিল। তারা পশ্চিমা (পড়ুন ব্রিটিশ) চলচ্চিত্র দেখিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, নিজেরা অনেক অর্থ ব্যয় করে স্থানীয় ঘটনাগুলোর চলমান চিত্রও ধারণ করেছে।'[২২] তারপরে বাংলাদেশের আদি চলচ্চিত্রে হীরালাল সেনকে প্রথম চিত্রগ্রাহক, নির্মাতা ও প্রদর্শক হিসেবে কৃতিত্ব দেওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের জরিপভিত্তিক ইতিহাসের ধারা তাঁর প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেয়নি।[২৩] কারণ হীরালাল তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে একটি ঔপনিবেশিক-আধুনিকতাবাদী জনপরিসরকে রূপ দিতে সক্রিয় ছিলেন। বাংলাদেশ-পূর্ব সময়কার চলচ্চিত্র নিয়ে লেখা জরিপ ইতিহাসগুলো বিশ শতকের শেষের দিকের বাংলাদেশে লিখিত। সেখানে বাংলাদেশি/বাঙালি-মুসলমান জাতীয়তাবাদী জনপরিসরের দৃষ্টিতে হীরালালকে প্রথম চলচ্চিত্র

নির্মাতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়নি। হীরালালের ধারণকৃত নানা ঘটনার দৃশ্যগুলো, যেমন ব্রিটিশ শাসকের কলকাতায় পৌঁছানো এবং বিভিন্ন মঞ্চনাটকের খণ্ডাংশ, এগুলো তাঁর ঔপনিবেশিক-আধুনিকতাবাদী আনুগত্যের নিশ্চিত প্রমাণ। খবরের প্রতিবেদনে তাঁর অর্জনের সীমারেখাটি (ব্রিটিশ চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং খবরযোগ্য ঘটনাগুলো 'অনেক টাকা খরচ করে' ধারণ করা) তাঁকে আরও ঔপনিবেশিক-আধুনিকতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে। এ ধরনের ঔপনিবেশিক-আধুনিকতাবাদী চলচ্চিত্রের কাজ সমসাময়িক বাংলাদেশের বাঙালি-মুসলমান সাংস্কৃতিক আধুনিকতার কাঠামোর মধ্যে মূল্যায়িত হতে পারে না। হীরালালের অতীত পরিপ্রেক্ষিত (একটি বাঙালি-হিন্দু জমিদার পরিবার) তাঁকে ঔপনিবেশিক-আধুনিকতাবাদী নির্মাতা-প্রদর্শক হিসেবে যেমন সুবিধা দিয়েছিল, তেমনি একই সঙ্গে বাংলাদেশের বাঙালি-মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের প্রভাবশালী জাতীয় জনপরিসরে তিনি সহজেই বাদ পড়েছেন।

১৯০০-এর দশকে হীরালালের এক রিলের নির্বাক ছবিগুলোর পর ইতিহাসবেত্তারা ১৯২০-এর দশকে পূর্ব বাংলায় স্থানীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের আরও দৃষ্টান্ত পান। ঢাকার নবাব পরিবারের তরুণ সদস্যরা পূর্ব বাংলায় নির্বাক চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেছিলেন। নবাবরা ছিলেন নেতৃস্থানীয় মুসলমান সামন্ততান্ত্রিক জমিদার পরিবার, স্থানীয় রাজনীতির হর্তাকর্তা, সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সমর্থিত। ১৯২৮ সালে প্রথমে তাঁরা *সুকুমারী (দ্য গুড গার্ল)* নামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য নির্বাক চলচ্চিত্র নির্মাণ শেষ করেন। নবাব পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন খাজা আজমল, খাজা নসরুল্লাহ, খাজা আজাদ, খাজা আকিল, খাজা আকমল ও খাজা জহির। এসব নবাবের অধিকাংশের শরীরচর্চার শিক্ষক অম্বুজ গুপ্ত চলচ্চিত্রটি পরিচালনার ভূমিকায় ছিলেন। নসরুল্লাহ নায়কের ভূমিকায় ছিলেন এবং আবদুস সোবহান, আরেকজন তরুণ, চলচ্চিত্রের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সামাজিক ও ধর্মীয় নিষেধের কারণে পূর্ববঙ্গের কোনো নারীকে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য পাওয়া যায়নি।[২৪]

সুকুমারীর পর একই দল ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে কাহিনিচিত্র *দ্য লাস্ট কিস* নির্মাণের কাজ শুরু করে। দুজন বাংলাদেশি চলচ্চিত্র ইতিহাসবেত্তা, অনুপম হায়াত ও মির্জা তারেকুল কাদের, এই চলচ্চিত্র নির্মাণের বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস* এবং *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প* বইগুলোতে। *দ্য লাস্ট কিস*-এ আজমল নায়কের ভূমিকা নেন, যেখানে *সুকুমারীর* নায়ক নসরুল্লাহ খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৪ বছর বয়সী ললিতাকে আনা হয় ঢাকার কুখ্যাত যৌনপল্লি বাদামতলী থেকে, নায়িকা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। সেটি ছিল আজমলের স্ত্রীর চরিত্র। চলচ্চিত্রটি তিনটি

ভাষায় নির্মিত হয়—বাংলা, ইংরেজি ও উর্দুতে ইন্টারটাইটেলসহ। নির্বাক এই চলচ্চিত্রটি ১৯৩১ সালে ঢাকার মুকুল থিয়েটারে মুক্তি পায় এবং এক মাস বা তার কাছাকাছি সময় ধরে চলে। ভারতের নামকরা ইতিহাসবেত্তা রমেশ চন্দ্র মজুমদার—তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক—চলচ্চিত্রটির প্রিমিয়ার শো উদ্বোধন করছিলেন।[২৫]

১৯৮০-এর দশকের প্রথম দিকে হায়াত *দ্য লাস্ট কিস*-এর ব্যাপারে নবাব পরিবারের কয়েকজন সদস্যের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তাঁদের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে চলচ্চিত্রটির কাহিনি একাধিক দ্বন্দ্বকে চিত্রিত করেছে। এ দ্বন্দ্ব বিশ শতকের প্রথম দিককার ঔপনিবেশিক-আধুনিকতাবাদী অভিজাতদের বিভিন্ন ধারার নিজেদের মধ্যে, আবার একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক-আধুনিকতাবাদী ও গ্রাম্য, অনাধুনিক শক্তির মধ্যে। খাজা শাহেদ এটিকে বলেছিলেন দুই জমিদার পরিবারের দ্বন্দ্ব; বিচ্ছেদের সময় দুই পরিবারের দুই শিশু পরস্পরকে চুমু খায়, সে কারণে চলচ্চিত্রের নাম *দ্য লাস্ট কিস*। জহির বলেন, যখন জমিদার নায়ক (আজমল) তার স্ত্রীর (ললিতা) সঙ্গে যাত্রা দেখতে যাচ্ছিল, তখন খলনায়ক, আরেক জমিদার (নসরুল্লাহ) তার দলবল নিয়ে ললিতাকে অপহরণ করে। আজমল ললিতাকে নসরুল্লাহর শোবার ঘরে দেখতে পায় এবং দুই দলের মধ্যে তখন যুদ্ধ শুরু হয়। সবশেষে, আজমল ও ললিতা দুজনই মারা যায়। যা-ই হোক, শাহেদ ও জহির, দুজন গল্পকথকই নিশ্চিত করেন যে চলচ্চিত্রে একটি দৃশ্য ছিল যেখানে একটি পরিবারের শিশু শাহেদ ডাকাত-সর্দার শৈলেন রায়ের হাতে অপহৃত হয়।[২৬]

ঔপনিবেশিক-আধুনিকতাবাদী পূর্ব বাংলায় *দ্য লাস্ট কিস*-এর সামন্ততান্ত্রিক-রোমান্টিক গল্প এবং নির্মাণশিল্পীদের অবস্থা (নারী চরিত্র ললিতা ও চারুবালাসহ, যাঁরা চলচ্চিত্র নির্মাণ শেষে যৌনপল্লিতে ফেরত যান) চলচ্চিত্রটিকে একটি ঔপনিবেশিক-আধুনিকতাবাদী উদ্যোগে পরিণত করে। *সুকুমারী* ও *দ্য লাস্ট কিস*, উভয় ছবিই একটি আধুনিকতাবাদী অভিযানসুলভ নির্মাণ প্রচেষ্টার উদাহরণ। ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকের পূর্ব বাংলায় আজমলের পশ্চিমঘেঁষা আধুনিকতাবাদী 'অর্জন' (আজমল ছিলেন প্রথম পূর্ববঙ্গের বাঙালি, যিনি বিমানে চড়েছিলেন এবং মোটরগাড়ি কিনেছিলেন[২৭]) পরিষ্কার প্রমাণ করে যে তাঁর শক্তিশালী আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে পূর্ব বাংলার প্রথম দিককার কাহিনিচিত্র নির্মাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আমার যুক্তিতে হীরালাল বা নবাবেরা, সামন্ততান্ত্রিক বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক পরিবার থেকে আসা অমুসলিম কিংবা অবাঙালি যাঁরা ছিলেন ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত, তাঁরাই সে সময় চেয়েছিলেন পশ্চিমা আধুনিকতার

সর্বসাম্প্রতিক এই প্রযুক্তিগত জাদুকে ঘিরে অনুসন্ধান করতে ও সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে। ঔপনিবেশিক দক্ষিণ এশিয়ার আধা-গ্রামীণ প্রতিবেশের মধ্যে তাঁদের আধুনিকতাবাদী আগ্রহ স্থানীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। তাঁদের বিবেচনা করা যেতে পারে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক দাদাসাহেব ফালকের সঙ্গে, যিনি সচেতনভাবে 'নতুন অর্জিত চলচ্চিত্র কলাকে দেশীয়করণ করা ও স্থানীয় নান্দনিকতার বোধের সঙ্গে সেটাকে মেলাতে পারার' জন্য প্রশংসিত।[২৮]

প্রথম বাঙালি-মুসলমান 'টকি' : সাংস্কৃতিক-জাতীয়তাবাদী জনপরিসরে চলচ্চিত্র

বেশির ভাগ বাংলাদেশি ইতিহাসবেত্তা বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে আন্তর্দেশীয় চলচ্চিত্র দিয়ে স্থানীয় হলগুলো দখল হয়ে যাওয়ার ঘটনা কিংবা হীরালাল সেন এবং নবাবদের চলচ্চিত্র নির্মাণ-উদ্যোগগুলোকে অনেকাংশে এড়িয়ে যান। ১৯৪৭-পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে একটি বাঙালি-মুসলমান জনপরিসর তৈরি করতে সাহিত্য ও অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের মতো সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী মধ্যবিত্ত বাঙালি-মুসলমানের বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারটি তাঁরা বরং উপস্থাপন করেন। সে জন্য বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের প্রমিত ইতিহাসে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা (১৯৫৫ সালে পাকিস্তানে *মুখ ও মুখোশ*-এর নির্মাণ) সামনে চলে আসে এবং বারবার ব্যবহার হতে থাকে পূর্ব বাংলা, অর্থাৎ এখনকার বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের দেশীয়করণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে।[২৯]

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে বাঙালি-মুসলমান সাংস্কৃতিক-জাতীয়তাবাদী জনপরিসরের অংশ হিসেবে *মুখ ও মুখোশ*কে স্থাপনের দাবি বেশ সমর্থন পেয়েছে।[৩০] এসব ইতিহাসে (এবং আরও কিছু, যেগুলো তালিকাভুক্ত হয়নি) এই মাইলফলক ঘটনাকে বিস্তারিতভাবে, অনেক সময় ও শক্তি নিয়ে বর্ণনা করে বলা হয়, স্থানীয়ভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে আবদুল জব্বার খান (*মুখ ও মুখোশ*-এর নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার ও প্রযোজক) কী কী বাধার সম্মুখীন হন। এই চলচ্চিত্র দেখানো হয় উপনিবেশ-বিরোধী প্রতিবাদ হিসেবে। আবদুল জব্বার খান ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের পূর্ব পাকিস্তানের অবাঙালি চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী ফজল আলিদিনা দোসানির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন, ১৯৫৩ সালে ঢাকায় সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক সভায়। দোসানির মতে, 'পূর্ব বাংলার আবহাওয়া চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুপযোগী। আর টেকনিশিয়ান, যন্ত্রপাতি ও পেশাদার শিল্পীর অভাবের কথাতো বলাই বাহুল্য'।[৩১] এভাবে একটি সাংস্কৃতিক-জাতীয়তাবাদী ল্যান্স দিয়ে চলচ্চিত্র

ইতিহাসবেত্তারা *মুখ ও মুখোশ*কে পূর্ববঙ্গের একজন বাঙালি মুসলমান দ্বারা, বাঙালি মুসলমানের জন্য, বাঙালি মুসলমানের প্রথম চলচ্চিত্রিক প্রতিনিধি হিসেবে স্থাপন করেন। পূর্ব বাংলায় চলচ্চিত্র মাধ্যমের স্থান করে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে তাঁরা স্থাপন করেন একটি উপনিবেশ-বিরোধী, সাংস্কৃতিক-জাতীয়তাবাদী কাঠামোয়।

বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের প্রচলিত ইতিহাসগুলো *মুখ ও মুখোশ*কে পূর্ব বাংলায় চলচ্চিত্রের দেশীয়করণে প্রধান হিসেবে স্থান করে দেয়। চলচ্চিত্রটির এই গুণকীর্তনকে এই মাধ্যমের ভূমিকা একটি নির্দিষ্ট উপায়ে নির্ধারণের উপনিবেশবিরোধী মধ্যবিত্ত সমাজের বিশেষ অভিপ্রায়ের সঙ্গে যোগ করা যায়। পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজ চেয়েছিল চলচ্চিত্র মাধ্যমকে অন্যান্য শিল্প ও সংস্কৃতি মাধ্যমের মতো একটি সাংস্কৃতিক-জাতীয়তাবাদী জনপরিসর হিসেবে গড়ে তুলতে। এই জনপরিসর আছে, যা পূর্ব বাংলা এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে মূলত উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম এবং জাতিগঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংহত রূপ লাভ করেছে।

ঢাকা চলচ্চিত্রশিল্পের প্রথম জনপ্রিয় চলচ্চিত্র : গ্রামীণ-স্বদেশি জনপরিসর হিসেবে চলচ্চিত্র

১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে রূপান্তরের ঘটনাটি মধ্যবিত্ত বাঙালি-মুসলমানকে ১৯৪০-এর দশক ও ১৯৫০-এর শুরুর দিকের সময়টায় একটি জাতীয়তাবাদী ও সাংস্কৃতিক-আধুনিকতাবাদী চেতনা গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে। আধুনিকতার এ ধারণা লক্ষণীয় করে তুলতে *মুখ ও মুখোশ* মুক্তির এক বছর পর ১৯৫৭ সালে ঢাকায় নির্মিত হয় পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন স্টুডিও। এই স্টুডিও ঢাকায় দ্বিতীয় বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সূচনা (কলকাতার পর) করে, বাঙালি-মুসলমানের জন্য ও বাঙালি-মুসলমানের তৈরি সামাজিক-বাস্তবিক কাহিনিচিত্রের মাধ্যমে। যা-ই হোক, এসব চলচ্চিত্র বাণিজ্য ও দর্শক-উপস্থিতির দিক থেকে সফল হয়নি। অন্য কথায়, ১৯৫০-এর দশকের শেষ ও ১৯৬০-এর দশকের শুরুর দিকে তৈরি বাঙালি শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র পূর্ব বাংলার দর্শকদের আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। এঁরা বহুজাতিক চলচ্চিত্র ও বিনোদনমূলক চলচ্চিত্র দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। আলমগীর কবিরের ভাষায়, বোম্বে ও লাহোর থেকে হিন্দি ও উর্দু 'যৌন আবেদনময় উন্মত্ততা' আমদানি হয়েছিল এখানে।[৩২]

সামাজিক-বাস্তববাদী নির্মাতা ও সাংস্কৃতিক ভাষ্যকারদের মতো মধ্যবিত্ত বাঙালি-মুসলমানরা চেয়েছিলেন চলচ্চিত্র প্রভাবশালী জনপরিসরের অংশ হবে

বা সাংস্কৃতিক-জাতীয়তাবাদী জনপরিসরে পরিণত হবে। তাঁদের এ ধরনের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে চলচ্চিত্র সাংস্কৃতিকভাবে অন্য পথ, অর্থাৎ জনপ্রিয় পথে হাঁটে। চলচ্চিত্রের দেশীয়করণে স্পষ্ট হয়েছে একটি গ্রামীণ-স্বদেশি জনপরিসর, বিশেষ করে গ্রামীণ একটি যাত্রাপালার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্র *রূপবান* (১৯৬৫)-এর মধ্যে।

বহুজাতিক বিনোদনমূলক চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে প্রথমবারের মতো *রূপবান* প্রচুর পরিমাণে গ্রামীণ দর্শকদের পূর্ব পাকিস্তানের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে আকৃষ্ট করে। ঢাকার চলচ্চিত্র নির্মাণকেন্দ্রকে টেকসই দর্শকসহ মধ্য পর্যায়ের জাতীয় চলচ্চিত্রকেন্দ্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে এটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ। এই চলচ্চিত্রের নির্মাণ ও গ্রহণ শুধু ঢাকাই চলচ্চিত্রশিল্পকে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেনি, সঙ্গে সঙ্গে তখনকার কৃষিভিত্তিক ইসলামিক সমাজে চলচ্চিত্রের জন্য একটি বিস্তৃত সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছিল। এ জন্য আমার মতে, পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্রের দেশীয়করণে *রূপবান* চলচ্চিত্রটি একটি বিশাল পদক্ষেপ। এটি প্রথমবারের মতো দেখিয়েছিল, একটি স্বদেশি, জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাণশিল্প এখানে টেকসই হতে পারে। এভাবে চলচ্চিত্রটি ক্ষীয়মাণ বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে গ্রাম থেকে নতুন দর্শক আনার মাধ্যমে পরিণত করেছিল একটি স্পন্দনশীল স্বদেশি জনপরিসরে।

কবিরের মতে, বাংলা বাস্তবিক চলচ্চিত্রের ব্যর্থতার জন্য এ বছরগুলোতে ঢাকাই চলচ্চিত্রশিল্প দ্রুত একটি বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, যতক্ষণ না এহতেশাম *চান্দা* (১৯৬২) তৈরি করলেন। এটি ঢাকায় নির্মিত প্রথম উর্দু চলচ্চিত্র। পূর্ব ও পশ্চিম, উভয় পাকিস্তানের বক্স অফিসে খুব ভালো করেছিল চলচ্চিত্রটি এবং এরপর উর্দু চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি চল শুরু হয়েছিল। ১৯৬২-১৯৬৫ সালের মধ্যে ১৮টি বাংলা ছবির সঙ্গে ১৯টি ছবি উর্দু ভাষায় নির্মিত হয়।[৩৩] এটি একটি নতুন আপাতবিরোধী সত্য নির্মাণ করে। এখন ঢাকাভিত্তিক বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে (তখনো তার শৈশবকালে) শুধু আমদানিকৃত চলচ্চিত্র নয়, দেশে তৈরি উর্দু চলচ্চিত্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। বাঙালি দর্শকদের একটি টেকসই ভাগ অর্জনের জন্য বাংলা চলচ্চিত্র। যা-ই হোক, ১৯৬৫ সালের মধ্যে বাংলা বা উর্দুতে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো দর্শক আনতে ব্যর্থ হওয়া শুরু করেছিল। ১৯৬৫ সালের নভেম্বরে ঢাকাই চলচ্চিত্রশিল্প আবার যখন বন্ধ হওয়ার মুখে, *রূপবান*-এর মুক্তি শিল্পটিকে বাঁচিয়ে দেয়। কবির *রূপবান*কে সংজ্ঞায়িত করেন 'বাণিজ্যিকভাবে সফল চলচ্চিত্রের অগ্রদূত' হিসেবে, যা বাঙালি-মুসলমান দর্শকের জন্য বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণে ঢাকার স্টুডিওকে টিকে থাকতে সাহায্য করে।[৩৪] বাংলা চলচ্চিত্রের নির্মাণ আবার

নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায় : ১৯৬৫ সালে ৫টি, ১৯৬৬ সালে ১৪টি এবং ১৯৬৮ সালে ২৫টি বাংলা চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।[৩৫]

কীভাবে *রূপবান* এত জনপ্রিয় হতে পেরেছিল যে এটি ঢাকাই চলচ্চিত্রশিল্পের বাংলা চলচ্চিত্রকে একটি জনপ্রিয়-স্বদেশি জনপরিসরে রূপান্তরিত করেছিল? এর কারণ হচ্ছে, চলচ্চিত্রটি একটি সুপরিচিত কাহিনি ও গ্রামীণ যাত্রাপালার চরিত্রায়ণের মাধ্যমে বাঙালি-মুসলমান গ্রামবাসীকে চলচ্চিত্রের মতো একটি পশ্চিমা, আধুনিক এবং প্রযুক্তিগত মাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে সাহায্য করেছিল। *রূপবান* পরিণত হয়েছিল একটি উপস্থাপনানির্ভর মাধ্যম (গ্রামীণ অপেরা) থেকে চলচ্চিত্রে। পূর্ব বাংলার গ্রামগুলোতে বিনোদন মাধ্যম ছিল ঐতিহ্যবাহী শিল্পমাধ্যম যাত্রা। পরিবেশনার এ ধরনটিকে বলা যেতে পারে বাঙালি গ্রামীণ অপেরেট্টা। এটি সাধারণত ফসল উত্তোলনের সময়টাতে মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত গ্রামের কেন্দ্রে কোনো জায়গায় একটি কাঠের বেদির ওপরে পরিবেশিত হয়। জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় অথবা দর্শকদের থেকে কিছু চাঁদার বিনিময়ে (যেমন অনেক সময় একটি পরিবার থেকে চাঁদা হিসেবে এক কেজি চাল দিতে হতো) আয়োজিত এ যাত্রাগুলোতে চরিত্রাভিনেতাদের সবাই ছিলেন পুরুষ। কাহিনির ধারণা ছিল সুপরিচিত কিংবদন্তি বা জনপ্রিয় পুরাকথার ওপর ভিত্তি করে, যেখানে ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব থাকত এবং অবশ্যই নায়ক-নায়িকা খলচরিত্রকে হারিয়ে দিত। কিছু কিছু আখ্যানে থাকতে পারে কয়েক প্রজন্ম।[৩৬]

গ্রামের মানুষেরা *রূপবান*-এর মতো যাত্রাপালা দেখতে অভ্যস্ত ছিল। তাই যখন এটি চলচ্চিত্র হিসেবে তৈরি হলো, তখন তাঁরা ভেবেছিলেন পালাটাই বড় পর্দায় দেখানো হচ্ছে, যেটা আগে মঞ্চে হতো, সেটাই এখন পর্দায় হবে। সালাহউদ্দিন, *রূপবান*-এর পরিচালক, যখন যাত্রাকে চলচ্চিত্রে 'রূপান্তরিত' করছিলেন, তখন তিনি ব্যবহার করেছিলেন 'মঞ্চের ঐতিহ্যবাহী প্রবেশ-সংলাপ-প্রস্থানশৈলী'।[৩৭] এই উপায়ে গ্রামীণ দর্শকের গ্রামের মধ্যের যাত্রার দর্শক থেকে কাছাকাছি শহরের চলচ্চিত্রের দর্শকে পরিণত হতে পারতেন। তানভীর মোকাম্মেল, বাংলাদেশের একজন চলচ্চিত্র সমালোচক ও লেখক, পূর্ব বাংলার গ্রামের মানুষদের মধ্যে শনাক্ত করেছেন একটি 'তীব্র স্মৃতিকাতরতা'। তাঁরা ভীষণ খুশি হন যে যাত্রার পরিচিত চরিত্রগুলো মঞ্চ-পরিবেশনা থেকে বড় পর্দায় নড়াচড়া করছে।[৩৮] দিসানায়েক ভারতের চলচ্চিত্রকে নতুনভাবে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন জনপরিসরের ধারণার জায়গা থেকে : 'সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও জনগণের তাতে অংশগ্রহণ লিখিত ও প্রকাশিত শব্দকে পূর্ণ করে।'[৩৯] *রূপবান*-এর ক্ষেত্রে আমরা যেমনটা দেখি, এ ধরনের

সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং বিশালাকার দর্শক অংশগ্রহণ চলচ্চিত্রটিকে জনপ্রিয়তার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য জনপ্রিয় পরিবেশনার পাশাপাশি চলচ্চিত্রেরও একটি জায়গা খুঁজে পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও এটি বিকশিত হয়েছিল।

গ্রামীণ অপেরার সঙ্গে আন্তসম্পর্ক থাকায় *রূপবান* সামাজিক ও ধর্মীয় ট্যাবুগুলো ভাঙতে পেরেছিল, যে ট্যাবুগুলো ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অনেক গ্রামীণ বাঙালি মুসলমানকে চলচ্চিত্র থেকে দূরে রেখেছিল। ১৯৫৬ সালে *মুখ ও মুখোশ*-এর মতো সাংস্কৃতিক-জাতীয়তাবাদী চলচ্চিত্র নির্মিত হলেও, তখন পর্যন্ত চলচ্চিত্রকে পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ১৯৬০-এর দশকে পূর্ব বাংলার গ্রামীণ মুসলমানরা ছবি তোলা বা চলচ্চিত্র ধারণ করাকে হিন্দুদের মূর্তিপূজার সমতুল্য মনে করতেন। একটি 'ইসলামি' ভুল (ধারণা) প্রচলিত ছিল যে ছবি দেখা বা সংরক্ষণ করা পাপের কাজ। ১৯৭১ সালে কবির লিখেছেন :

> শহরের সিনেমা হলে রূপবান'র প্রদর্শনী হবে, এমন খবর প্রচারিত হওয়া মাত্রই, তা দেখার জন্য অভূতপূর্ব ভিড় জমেছিল। গ্রামবাসীরা, যারা সব সময় চলচ্চিত্রকে শয়তানের প্ররোচনা হিসেবে দেখত, তারা হাজারে হাজারে পরিবারসহ শহরে জমা হতে থাকল। টিকেট না পেয়ে, তারা সিনেমা হলের বাইরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করছিল। তাদেরকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, চলচ্চিত্র দেখার জন্য এ ধরনের উন্মাদনা পাপ কিনা। তারা একেবারে অকপটভাবেই জবাব দিয়েছিলেন : 'আমরা রূপবান (যাত্রা) দেখতে এসেছি, সিনেমা না![৪০]

অন্য কথায় মুসলমান গ্রামবাসীর যুক্তি ছিল, চলচ্চিত্র দেখা পাপ হতে পারে, কিন্তু ভিডিও করা যাত্রা দেখা পাপ হতে পারে না। কারণ এটাসহ অনেক যাত্রা নাটক তারা ইতিমধ্যে দেখেছে। গল্প ছাড়াও, মূল যাত্রাতে ব্যবহৃত হয়েছিল এমন কয়েকটি জনপ্রিয় লোকগানও চলচ্চিত্রটিতে ব্যবহার করা হয়। এই গানগুলো নিশ্চিতভাবে বিখ্যাত নাটকটির সঙ্গে চলচ্চিত্রটির সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল।

কবির এবং চিন্ময় মুৎসুদ্দীর মতে, রূপবান পূর্ব বাংলায় চলচ্চিত্রের দর্শক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কবিরের মতে, 'এটা গ্রামীণ এলাকা থেকে চলচ্চিত্রের নতুন দর্শক তৈরি করেছিল, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এই নতুন দর্শকেরা চলচ্চিত্র দেখার জন্য শহরে আসার অভ্যাস করেছিল'।[৪১] ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে যেখানে অন্যান্য বাংলা চলচ্চিত্রের মাত্র চার বা পাঁচটি রিলিজ ছাপা হতো, সেখানে *রূপবান*-এর ১৭টি রিলিজ ছাপানো

হয়েছিল। শুধু *রূপবান*-এর প্রদর্শনীর জন্য গ্রামীণ এলাকায় অনেক অস্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করা হয়েছিল।[৪২]

ফলে ১৯৬০-এর দশকের পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জনগণ রূপবানকে যেভাবে গ্রহণ করেছিল, সেটিকে এই অঞ্চলের সক্রিয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতির সঙ্গে স্থানীয় প্রচলিত চলচ্চিত্রের একেবারে প্রাথমিক বোঝাপড়া হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই অঞ্চলের সক্রিয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতির মধ্যে যাত্রার মতো লোকজ ও মঞ্চাভিনয় থেকে শুরু করে ধর্মীয় ও অবসরকালীন কাজগুলোও অন্তর্ভুক্ত। এর আগে পর্যন্ত 'চলচ্চিত্র' ছিল শুধু শহুরে, আধা-পশ্চিমায়িত লোকেদের বিনোদনের মাধ্যম। এই প্রথমবারের মতো পূর্ব বাংলার গ্রামের মানুষ চলচ্চিত্র দেখার জন্য দল বেঁধে ভিড় জমিয়েছিল। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্রের দেশীয়করণ ১৯৬০-এর দশকে একটি জনপ্রিয় চলচ্চিত্রশিল্প তৈরির পথ প্রসারিত করেছিল। এই সময় চলচ্চিত্র সাধারণ, গ্রামীণ বাঙালি মুসলমানদের নিত্যদিনের জীবনের এবং একইভাবে গ্রামীণ-স্বদেশীয় জনপরিসরের অংশে পরিণত হয়।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে একাধিক জনপরিসরের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে চলচ্চিত্র মাধ্যমের প্রাথমিক সাক্ষাৎগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্ব বাংলায় চলচ্চিত্রের সাংস্কৃতিক অধিগ্রহণকে আমি বিভিন্ন বিকল্প জনপরিসরের মাধ্যমে বুঝিয়েছি। আমার প্রস্তাব হচ্ছে খান, সেন ও নওয়াবরা এবং তাঁদের চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রচেষ্টা; প্রথম দিকের প্রদর্শনীগুলো, সিনেমা হলগুলো; আন্তর্দেশীয় চলচ্চিত্রগুলোকে এবং একই সঙ্গে *রূপবান*সহ প্রথম দিকের স্বদেশি জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলোকে গ্রহণ করার মতো কিছু বিষয় বিভিন্ন ধরনের জনপরিসরের উপস্থিতিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। এই বিষয়গুলোই পূর্ব বাংলার বাঙালি-মুসলমান সাংস্কৃতিক পরিবেশে চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করার প্রক্রিয়ায় অবদান রেখেছে।

এভাবে দক্ষিণ এশিয়ার একটি মুসলিমপ্রধান এবং কৃষিভিত্তিক সমাজে চলচ্চিত্রের মতো একটি পশ্চিমা প্রযুক্তির সাংস্কৃতিক অধিগ্রহণের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াটি আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি। আমার দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশ এবং অন্যান্য জায়গার চলচ্চিত্রের ইতিহাসবিদদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। তাঁরা মূলত একটি জাতীয়তাবাদী জ্ঞানভাষ্যের মধ্যে কাজ করেন এবং চলচ্চিত্রকে প্রভাবশালী জাতীয় জনপরিসরের শুধু একটি অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেন। পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক প্রতিবেশে চলচ্চিত্রের অধিগ্রহণ ব্যাখ্যায় এই

জাতীয়তাবাদী, প্রায়োগিক-প্রযুক্তিগত ইতিহাস রচনাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি, এই পদ্ধতি উত্তরাধিকারসূত্রে হাবারমাসীয় বুর্জোয়া জনপরিসরের ধারণা ব্যবহার করে।

এখানে আমি স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোর সামাজিক প্রতিবেশে চলচ্চিত্রের সাংস্কৃতিক ভাষান্তরের প্রক্রিয়া এবং শর্তগুলোকে চিহ্নিত করেছি। এই প্রক্রিয়া বৈচিত্র্যহীন এবং নির্দিষ্ট ছিল, যদিও অনেক ইতিহাসবিদ এ রকমটা মনে করেন। আমি বরং রে চওর কথা ধার করতে পারি, যার কাছে সাংস্কৃতিক ভাষান্তর প্রক্রিয়াটি এ রকম: 'কখনোই পশ্চিম পূর্বকে বা পূর্ব পশ্চিমকে ভাষান্তর করেনি... [কিন্তু] এই প্রক্রিয়ায় একগুচ্ছ কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত; যার মধ্যে ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতায়, সাহিত্য থেকে দৃশ্যতায়, এলিট পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃতি থেকে গণসংস্কৃতিতে, দেশজ থেকে বিদেশিতে পরিবর্তন এবং পুনঃপরিবর্তন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত'।[৪৩] আমি দেখিয়েছি যে পূর্ব বাংলায় ১৯০০-এর দশক থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত চলচ্চিত্র একটি অস্থিতিশীল দেশীয়করণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছে এবং ওপরে বর্ণিত ঘটনা এবং উদ্যোগগুলো এই প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমার মূল আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার এই অংশে বৈচিত্র্যময় জনগণের জন্য বিভিন্ন জনপরিসর তৈরিতে চলচ্চিত্র মাধ্যম কীভাবে ভূমিকা পালন করেছে। আমার মতে, আমরা যদি চলচ্চিত্রকে বহুবিধ, অধিক্রমণকারী জনপরিসর হিসেবে এবং এই জনপরিসরগুলোর সমান্তরাল হিসেবে বিবেচনা করি, যেগুলো অন্যান্য জ্ঞানভাষ্যের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া এবং প্রতিযোগিতায় লিপ্ত; তাহলে আমরা দক্ষিণ এশিয়ায় চলচ্চিত্রের সাংস্কৃতিক অধিগ্রহণের আরও জটিল এবং বৈচিত্র্যময় প্রক্রিয়াটিকে উপলব্ধি করতে পারব।

তথ্যসূত্র :

১. Rey Chow, *Primitive Passions: Visuality, Sexuality, Ethnography, and Contemporary Chinese Cinema* (New York: Columbia University Press, 1995), 197.

২. Wimal Dissanayake, "Rethinking Indian Popular Cinema: Towards Newer Frames of Understanding," in *Rethinking Third Cinema*, ed. Anthony Guneratne and Wimal Dissanayake (London: Routledge, 2003), 214 – 15.

৩. This study was translated and published in English as late as in 1989. See Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois*

Society, trans. Thomas Burger (Cambridge: Polity Press, 1989).

৪. Habermas, *Structural Transformation*, 12 – 26.

৫. James Van Horn Melton, *The Rise of the Public in Enlightenment Europe* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 4.

৬. Nancy Fraser, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the 'Postsocialist' Condition* (London: Routledge, 1996), 70.

৭. Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, trans. William Rehg (Cambridge: MIT Press, 1996), 360.

৮. Oskar Negt and Alexander Kluge, *Public Sphere and Experience: Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere*, trans. Peter Labanyi, Jamie Owen Daniel, and Assenka Oksiloff (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993).

৯. Miriam Hansen, 'Early Cinema, Late Cinema: Permutations of the Public Sphere,' *Screen* 34 (1993): 203.

১০. Miriam Hansen, *Babel and Babylon: Spectatorship in American Silent Film* (Cambridge: Harvard University Press, 1991), 7 – 8.

১১. Hansen, 'Early Cinema,' 201.

১২. Syed Salahuddin Zaki, 'Bangladesh Cinema: A Brief Review,' *Celluloid* 20, no. 1 (1997): 20 – 23; Alamgir Kabir, *Film in Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 1979), 22 – 24; Anupam Hayat, *A History of Bangladesh Cinema* (Dhaka: Bangladesh Film Development Corporation, 1987), 43 – 55; Chinmoy Mutsuddi, *Social Commitment in Bangladesh Cinema* (Dhaka: Bangladesh Shilpokola Academy, 1987), 19 – 22; and Mirza Tarequl Quader, *Bangladesh Film Industry* (Dhaka: Bangla Academy, 1993), 96 – 97, 103 – 19.

১৩. Quader, *Bangladesh Film Industry*, 43 – 44; and Kabir, *Film in Bangladesh*, 1 – 2.

১৪. Quoted in Hayat, *History*, 1 – 3.

১৫. ibid., 6 – 7.

১৬. ibid., 6 – 8.

১৭. Kaiyum Chowdhury, 'Gregory Peck: Our Favorite Hero,' *Daily Prothom Alo*, no. 5, 4 July 2003.

১৮. Hansen, foreword to *Public Sphere and Experience*, xxvii.

১৯. Mofidul Huq, 'The Tribute of the Centenary of Cinema: Hiralal Sen,' *Celluloid* 20, no. 1 (1997) 13 – 18; and Hayat, *History*, 3 – 4.

২০. Ashish Rajadhyaksha and Paul Willemen, *Encyclopedia of Indian Cinema* (London: British Film Institute, 1994), 17, 195.

২১. Hayat, *History*, 1 – 4; and Anupam Hayat, 'Silent Era of Dhaka Cinema,' *Dhrupadi* 5 (1985): 14.

২২. Kalish Mukherjee, *The History of Bengali Film Industry* (Calcutta: Rupamancha, 1961), 27.

২৩. Zaki, 'Bangladesh Cinema,' 20; and Mutsuddi, *Social Commitment in Bangladesh Cinema*, 19.

২৪. Mutsuddi, *Social Commitment in Bangladesh Cinema*, 19; Hayat, 'Silent Era of Dhaka Cinema,' 19; Jahangir Alam Khan, 'The Development of the Bangladesh Film Industry,' *Chinta* 19 (1995): 39 – 40; and Mahmudul Hossain, 'Mainstream Cinema: a Brief Introduction,' *View from Bangladesh* (Dhaka: Bangladesh Federation of Film Societies, 1991), n.p.

২৫. Hayat, *History*, 10 – 15; and Quader, *Bangladesh Film Industry*, 73 – 76.

২৬. Hayat, *History*, 12.

২৭. ibid., 14.

২৮. Dissanayake, 'Rethinking Indian Popular Cinema,' 216.

২৯. Zaki, 'Bangladesh Cinema,' 20 – 23; Kabir, *Film in Bangladesh*, 22 – 24; Hayat, *History*, 43 – 55; Mutsuddi, *Social Commitment in Bangladesh Cinema*, 19 – 22; and Quader, *Bangladesh Film Industry*, 96 – 97, 103 – 19.

৩০. ibid.

৩১. Kabir, *Film in Bangladesh*, 22.

৩২. Alamgir Kabir, 'Bangladesh Film Industry,' *Celluloid* 2, no. 2 (1981): 5.

৩৩. Quader, *Bangladesh Film Industry*, 135.

৩৪. Kabir, *Film in Bangladesh*, 29.

৩৫. Golam Mostafa, 'Thoughts about Cinema,' *Chalachchitra* 1, no. 2 (1975): 25; and Kabir, 'Bangladesh Film Industry,' 5.

৩৬. Alamgir Kabir, 'A Study of the Pakistani Cinema,' in *The Performing Arts in Asia*, ed. James R. Brandon (Paris: Unesco, 1971), 148.

৩৭. Kabir, *Film in Bangladesh*, 28.
৩৮. Tanvir Mokammel, *The Aesthetics of Cinema* (Dhaka: Agami, 1998), 169.
৩৯. Dissanayake, 'Rethinking Indian Popular Cinema,' 215.
৪০. Kabir, 'Pakistani Cinema,' 149.
৪১. Kabir, *Film in Bangladesh*, 29.
৪২. Mustsuddi, *Social Commitment in Bangladesh Cinema*, 32.
৪৩. Chow, *Primitive Passions*, 192.

অনুবাদ : **প্রণব ভৌমিক**

বই আলোচনা

আইএসের উত্থান ও বিশ্বরাজনীতি

আইরিন খান

দ্য রাইজ অব ইসলামিক স্টেট : আইসিস অ্যান্ড দ্য নিউ সুন্নি রেভল্যুশন —
প্যাট্রিক ককবার্ন, ভার্সো, লন্ডন/নিউইয়র্ক ২০১৪/২০১৫, পৃষ্ঠা ১৯২

পটভূমি

দ্য রাইজ অব ইসলামিক স্টেট : আইসিস অ্যান্ড দ্য নিউ সুন্নি রেভল্যুশন বইটি প্যাট্রিক ককবার্নের অন্যান্য বইয়ের মতোই আলোচিত একটি বই। মধ্যপ্রাচ্যে আইসিসের উত্থানের কারণগুলো লেখক বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন বইটিতে। তিনি ৯-১১-পরবর্তী মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ভুল নীতিকে দায়ী করেছেন আইসিসের উত্থানের মূল কারণ হিসেবে। এর সঙ্গে গালফ রাষ্ট্রগুলোর আইসিসকে অর্থনৈতিক মদদদান ও ইরাক-সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও রাজনীতি কীভাবে আইসিসের উত্থানের জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল, লেখক তার বিবরণ দিয়েছেন বইটিতে।

১৯২ পৃষ্ঠার বইটিতে ৯টি অধ্যায় আছে। ২০ পৃষ্ঠার মুখবন্ধের পর প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে পুরো বইটির সারসংক্ষেপ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মসুল দখলের মধ্য দিয়ে আইসিসের শক্তিশালী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক উল্লেখ করেছেন আঞ্চলিক শক্তিগুলো কীভাবে তাদের নিজেদের স্বার্থে আইসিসকে মদদ দিয়ে তাদের নৃশংসতা উসকে দেয়। জিহাদিদের উত্থান, নেতৃত্ব ও অন্যান্য জিহাদি দলের সঙ্গে আইসিসের সম্পর্কের কথা চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন ককবার্ন। পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়, কীভাবে জিহাদিরা ইরাকে একের পর এক শহর দখল করতে থাকে ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ককবার্ন লিখেছেন, কীভাবে জিহাদিরা সিরিয়ার আন্দোলন নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করে সরকারবিরোধী দেশীয় ও

আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোকে নিজেদের করায়ত্ত করে। সৌদি আরব আইসিসকে অনড় সমর্থন ও মদদ দিয়ে এসেছে ইরাক ও সিরিয়াতে শিয়া পৃষ্ঠপোষক সরকার দমনের জন্য। আইসিস শুধু একটি ত্রাস সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নয়, বরং একটি আদর্শ, যা বিশ্বজুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রচুর নাগরিক দলে দলে আইসিসে যোগ দিচ্ছে। এই 'নির্ভীক' আইসিস জিহাদিরা যখন যুদ্ধ শেষে নিজ নিজ দেশে ফিরে আসবে, তখন তারা নিজ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্রতী হবে। এমতাবস্থায় আইসিসের মদদদাতা সৌদি আরব তাদের বিভিন্ন নীতিগত পরিবর্তন এনে এই দানব প্রতিহত করার চেষ্টা করছে, যার বর্ণনা সপ্তম অধ্যায়ে ককবার্ন দিয়েছেন। অষ্টম অধ্যায়ে আইসিস যুদ্ধে পক্ষপাতী ও দায়িত্বহীন পশ্চিমা গণমাধ্যমের নেতিবাচক আলোচনা করেছেন ককবার্ন। শেষ অধ্যায়ে লেখক আবারও আইসিসের উত্থানের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করে আরব বসন্ত-পরবর্তী রাষ্ট্রগুলোর অস্তিত্ব নিয়ে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর সম্ভাব্য অবস্থান ও নীতিগত পরিবর্তনই নির্ধারণ করবে আইসিসের ভবিষ্যৎ।

ফরেন পলিসি জার্নালের মতে, ককবার্নের বইটি আইসিস বিষয়ে জানার জন্য যথার্থ। বইটি এই দীর্ঘ যুদ্ধে জড়িত বিভিন্ন অংশীদারের ভূমিকা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে। মধ্যপ্রাচ্যে এই যুদ্ধ যতই অগ্রসর হচ্ছে, ততই যেন এর প্রকৃতি আরও ভয়াবহ হচ্ছে। ওয়াশিংটনভিত্তিক সাংবাদিক ও রাজনীতিবিষয়ক লেখক সাইমম হার্শের মতে ককবার্ন বর্তমানে ইরাকবিষয়ক সবচেয়ে ভালো সাংবাদিক। *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর মতে, বইটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বর্ণনার প্রাচুর্যে ভরা। *দ্য অবজারভার*-এর মতে, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি ও সংকট সম্পর্কে লেখা বইগুলোর মধ্যে খুব কম বই বইটির মতো তথ্যসমৃদ্ধ।

ব্রিটিশ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডের বিচারকদের মতে, প্যাট্রিক ককবার্ন আইসিসের আবির্ভাব সম্পর্কে শুরু থেকেই সোচ্চার। আইসিস বিষয়ে এত গভীরতা, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও অন্তর্দৃষ্টিমূলক লেখা যখন তিনি লিখছিলেন, তখন আর কেউ এই আসন্ন হুমকির ভয়াবহতা সম্পর্কে সোচ্চার ছিলেন না। তাঁদের মতে, এমআই-৬ ব্রিটিশ ব্রিগেডকে বাদ দিয়ে প্যাট্রিক ককবার্নকে নিয়োগ দেওয়া উচিত। মার্কিন সাংবাদিক, সমাজকর্মী, লেখক ও প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সাবেক রাজনৈতিক সহযোগী, সিডনি স্টোন ব্লুমেন্থাল হিলারি ক্লিনটনকে লেখা এক ই-মেইলে প্যাট্রিক ককবার্নকে ইরাক বিষয়ে সবচেয়ে তথ্যসমৃদ্ধ সাংবাদিক বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

ককবার্নের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে বইটিতে। আইসিস বিষয়ে যাদের জানার আগ্রহ আছে, তাদের

জন্য বইটি চিন্তার খোরাক জোগায়। বইটিতে ইরাকের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে যে বিশদ আলোচনা আছে, তা এই বিষয়ে আগ্রহী পাঠক ও লেখকের জন্য নির্দেশক বই হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে পুরো বইয়ে আইসিস উত্থানের কারণগুলো বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করা আছে, যা কখনো পুনরাবৃত্তিমূলক ও কখনো প্রয়োজনাতিরিক্ত। লেখার ক্ষেত্রে বইটি কাঠামোহীন। সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল ও ইরাকে আইসিসের উত্থান ও এই বিষয়ে তথ্য বিস্তারের আবশ্যকতা বিষয়ে পশ্চিমা রাজনীতিক ও গণমাধ্যম উদাসীন। সেই শূন্যস্থান পূরণের উদ্দেশ্যে ককবার্ন এই আলোচনামূলক বইটি লিখেছেন। বইটি মূলত তাঁর ইরাকে আইসিস বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা। বইটিতে অন্য কোনো রেফারেন্স বা তথ্যসূত্র ব্যবহার করা হয়নি। সে ক্ষেত্রে বইটির প্রকৃতি ভিন্ন হতে পারত, বইটি বর্ণনামূলক না হয়ে, তাঁর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা বিষয়ে সাক্ষাৎকারমূলক বা আত্মজীবনীমূলক বই হলে পাঠকের পড়ার ক্ষেত্রে হয়তো আর একটু স্বস্তিদায়ক হতো। বইটির স্বীকৃতি অংশে লেখক বলেছেন, বইটির বিভিন্ন অধ্যায় বিভিন্ন সময়ে, কখনো ২০১৪ সালে নিউইয়র্কের আর্ট ফাউন্ডেশনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় বা *ইনডিপেনডেন্ট* ও *লন্ডন রিভিউ অব বুকস*-এর জন্য প্রবন্ধ লেখার সময় লেখা হয়েছে। তাই হয়তো ধারণা করা যায়, বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব আছে। সে ক্ষেত্রে সম্পাদনার অপ্রতুলতা ধরা পড়ে বইটিতে। বইটির আর একটি বড় দুর্বলতা এখানে আইসিসের আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা চরিত্র নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি। বইটি ২০১৪ সালে আইসিসের মসুল দখলের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেছে। সে ক্ষেত্রে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও কারণ বা যুদ্ধের প্রকৃতি বর্ণনা ছাড়াই যুদ্ধরত দলের উত্থানের কারণ সম্পর্কে বর্ণনা কিছুটা অসম্পূর্ণ বোধ হয়।

লেখক পরিচিতি

প্যাট্রিক ককবার্ন একজন আইরিশ নাগরিক, যিনি ১৯৭৯ সাল থেকে *ফিন্যান্সিয়াল টাইমস* ও ১৯৯১ সাল থেকে *ইনডিপেনডেন্ট* পত্রিকার মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সাংবাদিক। ককবার্নের জন্ম ও বেড়ে ওঠা আয়ারল্যান্ডে। তাঁর বাবা-মা উভয়ই সুপরিচিত সমাজতান্ত্রিক লেখক ও সাংবাদিক ছিলেন। তিনি অক্সফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজ থেকে লেখাপড়া করেছেন ও পরবর্তী সময়ে বেলফাস্টের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব আইরিশ স্টাডিজে গবেষণা ছাত্র হিসেবে ছিলেন। ১৯৮১ সালে তিনি জেনেট এলিজাবেথকে বিয়ে করেন, যিনি কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন।

ককবার্ন ইরাকের বর্তমান ইতিহাসের ওপর তিনটি বই লিখেছেন। *Out of the Ashes: The Resurrection of Saddam Hussein (1999)*, যা ২০০২ সালে *Saddam Hussein: An American Obsession* নামে ব্রিটেন থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা *The Occupation: War and Resistance in Iraq (2006)* বইটি ২০০৬ সালে ন্যশনাল বুক ক্রিটিক সার্কেল পুরস্কার পায়। তাঁর লেখা অন্য বইগুলো হলো ২০০৮ সালে *Muqtada: Muqtada al-Sadr, the Shia Revival ও the Struggle for Iraq*, ২০১৪ সালে *The Jihadis Return: Isis and the New Sunni Uprising*, যা ৯টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, ২০১৫ সালে *The Rise of Islamic State: Isis and the New Sunni Revolution* ও ২০১৬ সালে *Chaos and Caliphate: Jihadis and the West in the struggle for the Middle East*। এ ছাড়া ২০০৫ সালে তিনি আত্মজীবনীমূলক লেখা লিখেছেন, *The Broken Boy*।

কাজের প্রশংসা ও সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি অর্জন করেছেন বিভিন্ন পুরস্কার। ২০০৫ সালে মার্থা গেলহর্ন পুরস্কার, ২০০৬ সালে দ্য জেমস কেমেরন পুরস্কার, ২০০৯ সালে অরওয়েল পুরস্কার, ২০১৩ সালে এডিটরিয়াল ইন্টেলিজেন্স কমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে বর্ষসেরা বিদেশি বিবরণদাতা, ২০১৪ সালে ব্রিটিশ জার্নালিজম পুরস্কারে বর্ষসেরা আন্তর্জাতিক সংবাদদাতা ও ২০১৪ সালে দ্য প্রেস অ্যাওয়ার্ডে বিদেশি সংবাদদাতা হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন।

আইসিসের উত্থান

আইসিসের উত্থান জানতে হলে ফিরে যেতে হবে আশির দশকে, ১৯৭৯ সালে, যখন আফগান মুজাহিদিনদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব ও পাকিস্তানের আইএসআই সাহায্য করেছিল সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে। সাফল্যের সঙ্গে সোভিয়েত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধজয় তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে এবং এই মুক্তিযোদ্ধারা পরবর্তী সময়ে তালেবানে পরিণত হয়। এই যুদ্ধ থেকে দুজন নেতার আবির্ভাব হয়, যারা ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত অপসারণের পর সৌদি আরব পাড়ি জমায়। একজন ওসামা বিন লাদেন, অপরজন আবু মুসাব আল জারকাওয়ি। আদর্শগতভাবে দুজনের মধ্যে ছিল ভিন্নতা। লাদেন সেখানে আল-কায়েদার জন্ম দেন ও জারকাওয়ি আল-তাউহিদ ওআল জিহাদ নামে ভিন্ন আর একটি দল গঠন করেন। তারপর তাঁরা দুজনেই আবার আফগানিস্তান ফেরত যান, যার কিছুদিন পরই ৯-১১ হামলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণ করলে ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তান ও আবু মুসাব আল জারকাওয়ি ইরাকে পালিয়ে যান। ২০০৪ সালে ইরাকে মার্কিন হামলায় সাদ্দামের পতনের পর অনেক

ক্ষুব্ধ ইরাকি সেনাসদস্য ও সুন্নি মুসলমান বিভিন্ন বিদ্রোহী দলগুলোতে যোগদান করেন। তখন জারকাওয়ির দল শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও ইরাকে শিয়াদের বিরুদ্ধে ও মালিকি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আল-কায়েদা তখন জারকাওয়ির দলের সঙ্গে জোট গঠন করে, তখন এর নাম হয় আল-কায়েদা ইন ইরাক (একিউআই)। ২০০৬ সালে মার্কিন হামলায় জারকাওয়ির মৃত্যু হয় ও আল-কায়েদা ইন ইরাক নেতৃত্বশূন্য হয়। ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরাক ত্যাগ করার ঘোষণা দেন। ডিসেম্বরে সাদ্দামের ফাঁসি হয়। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন দিন দিন আমেরিকানদের তাদের সরকারের ওপর হতাশ করে তোলে। সরকারকে তারা চাপের মুখে ফেলে ইরাক যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। ইরাকে মার্কিন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অপ্রত্যাশিত ছিল। সাদ্দাম ও জারকাওয়ির মৃত্যু ইরাকের চলমান সহিংসতা কমাতে পারেনি। মার্কিনদের পক্ষে ইরাকের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব সমাধান করা যে অসম্ভব ও এই দ্বন্দ্ব দিনে দিনে যে আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, সেটাও তাদের জ্ঞাত ছিল। তাই মার্কিনদের জন্য ইরাক ত্যাগ ছিল আবশ্যক।

২০১১ সালে মার্কিন বাহিনী ইরাক ত্যাগ করে। একই বছর আরবজুড়ে নামে বসন্ত। তিউনিসিয়া, মিসর, লিবিয়া, মরক্কোসহ একের পর এক আরব রাষ্ট্রগুলোতে যখন অভ্যন্তরীণ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতন হচ্ছিল, তার প্রচেষ্টা সিরিয়াতেও হয়। তবে সিরিয়ার শাসক শক্ত হাতে তাঁর শাসনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছেন। যার ফলে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সিরিয়ার এই যুদ্ধই মূলত আইসিসের আসল জীবনীশক্তি। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সব বিশ্বশক্তি একে অন্যের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অনুশীলনে ব্যস্ত। আর এই সুযোগেরই ফসল আইসিস।

সৌদিদের প্রচণ্ড রকমের শিয়া বিস্তারভীতি রয়েছে, যদিও ৫৭টি মুসলমান দেশের মধ্যে মাত্র ৪টি দেশে শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও অল্প কিছু দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠতা আছে। যেকোনো মুসলমান দেশে রাষ্ট্রপ্রধান শিয়া হলে সৌদি আরবের ভীতি যেন আরও অনেক বেশি বেড়ে যায়। পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রপতি আসিফ আলী জারদারিকে সৌদিদের ব্যাপক অপছন্দের কারণ তাদের ধারণা, তিনি শিয়া। সৌদি রাজা আবদুল্লাহ অনেকবার আমেরিকাকে বলেছেন ইরান আক্রমণের জন্য। একই কারণে ইরাকের মালিকি সরকার সৌদিদের অপ্রিয়। আরব-সিরিয়া সম্পর্ক সব সময়ই বিভিন্ন টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে প্রকাশ্যে আসাদবিরোধী দলগুলোকে সাহায্যের মধ্য দিয়ে এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়। আরব বসন্ত যখন সিরিয়ায় হানা দেয় ২০১১ সালে, আসাদ তখন তাঁর হাজতে থাকা সব জিহাদিকে মুক্তি দিয়ে দেন। জারকাওয়ির মৃত্যুর পর আবু বকর আল-বাগদাদি তাঁর দলের নেতৃত্ব দেন 'ইসলামিক স্টেট অব ইরাক' বা 'আইএসআই' নামে।

২০১২ সালে বাগদাদির এক সহযোগী সিরিয়াতে গিয়ে 'জাভাত আল-নুসরা' নামে নতুন দল গঠন করেন আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য। ২০১৩ সালে বাগদাদি সব আল-কায়েদা ও জিহাদি দলের ওপর তাঁর নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ দাবি করে 'ইসলামিক স্টেট অব ইরাক ও সিরিয়া বা ইসলামিক স্টেট অব ইরাক ও লেভান্টের' ঘোষণা করেন। তখন 'জাভাত আল-নুসরা'র সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে।

২০১৪ সালের গ্রীষ্মে মাত্র ১০০ দিনের মধ্যে 'ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড দ্য লেভান্ট' (আইএসআইএল বা আইএসআইএস বা আইসিস) মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পটভূমি ও মানচিত্র পাল্টে দিয়েছে। ১০ জুন ইরাক, মধ্যপ্রাচ্যসহ পুরো বিশ্ব হঠাৎ করে জানতে পারে, মসুল ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আইএসআইএস (আইএসআইএল/আইসিস) নামে এক উগ্র ইসলামি দলের দখলে চলে গেছে। এর বেশ কিছু মাস পর খবর পাওয়া গেল যে ইসলামপন্থী ও সব আল-কায়েদা সম্বন্ধযুক্ত দল বাগদাদের নিকটস্থ শহর ফালুজা থেকে তুরস্ক-সিরিয়া সীমানা নিকটবর্তী শহর রাকা পর্যন্ত দখল করেছে। আইসিসের এই নব্য দখলকৃত অঞ্চলকে তারা 'খিলাফত' বলে দাবি করে। আইসিস যোদ্ধাদের ককবার্ন জিহাদি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ধর্মীয় উগ্রবাদ ও সামরিক নীতিতে দক্ষ এই জিহাদিরা ইরাক, সিরিয়া ও কুর্দিদের বিপক্ষে অপ্রত্যাশিতভাবে জয়লাভ করে, ইরাক ও সিরিয়ার বিস্তর অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ইরান-ইরাক সীমান্ত থেকে ইরাকি কুর্দিস্তান ও আলেপ্পোর বহিরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই অঞ্চল ওসামা বিন লাদেনের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের থেকে আকারে কয়েক শ গুণ বড়, যাকে ককবার্ন ব্রিটেন বা মিশিগান অঙ্গরাজ্যের থেকেও আকারে বড় বলে চিহ্নিত করেছেন। সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় শহর রাকা দখলের মধ্য দিয়ে মার্চ ২০১৩ সিরিয়া আইসিসের অধীন হতে শুরু করে। জানুয়ারি ২০১৪ সালে আইসিস ফালুজা দখল করে, যা বাগদাদ থেকে মাত্র ৪০ মাইল পশ্চিমে। কয়েক মাসের মধ্যেই তারা মসুল ও তিকরিত দখল করে।

সিরিয়ার চলমান গৃহযুদ্ধ আইসিসের পুঁজি। আইসিসের উত্থান ও টিকে থাকার একটি বড় কারণ সিরিয়ার যুদ্ধ বলে মনে করেন ককবার্ন, যা তিনি বইটির চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ককবার্ন শুরু করেছেন ২০১৪ সালে আইসিসের ধারণ করা একটি ভিডিওচিত্রের মধ্য দিয়ে। সেখানে বিদেশি জিহাদিরা সম্ভবত সিরিয়ার কোনো অঞ্চলে তাদের পাসপোর্ট ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে জিহাদের প্রতি তাদের দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞা দেখায়। পাসপোর্টগুলোর রং দেখে বোঝা যায়, কিছু জিহাদি ছিল সৌদি, জর্ডানিসহ আরও অনেক জাতীয়তার। প্রত্যেকে যখন তাদের পাসপোর্ট ছিঁড়ে আগুনের শিখায় ছুড়ে

মারছিল, তখন তারা নিজ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছিল। এক কানাডীয় ইংরেজি ও আরবি ভাষায় কানাডা ও সব মার্কিন মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করে বলেন, 'আমরা আসছি, আমরা তোমাদের ধ্বংস করে দেব।' এক জর্ডানি বলেন, 'আমরা আবু মুসাব আল-জারকাওয়ির উত্তরসূরি, আমরা তোমাদের মেরে ফেলব।' সৌদি, মিসরীয় ও চেচেন প্রত্যেকেই একই প্রতিজ্ঞা করে। মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র দেখলে দেখা যাবে যে পুরো ইউফ্রেটাস উপত্যকা, পশ্চিম ইরাক থেকে নিয়ে পূর্ব সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্ত পর্যন্ত আইসিসের বা 'জাভাত-আল নুসরা' (জান), যাকে মার্কিন বাহিনী 'কোর আল-কায়েদা ইন পাকিস্তান' বা 'Core al-qaeda in Pakistan' বলে আখ্যায়িত করে, তাদের দখলে।

আইএসআইএলে ২০১০ থেকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন আবু বকর আল-বাগদাদি, যিনি আবু দুআ নামেও পরিচিত। তাঁর আদর্শ মূল আল-কায়েদা থেকেও বেশি সাম্প্রদায়িক ও নৃশংস। আয়মান আল জাওয়াহিরির পাকিস্তানে তাঁর ঘাঁটি ছিল। আবু বকর আল-বাগদাদি আলোচনায় আসা শুরু করেন যখন তিনি ২০১০ সালে আল-কায়েদা ইরাকের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ববর্তী নেতা মার্কিন ও ইরাকি বাহিনীর হামলায় মৃত্যুবরণ করেন। আল-কায়েদা ইন ইরাকের সাংগঠনিক অবস্থা খারাপ হতে থাকলে তা বিলুপ্ত হতে থাকে। আল-বাগদাদির নেতৃত্ব গ্রহণ ২০১১-তে সিরিয়ায় সুন্নি আন্দোলনের অস্তিত্বের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

সিরিয়াতে দ্রুত গৃহযুদ্ধ অবসানের আশা ক্ষীণ। হয়তো এক ইরাকের স্বপ্নও ক্ষণস্থায়ী। এর শিয়া, সুন্নি ও কুর্দি অঞ্চলের মধ্যেকার বিভেদ বেড়ে চলেছে দিন দিন। তাই ককবার্ন মনে করেন, আইএস সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশাও ক্ষীণ। কারণ, আইসিস শুধু নিজ দেশে গড়ে ওঠা একটি ক্ষমতালোভী দল নয়। আইসিসকে বিভিন্ন শক্তি নিজেদের সুবিধার্থে জন্ম দিয়েছে, লালন করেছে ও সুযোগে ব্যবহার করছে। ইরাকে যেমন শিয়া সরকারের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তাদের দরকার, তেমনি সিরিয়াতে বাশার সরকারকে নামাতেও তাদের দরকার। আবার আসাদ সরকারেরও আইসিসকে দরকার সিরিয়ায় সহিংসতা জিইয়ে রাখার জন্য, যাতে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো আইসিসকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও আইসিসকে দরকার মুলসিম দেশগুলোর মধ্যে সময়-সুযোগমতো ব্যবহার করতে। আইসিস যখন বিদেশি নাগরিকদের শিরশ্ছেদের নৃশংস চিত্র দেখিয়ে পৃথিবীকে ভয় দেখাচ্ছিল, তখন বিদেশি নাগরিক ও সাংবাদিকেরা ভয়ে ইরাক-সিরিয়ার পথ মাড়ানো বন্ধ করল। তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় সুবিধা হলো যে তাদের এক দশকের ভুল নীতির চর্চা ও অনাবৃতকরণ কমে গেল ও

আইসিস বিষয়ে খবর পাওয়ার সূত্র খুবই সংকীর্ণ হয়ে গেল। তাতে গণমাধ্যম এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হলো।

যেভাবে আফগানিস্তানে তালেবানদের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে পরে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল আমেরিকা। তবে আইসিস তালেবান মডেল থেকে অনেক ভিন্ন। এখন তারা অনেক বেশি শক্তিশালী, অনেক বেশি হিংস্র। তাদের ব্যাপ্তি পৃথিবীব্যাপী। যে আদর্শের বলে আইসিস গঠন করা হয়েছে, আইসিসের সদস্য সংগ্রহ চলছে, তাতে আইসিস এখন শুধু একটি সন্ত্রাসী দল নয়, আইসিস এখন একটি আদর্শে পরিণত হয়েছে। আর এই আদর্শ এখন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে।

ককবার্নের এই বইটির সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা এখানে আইসিসের আদর্শ ও উত্থানের সূচনা সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই। তাই *ইকোনমিস্ট* বইটির পর্যালোচনায় বলে যে বাগদাদির খিলাফতের ডাক হঠাৎ করে এত নৃশংসতা ও বিস্তার কীভাবে লাভ করল, তার উৎস খুঁজতে গিয়ে এর আদর্শ সম্পর্কে একেবারেই কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না বইটিতে।[২]

আইসিসের উত্থানের কারণ

আইসিসকে লেখক বলেন যুদ্ধশিশু (পৃ. ৮)। ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধ ও ২০১১ সালে সিরিয়া যুদ্ধের বদৌলতে এই সহিংস দলের জন্ম। সনাতন ধর্মীয় আদর্শ ও সামরিক দক্ষতাই এদের সম্বল। ককবার্ন উল্লেখ করেন, পশ্চিমা সরকার ও গণমাধ্যমের মতে, ইরাকি প্রধানমন্ত্রী নুর-ই-আল-মালিকির সাম্প্রদায়িক নীতি ইরাকের অন্তর্দ্বন্দ্বকে আরও চলমান করেছে। অতঃপর সিরিয়া যুদ্ধ ইরাকের পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীল করে তোলে। সিরিয়ায় ইরাকি জিহাদিরা একটি নতুন যুদ্ধক্ষেত্র পায় তাদের ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রদর্শন করার। আইসিসকে এই যুদ্ধের প্রতিটি খেলোয়াড় নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করছে। তাই এর উত্থানের কারণ বহুমুখী। বইয়ের মুখবন্ধে ককবার্ন তাঁর এক সুন্নি মেয়েবন্ধুর ই-মেইলের কথা উল্লেখ করেছেন :

The bombardment was carried out by the government. The air strikes focused on wholly civilian neighborhoods. May be they wanted to target two ISIS bases. But neither round of bombardment found its target… The bombing hurt civilians only... The government bombardment did not hit any of the ISIS men… because of this bombardment youngsters are joning ISIS in tens if not in hundreds because this increases hatred towards the government (XVII).

এখানে প্রতীয়মান হয়, সাধারণ জনগণ আইসিসকে ঘৃণা করলেও ইরাকি সরকারি বাহিনীর আগ্রাসী পদক্ষেপে কীভাবে দিনে দিনে সরকারবিরোধী আক্রোশ আইসিসের প্রতি ঘৃণার থেকেও বড় হয়ে ওঠে।

ককবার্ন উল্লেখ করেন, ৬ জুন ২০১৪ ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তর শহর মসুল দখল করা ছিল আইসিসের উল্লেখযোগ্য বিজয়। ১৩ জুন আইসিস যোদ্ধারা ৬০ হাজার সৈন্যের ইরাকি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়, যেখানে ইরাকি সামরিক ও পুলিশ বাহিনী ছিল যৌথভাবে। দুই বিপরীত বাহিনীর যোদ্ধাসংখ্যায় বিশাল পার্থক্য থাকলেও তা কেবল সংখ্যাই মাত্র। এই অবিস্মরণীয় বিজয়ের পেছনের আসল কারণ দুর্নীতি। সংখ্যা বড় হলেও বাস্তবে এর এক-চতুর্থাংশ উপস্থিত ছিল। বাকিরা তাদের বেতনের প্রায় অর্ধেক তাদের অফিসারদের দিয়ে লম্বা ছুটি কাটাত।

মসুল সব সময় নিরাপত্তাহীন ছিল। আইসিসের আগে আল-কায়েদা ইরাকে দুই মিলিয়ন সুন্নি মুসলিমের এই শহরে তৎপর ছিল। তখন তারা ব্যবসায়ীদের থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করে চলত। লেখার এই অংশে ককবার্নের সাংবাদিকতার বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করে ইরাকের দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি এক তুর্কি ব্যবসায়ীর উদাহরণ দেন, যিনি মসুলে নির্মাণকাজের চুক্তি নিয়েছিলেন। এক আইসিস নেতা তাঁর কাছে পাঁচ লাখ মার্কিন ডলার চাঁদা চেয়েছেন। তিনি বাগদাদ সরকারকে এ ব্যাপারে অবগত করেও কোনো ফল পাননি। আইসিসের আর একটি বড় সুবিধা ছিল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকায় তাদের অবস্থান। ভৌগোলিকভাবে এই অঞ্চলে তাদের অবস্থানের কারণে তারা উত্তর-পশ্চিম ইরাক ও সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলের ওপর দখল রাখতে পেরেছে। তাই এই অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মসুল ও তিকরিত দখল করে নিয়েছিল বাগদাদকে বাদ দিয়ে। সময়টা ছিল ২০১৪ জুন থেকে আগস্ট, তারা ইরাকের কুর্দিস্তানে প্রবেশ করে এবং সেপ্টেম্বরে সিরিয়ার কুর্দিশ ছিটমহল কোবানিতে প্রবেশ করে।

ইরাকে দুর্নীতি ছিল চরম। ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ পাওয়া যেত না। এমনকি বিচারক রায় দিয়ে দিলেও ঘুষ ছাড়া জেল থেকে বের হওয়া যায় না। আবার যে কেউ যেকোনো সময় গ্রেপ্তার হতে পারে, কারণ, হয়তো সেই কর্মকর্তা ১০ থেকে ৫০ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত ঘুষ দিয়ে তাঁর কাজ পেয়েছিলেন। লেখক ইরাকের দুর্নীতির বর্ণনা প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়ে দিয়েছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে অনেক বিশদভাবে খুবই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রভাবে বর্ণণা করেছেন, যা খুব বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয় না বইটির মূল বিষয়বস্তু সাপেক্ষে।

সামরিক বাহিনীতে দুর্নীতি ছিল সকল স্তরে। একজন আর্মি জেনারেল দুই মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে বিভাগীয় কমিশনার হয়ে যেতে পারেন।

ককবার্ন তাঁর এক ব্যবসায়ী বন্ধুর কথা উল্লেখ করেন, যিনি তাঁর ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন, কারণ, পণ্য আমদানি থেকে শুরু করে বিক্রয় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে এত বেশি ঘুষ দিতে হয় যে পণ্যের বিক্রয়মূল্য অনেক বেড়ে যায় এবং তাতে লোকসানের মুখ দেখতে হয় (৬৫)। তথাপিও লেখক বলেছেন অর্থনীতি দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। লেখকের মতে, The frequent demand for bribes has not in itself crippled the sate or the economy. The highly autonomous Kurdistan Regional Government is deemed extremely corrupt, but its economy is booming and its economic management is praised as a model for the country.

তবে তিনি এই প্রশংসিত অর্থনৈতিক মডেলের কেবল উল্লেখ করেছেন, কোনো ব্যাখ্যা দেননি।

শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব

ইরাকে শিয়াশাসিত সরকার কর্তৃক সুন্নিগোষ্ঠীর প্রান্তিকীকরণ ইরাকের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বৃদ্ধির মূল কারণ। দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শাসন করার জন্য মালিকিকে ক্ষমতায় বসালেও তাঁর শাসন সাদ্দামের শাসনের মতোই সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিগ্রস্ত, অকার্যকর ও পাশবিক। ককবার্ন আইএসের আদর্শগত দিকটিতে ও তাদের বর্বরোচিত শাসনের ওপর কোনো আলোকপাত করেননি, তবে তিনি আইএসের উত্থানের পেছনে প্রতিহিংসাপরায়ণ শিয়া শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র সুন্নি বিরোধিতাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

ইরাকি সামরিক বাহিনী যখন সমূলে আইসিসের বিরুদ্ধে লড়ছিল, তখন শেষ দিনে ইরাকি জনগণ ব্যারাকের ভেতরে প্রবেশ করে সৈন্যদের ওপর পাথর মারতে থাকে। ইরাকি সৈন্যকে ইরাকি সুন্নি জনগণ ইরানপুষ্ট মালিকির ছেলে মনে করে তাদের জারজ বলে গাল দেয়। মসুলে ইরাকি সামরিক বাহিনী বিদেশি শক্তি হিসেবে গণ্য হওয়ায় জনরোষের শিকার হয়। ইরাকি বাহিনী জনগণের ভয়ে তাদের অস্ত্র ও ইউনিফর্ম খুলে রেখে পালিয়ে যায় মসুল থেকে।

ককবার্ন এক সৈন্যের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, I saw women and children with military weapons; local people offered the soldiers dishdashes to replace their uniforms so that they could flee. (১৬)। মহিলা ও বাচ্চারাও অস্ত্র হাতে তাদের ধাওয়া করে। কিছু মানুষ তাদের সাহায্য করে, যাতে তারা পোশাক পরিবর্তন করে পালিয়ে যেতে পারে। তিকরিত ও বাইজিতেও একই অবস্থার সম্মুখীন হয় তারা। তিকরিতে যেসব সৈন্য আত্মসমর্পণ করে, তাদের শিয়া ও সুন্নি দুই ভাগে ভাগ করা হয়। শিয়া সৈন্যদের

ব্রাশফায়ার করে মেরে ফেলা হয় এবং এই দৃশ্য ধারণ করে অন্য সৈন্যদের ভয় দেখানো হয় (১৭)। সাম্প্রদায়িকতার বিরোধ আরও গাঢ় হয় যখন শিয়া মাজারগুলো বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয় (১০৩)।

২০১২ সালের ডিসেম্বরে সুন্নি বাণিজ্যমন্ত্রীর দেহরক্ষী রাফি-আল-ইসাওয়ায়িকে সরকার গ্রেপ্তার করে। তবে উত্তর ও মধ্য ইরাকে সুন্নি-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হয়। ইরাকে ৩৩ মিলিয়ন জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ সুন্নি। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল, সুন্নি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা। ককবার্ন উল্লেখ করেন, মালিকি সরকার কিছু পরিবর্তনের কথা বলে থাকলেও তার সম্পূর্ণটাই ছিল লোকদেখানো। তাই প্রথমে আন্দোলনকারীর সংখ্যা ১০ হাজার হলেও ধীরে ধীরে তা কমে ১ হাজারে আসে। আন্দোলনকারীর সংখ্যা বেশি দেখানোর জন্য একটি বাদে স্থানীয় সব মসজিদ শুক্রবারের নামাজের জন্য বন্ধ রাখা হতো। যাতে সব মুসল্লি এক জায়গায় জড়ো হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে এই আন্দোলন কীভাবে সহিংস আন্দোলনে পরিণত হয় বা আদৌ হয় নাকি বা এর সঙ্গে আইএসআইএসের উত্থানের সম্পর্ক নিয়ে আর কোনো ব্যাখ্যা না থাকা ককবার্নের এই বইটির একটি দুর্বলতা। কারণ, তিনি শিয়া-সুন্নি বিভেদকে আইসিসের উত্থানের পেছনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ডিসেম্বর ২০১২ সালে যে সুন্নি আন্দোলন শুরু হয়, শুরুতে তা ছিল শান্তিপূর্ণ। ২০১৩ সালের এপ্রিলে হাউইজার শান্তি ক্যাম্পে মালিকির নেতৃত্বে যে নৃশংস আক্রমণ চলে, তাতে ৫০ জন আন্দোলনকারীর মৃত্যু ঘটে এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সহিংস বিদ্রোহের রূপ নেয়। মালিকির বিরুদ্ধে যে জনরোষ ওঠে, তা আইসিসের পক্ষে সুবিধা বয়ে আনে। আঞ্চলিক আরও ৭-৮টা বিদ্রোহী দল আইসিসকে সমর্থন করে (৪৭)। যদিও লেখক মালিকিকে সম্পূর্ণরূপে দোষারোপ করেন না ইরাকে আইসিসের উত্থানের জন্য, তবে তিনি মনে করেন, এই সমস্যা বর্ধিতকরণে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। মালিকি হয়তো আইসিসের উত্থানের কিছু অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করেছেন। আর তাই আইসিস বাগদাদ থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শহর ফালুজা দখলের পর আলবার দখল করতে সক্ষম হয় (৪৮-৪৯)।

শিয়া-সুন্নি বিভেদ নিয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে লেখক আলোচনা করেছেন। বর্ণনাগুলো কখনো মাইক্রো বা কখনো ম্যাক্রো স্তরে করা। তিকরিত ও ফালুজা দখলে জঙ্গি তৎপরতার সূক্ষ্ম বিবরণ তিনি দিয়েছে, যা খুবই মাইক্রো পর্যায়ের। তিনি কোনো মতবাদের আলোকে আলোচনা করেননি, যার ফলে বইটি কখনো কখনো অসংগতিপূর্ণ মনে হয়। সাংবাদিক হিসেবে তিনি

ইরাকে অনেক কিছু দেখেছেন, যার ফলে কোনো কোনো বিষয়ের একটু বেশি গভীরে পৌঁছে গেছেন, যা কখনো কখনো তাঁর যুক্তি তুলে ধরার খাতিরে আদিখ্যেতা মনে হয়েছে।

বিভিন্ন বহিঃশক্তির অবস্থান

ককবার্ন মনে করেন আমেরিকা, ইউরোপ ও তাদের আঞ্চলিক মিত্র তুরস্ক, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত আইসিসের উত্থানের মূল কারণ। ২০১২ সাল থেকেই এটা স্পষ্ট ছিল যে আসাদ ক্ষমতা ছাড়বেন না। সিরিয়ার ১৫টা প্রাদেশিক রাজধানীর মধ্যে ১৪টাই ছিল আসাদের নিয়ন্ত্রণে। সিরিয়ায় আসাদ সরকারকে সাহায্য করে আসছে রাশিয়া, ইরান ও হিজবুল্লাহ। তারপরও জেনেভার শান্তি আলোচনায় তাঁকে মাত্র একটি শর্তই আরোপ করা হয়, তা হলো ক্ষমতা থেকে অপসারণ। আর যেহেতু আসাদ ক্ষমতা ছাড়বেন না, তাই এমতাবস্থায় আদর্শ অবস্থা হলো আইসিসের বিস্তার। আমেরিকা ও মিত্রশক্তিরা ইরাক ও সিরিয়ার সুন্নি জনগণকে আইএস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। ইরাক ও সিরিয়ায় আল-কায়েদা ধরনের দলগুলোর সহিংসতাই কেবল শঙ্কার শেষ নয়। অসহিষ্ণু ও সনাতনি ওয়াহাবি আদর্শের প্রচার যেভাবে শুরু হয়েছে, তা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ১৬ বিলিয়ন মুসলমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, যা পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। তাতে যে অমুসলমানরা এই ছড়িয়ে পড়া যুদ্ধের লেলিহান শিখা থেকে মুক্তি পাবে, তা নয়। বর্তমানে ছড়িয়ে পড়া জিহাদি আদর্শ, যা বিশ্বরাজনীতিকে প্রভাবিত করছে, তার প্রভাববলয় থেকে মুসলিম-অমুসলিম কেউই রক্ষা পাবে না।

ককবার্ন মনে করেন, ৯-১১ জঙ্গি হামলা-পরবর্তী মার্কিন নীতি আল-কায়েদার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। টুইন টাওয়ার ঘটনার সব আলামত সৌদি আরবের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করে। ওসামা বিন লাদেন সৌদি বনেদি পরিবারের সদস্য। তাঁর বাবা ছিলেন সৌদি বাদশাহর কাছের মানুষ। আল-কায়েদার অর্থ আসত আরব উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলো থেকে, বিশেষ করে সৌদি আরব থেকে। হামলাকারী ১৭ জনের ১৪ জনই ছিল সৌদি (৫৬)। মার্কিন নথিপত্রেও বারবার উঠে এসেছে যে আল-কায়েদা ও অন্য জিহাদি দলগুলোকে সৌদি আরব ও আরব রাজতন্ত্রগুলো আর্থিকভাবে মদদ দিয়ে আসছে। ১৯৯০-এর প্রথমার্ধ থেকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আফগানিস্তানে তালেবানদের ক্ষমতায় আনতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এমনকি আফগানিস্তান ও পাকিস্তানবিষয়ক মার্কিন বিশেষ প্রতিনিধি রিচার্ড হলব্রুক বলেছেন, 'আমরা হয়তো ভুল দেশে ভুল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি।'

সৌদি আরব ও অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যীয় দেশের দাবি, সিরিয়া থেকে আসাদ সরকারের অপসারণের ফলে আইএসের উত্থান। ককবার্ন এ-ও বলেন যে মার্কিন ৯-১১-পরবর্তী নীতি দ্বিধাপূর্ণ। যতক্ষণ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই ঘনিষ্ঠ মিত্র সৌদি আরব ও পাকিস্তানকে ইসলামি উগ্রবাদ প্রচারের জন্য দায়ী না করবে, ততক্ষণ জিহাদবিরোধী আন্দোলন সামান্যই সফল হবে। ককবার্ন বলেন, The movement against which they are aimed have not been defeated but rather have grown stronger (৫৯)। আমেরিকা ও ব্রিটেনের যৌথ প্রচেষ্টায় গোয়েন্দা-ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তার ও ৯-১১-পরবর্তী বিপুল অর্থের বিনিময়েও আল-কায়েদা ও তাদের সমর্থিত দলগুলোর বিস্তার কমানো সম্ভব হয়নি। বরং তারা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

২০০১-পরবর্তী 'War on terror'-এর কারণে বিশ্বরাজনীতির যে পটপরিবর্তন হয়ে আসছে তার ভয়াবহতা ২০১৪-তে মসুল দখলের আগ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেনি (৫৯)। ককবার্ন ইরাকে শিয়া-সুন্নি বিরোধ ও মালিকি সরকারের দুর্নীতিকে প্রধান কারণ হিসেবে দেখলেও *গার্ডিয়ান* পত্রিকার আলোচনায় ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনকে 'অবৈধ' বলা হয় ও এই আগ্রাসনকে আল-কায়েদা বিস্তারের মূল কারণ বলে উল্লেখ করেন। ইরাকের বঞ্চিত সুন্নিরা প্রথমে আইসিসে যোগ দেয়। পরবর্তী সময়ে আইসিস রোধ করতে এর নেতাদের মার্কিনরা কেনার চেষ্টা চালায়।

২৮ মে ২০১৪ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেন, আমেরিকার আসল শত্রু এখন আর সংঘবদ্ধ আল-কায়েদা নয়, বরং অসংঘবদ্ধ আল-কায়েদা এবং তাদের জোটবদ্ধ দলগুলো। যেহেতু সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ সীমান্ত পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই এই যুদ্ধরত জঙ্গিদের আমেরিকার ওপর আক্রমণের সম্ভাবনাও বেড়েছে। এর প্রতিকার হিসেবে ওবামা প্রশাসন আসাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সরকারবিরোধী সর্বাপেক্ষা উত্তম বিকল্পকে সমর্থন করার নীতি বেছে নিয়েছে। তাই ওবামা আসাদবিরোধীদের আধুনিক সমরশাস্ত্র ও অস্ত্রে প্রশিক্ষিত করে তুলতে ২০১৪ সালের জুনের মধ্যে কংগ্রেসের কাছে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রত্যাশা করেন। এই ঘোষণার ছয় মাসের মাথায় তাঁরই পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি স্বীকার করেন যে আসাদবিরোধী শক্তিরা আসলে আইসিস ও আল-নুসরা দ্বারা পরিচালিত। তবে আল-কায়েদা ও তাদের প্রতিনিধিদলগুলোর সঙ্গে মার্কিন সাহায্যপ্রাপ্ত বিরোধী মিত্রদের বাস্তব অর্থে কোনো পার্থক্য নেই। ককবার্ন সিরিয়ার এক প্রতিবেশী মধ্যপ্রাচ্যীয় দেশের (নাম ও পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি) এক গোয়েন্দার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যখন আসাদবিরোধী দলগুলোকে অত্যাধুনিক অস্ত্র পাঠানো হয়, তখন আইসিস খুবই খুশি থাকে। কারণ, তারা ভয় দেখিয়ে বা

অর্থের বিনিময়ে সব সময়ই তাদের থেকে সেসব অস্ত্র নিয়ে নেয় (৩)। লেখক বলেন, ২০১৪ সালের গ্রীষ্মে আইসিসের মসুল দখলের আগে, ইউরোপীয় বিমান তাদের বাগদাদযাত্রা বন্ধ করে দেয়। কারণ, তাদের ভয় ছিল সে জঙ্গিগোষ্ঠীর হাতে বিমানবিধ্বংসী মিসাইল আছে, যা আসাদবিরোধীদের দেওয়া হয়েছিল।

ককবার্ন ৯-১১-পরবর্তী মার্কিন নীতিকে অসৎ বা অযৌক্তিক বলে মনে করেন। কারণ, সিরিয়া ও ইরাকে বিদেশি জিহাদিদের ওবামা সবচেয়ে বড় হুমকি বলে মনে করেন, যাদের এই অঞ্চলে প্রবেশ করার একমাত্র পথ তুরস্ক-সিরিয়ার ৫১০ মাইল লম্বা সীমান্ত পথ। সৌদি আরব, তুরস্ক ও জর্ডান হয়তো এখন তাদের তৈরি ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের ভয়ে নিজেরাই কাতর, তবে এই দানব নির্মূলে তারা সামান্যই অবদান রাখতে পারছে (৭)। তাই ধারণা করা যেতে পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাতকে তাদের সিরিয়ায় বিমান হামলা বা যুদ্ধে লিপ্ত করার কারণ এই দেশগুলোর সিরিয়ায় জিহাদিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা।

ককবার্ন মনে করেন, সৌদি আরবের ভূমিকা আইসিসের উত্থানের পেছনে অনেকটা ভুল বা কম গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। শুধু তেল বা অর্থপ্রাচুর্যের কারণেই এই রাজতন্ত্র প্রভাবশালী নয়, বরং তারা তাদের সনাতনী বা রক্ষণশীল ইসলামি আদর্শ, যা মেয়েদের অধিকার খর্ব ও শিয়া ও সুফি মুসলমানদের অমুসলিম হিসেবে দেখে এবং মনে করে খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের সঙ্গে তাদের হত্যা করা উচিত। আইসিস ও আল-কায়েদা আদর্শগতভাবে ওয়াহাবি মতবাদের সঙ্গে অনেক সহমত পোষণ করে। তাদের সমালোচনাকারীদের দেশত্যাগ করতে হয়, নতুবা হত্যা করা হয়।

মুসলিম দেশগুলোতে সৌদি আরব ওয়াহাবি আদর্শের প্রবর্তন করার জন্য দেশে দেশে মসজিদ বানিয়ে ও ইসলাম প্রচারকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। ককবার্নের মতে, তাতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে বেড়েই চলছে। যার ফলে তিউনিসিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে অদ্ভুত এক হিংস্রতা (৬)। তথাপি জর্জ বুশ কখনোই সৌদি আরবকে ৯-১১ ঘটনা বা সন্ত্রাসবাদে মদদ দানকারী হিসেবে দেখেনি। এমনকি ৯-১১ কমিশন রিপোর্টে ২৮ পৃষ্ঠাজুড়ে হামলাকারীদের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্কে বর্ণনা আছে, যা মূল রিপোর্ট থেকে কেটে ফেলা হয়েছে এবং কখনো তা প্রকাশ করা হয়নি (৫৭)। ২০০৯ সালে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের ই-মেইল, যা উইকিলিকস প্রকাশ করে, সেখানে বলা আছে, সুন্নি জঙ্গি দলগুলোর মূল অর্থদানকারী হলো সৌদি আরব (৫৭)। তারপরও পশ্চিমা সরকারগুলো সৌদি ধর্মপ্রচারকদের শিয়াবিরোধী হিংসাত্মক ধর্ম প্রচারে বাধা দেয়নি। যুদ্ধশিশু আইসিস বা বর্তমান জঙ্গিবাদের এক অভিভাবক সৌদি আরব হলে অপরজন পাকিস্তান। তালেবান বা জিহাদিদের

মদদদানে পাকিস্তানের সম্পৃক্ততার প্রমাণ বারবার এলেও পশ্চিমা সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা নিতে বিরত থেকেছে।

সিরিয়া ও ইরাকে যে সশস্ত্র সরকারবিরোধী আন্দোলন চলছে, তা সালাফি জিহাদি ও প্রথাগত ধর্মীয় অনুশাসনের পবিত্র যুদ্ধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পশ্চিমা সরকারগুলো সিরিয়া, ইরাক বা বিশ্বজুড়ে শিয়া হত্যা নিয়ে চিন্তিত না-ও হতে পারে, তবে আল-কায়েদার আদর্শে উদ্বুদ্ধ সুন্নি আন্দোলন, যা ৯-১১-পূর্ববর্তী আল-কায়েদার সীমানা ছাড়িয়ে অনেক বড় পরিসরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, তা নিয়ে ঘোর দুশ্চিন্তায় আছে।

সিরিয়া যুদ্ধে সৌদি সম্পৃক্ততা শুধু আসাদ সরকারকে সরাতে অর্থ ও অস্ত্রাদি দিয়ে সাহায্য করার মধ্যেই সীমিত নয়। তারা আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে শুরু থেকে সশস্ত্র বিরোধের কথা বলে আসছে, তা কোনো সরকার কর্তৃক হোক কিংবা দল কর্তৃক। ওয়াহাবি আদর্শ, সৌদি শিক্ষা ও বিচারব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়। তাদের আদর্শ ও আল-কায়েদার আদর্শ সম্পূর্ণ অভিন্ন না হলেও খুব বেশি অমিল নেই (৭৭)। ওয়াহাবি আদর্শ সম্পূর্ণরূপে অন্যান্য ইসলামি আদর্শ বা চেতনাসহ যেকোনো ধর্মকে অস্বীকার করে। এই ওয়াহাবি প্রচারণা শিয়া-সুন্নি বিভেদকে অনেক গাঢ় করে তুলেছে। Directorate General for External Policies of the European Parliament ২০১৩ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেখানে বলা হয়, সালাফি বা ওয়াহাবি আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিদ্রোহী দলগুলোকে অস্ত্র প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে সৌদি আরব সেই ১৯৮০ সাল থেকেই এই দলগুলোকে অর্থ দান করে যাচ্ছে। তারা ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৬ বিলিয়ন পাউন্ড সমপরিমাণ অর্থ খরচ করেছে ওয়াহাবি অ্যাজেন্ডা প্রচার করতে। যার ফলে জিহাদি যোদ্ধা তৈরি হয়েছে।

১৯৮০ সালে এক জোট গঠিত হয় সৌদি আরব, পাকিস্তান ও আমেরিকার, যা এখনো অবধি অক্ষত রয়েছে। এই জোটের মধ্য দিয়েই মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার আধিপত্য বিস্তার হয়, যার মধ্যে পরবর্তী আল-কায়েদার বীজ নিহিত থাকে। পঞ্চম অধ্যায়ে ২০১৪ সালের মার্চ মাসে ইরাকি প্রধানমন্ত্রী মালিকির *ফ্রান্স ২৪*-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেন ককবার্ন। মালিকি স্পষ্টভাবে সৌদি আরব ও কাতারকে দোষারোপ করেন ইরাকে সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও নিরাপত্তাহীনতা বিস্তারের জন্য। তিনি আরও বলেন, রিয়াদ ও দোহা সরাসরি এই জঙ্গিদের মদদ দিচ্ছে, এমনকি তাদের জন্য যুদ্ধাস্ত্রও কিনছে। তিনি বইয়ের অনেক অংশে সৌদি আরব ও পাকিস্তানকে জঙ্গিবাদ উত্থানে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে মদদ দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। তবে এই অভিযোগের পক্ষে কোনো তথ্যসূত্র ব্যবহার করেননি।

ককবার্ন মনে করেন, 'War on terror' সফল হয়নি, কারণ মার্কিনদের জঙ্গি নির্মূল পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তিমূলক ছিল না, তারা এই সমস্যার দুই মূল ইন্ধনদাতা সৌদি আরব ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। আমেরিকা তাদের এই পুরোনো ও গুরুত্বপূর্ণ মিত্রদের কোনোভাবেই খেপাতে চায়নি। সৌদি আরব আমেরিকার একটি বড় অস্ত্রবাজার। এ ছাড়া সৌদি বাদশাহরা তাদের অর্থ দিয়ে আমেরিকান রাজনীতিকদের ক্রয় করে রেখেছেন। ১৮০ মিলিয়ন জনসংখ্যা পারমাণবিক ক্ষমতাধর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর পেন্টাগনের সঙ্গে ভালো সখ্য আছে (৫৮)।

তবে বর্তমানে জঙ্গিবাদে মদদদানকারী এই রাষ্ট্রগুলোর কার্যকলাপে কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। [তুরস্কের সহায়তায় সিরিয়া সীমানার কোবানি থেকে আইএস অপসারণের মধ্য দিয়ে।] সৌদি আরবও তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। সপ্তম অধ্যায়ে ককবার্ন উল্লেখ করেছেন যে সৌদিদের এভাবে প্রকাশ্যে সিরিয়ায় জিহাদিদের সহায়তা করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। তার কারণ, তারা ১৯৮০ সালে আফগানিস্তান থেকে পাওয়া শিক্ষা থেকে ভীত, যেভাবে যুদ্ধপরবর্তী তালেবান, আল-কায়েদা ও জিহাদিদের জন্ম হয়। মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান জেমস ক্লেপার বলেন, সিরিয়াতে বিদেশি যোদ্ধাদের মধ্যে সাত হাজার মানুষ আরব দেশগুলো থেকে এসেছে। সৌদিরা জঙ্গিবাদে সহায়তা করলেও, তারা তাদের ভূখণ্ডে জিহাদিদের উত্থানকে ভীত চোখে দেখে। তাদেরও ভয় আছে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে জিহাদিরা যখন নিজ দেশে ফিরে আসবে, তখন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধাস্ত্র, অর্থ, মেধা ও শ্রম ব্যবহার করবে। তাই বাদশাহ আবদুল্লাহ সৌদিদের বিদেশি ভূখণ্ডে যুদ্ধ করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেন ও গোয়েন্দাপ্রধান বাদশাহ বন্দরকে তাঁর পদ থেকে অব্যাহতি দেয়। সেন্টার ফর একাডেমিক শিয়া স্টাডিজের ইউসুফ আল খোই মনে করেন, এই ফতোয়া যথেষ্ট নয়। সৌদি শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে সুফি, শিয়া, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের পিশাচ বলে শেখানো হয়, তার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। আরব দেশের মধ্যেও সিরিয়া নীতি নিয়ে বিরোধ শুরু হতে থাকে। সৌদি আরব, বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার থেকে তাদের দূত সরিয়ে নেয়, কারণ, কাতার মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুডকে সমর্থন করে ও সিরিয়ায় জিহাদি দলগুলোকে আর্থিক সাহায্য দেয় (১০৬)। ককবার্ন উল্লেখ করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সিরিয়ায় জিহাদিদের অর্থায়ন বন্ধ করার জন্য। আবার সৌদি গোয়েন্দাপ্রধান বাদশাহ বন্দর-বিন সুলতান, যিনি ওয়াশিংটনে সৌদি দূত ছিলেন ও আসাদ সরকারবিরোধী প্রচারণার মূল হোতা, সিরিয়াতে সেনা অভ্যুত্থান না করার জন্য প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে তিরস্কার

করেন। নাইফ আল আজমি, যিনি একাধারে দুটি মন্ত্রণালয়—বিচার ও ইসলামি সম্পর্কের মন্ত্রী, মার্কিন চাপের মুখে পদত্যাগ করেন। কারণ, আজমি সিরিয়ায় জিহাদি অর্থায়নে বহুল পরিচিত নাম। এমনকি আল-নুসরা ফ্রন্টের অর্থায়ন পোস্টারে তাঁর ছবিও দেখা গিয়েছিল।

সম্ভবত সৌদি আরবের এই বিস্তৃত জঙ্গিবাদের প্রভাব বুঝতে অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। ককবার্ন এক জিহাদি টুইটারের কথা উল্লেখ করেন (লেখক নাম উল্লেখ করেননি), যেখানে একটি ছবিতে লেখা আছে, 'আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আরব অঞ্চলে প্রবেশ করব। যেভাবে আমরা আজ লেভান্তে, কাল আমরা আল-কুরায়াত ও আরার-এ (সৌদি আরবে দুই শহর) প্রবেশ করব' (১০৭)।

পশ্চিমা গণমাধ্যমের ভূমিকা

ইরাক ও সিরিয়ায় জিহাদিরা যে ভেতরে ভেতরে এত শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, তা গণমাধ্যম ও রাজনীতিকেরা উপেক্ষা করে চলছিলেন। তবে একটি বড় কারণ হলো পশ্চিমা নীতিনির্ধারকেরা কেবল আল-কায়েদা ও 'কোর' বড় জিহাদি শক্তি বলে মনে করত। তাদের সবার দৃষ্টি সব সময়ই ছিল আল-কায়েদার ওপর । আর এভাবে তারাও গর্বসহকারে তাদের War on terror-এর সাফল্য নিয়ে খুশি ছিল। পশ্চিমাদের ধারণা ছিল, আল-কায়েদার সমর্থন ও জোট ছাড়া কোনো জিহাদি শক্তি বড় কোনো হুমকি হতে পারবে না। তাই আল-কায়েদা নেতা আয়মান আল-জাওয়াহিরি আইএসআইএসের নৃশংসতাকে সমালোচনা করাতে তারা মনে করে, আইসিসের আল-কায়েদার সমর্থন নেই।

আসাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে আমেরিকানরা সৌদি আরবের সঙ্গে একটি 'দক্ষিণাঞ্চলীয় ফ্রন্ট' তৈরি করে, যার অবস্থান হবে জর্ডানে। এই ফ্রন্ট দামাসকাসে আসাদের বিরুদ্ধে উত্তর ও পূর্বে আল-কায়েদা ধরনের দলগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করবে। 'ইয়ারমুক ব্রিগেড', যারা সৌদি আরব থেকে বিমানবিধ্বংসী মিসাইল পায়, এই ফ্রন্টের নেতৃত্ব দেয়। বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা যায় যে আল-নুসরা, আল-কায়েদার সহযোগী দল, এই ব্রিগেডের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। এই দুই দল তাদের যুদ্ধাস্ত্র ভাগাভাগি করে, অর্থাৎ ওয়াশিংটন আসলে তাদের শত্রুদেরই যুদ্ধাস্ত্র প্রদান করছে। ইরাকি সরকারও নিশ্চিত করেছে যে তারা আইসিস থেকে যে যুদ্ধাস্ত্র জব্দ করেছে, সেগুলো বিদেশি শক্তি হতে প্রেরিত, যা সিরিয়ায় আল-কায়েদাবিরোধী শক্তির কাছে পাঠানো হয়েছিল। তবে এই সংবাদগুলো পশ্চিমা গণমাধ্যমে খুব বেশি দেখা যায় না। পশ্চিমাদের যেকোনো শত্রুকে আল-কায়েদা নামকরণ করে সব বিরোধী শক্তিগুলোকে এক কাতারে ফেলে একই পদ্ধতিতে তা মোকাবিলা করার প্রবণতা আছে, যা সব গণমাধ্যম যেন কায়মনোবাক্যে মেনে

নিয়েছে। সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য যখন ইরাকে হামলা চালানো হয়, তখনো বলা হয়, সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে ৯-১১ পরিকল্পনাকারীদের সম্পর্কের কথা। যদিও বাস্তবে এই বক্তব্যের কোনো সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। সাদ্দাম হোসেনকে নিজ দেশের মানুষের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের জন্য ফাঁসি দেওয়া হলেও, ইরাক আক্রমণ যে ভুল সিদ্ধান্ত ছিল ও এই ভুলের জন্য যে হাজার হাজার মানুষ মারা গেল, বাস্তুহারা হলো, তার জন্য কাউকে দোষী করা হলো না, কেউ শাস্তি পেল না। কেবল সুবিধামতো অনেক বছর পর যখন আর কোনোভাবেই শাক দিয়ে মাছ ঢাকা সম্ভব হচ্ছিল না, তখন কেবল স্বীকার করে নিল, ইরাক আক্রমণ ভুল সিদ্ধান্ত ছিল! এই পুরো বিষয়ে পশ্চিমা গণমাধ্যম, যা মধ্যপ্রাচ্য সংবাদের মূল ও অনেকটা একমাত্র সূত্র কিছুই বলল না। এমনকি ককবার্নের মতো বিচক্ষণ সাংবাদিক, যিনি তাঁর লেখায় বারবার উল্লেখ করেছেন মার্কিন ভুল নীতির কথা, তিনি একবারও এই ভুলের কৈফিয়ত চাননি বা কাউকে দায়ী করেননি। পশ্চিমারা নিজেদের ভুল লুকোতে আল-কায়েদাকে শক্তিশালী শত্রু হিসেবে বারবার তুলে ধরেছে এবং ককবার্নসহ বেশির ভাগ সাংবাদিক সেই প্রচারণারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

ককবার্ন তাঁর লেখায় অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখা ও পর্যবেক্ষণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে তিনি এই যুদ্ধ ও আইসিসের পেছনে অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন। অনেক পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, তিনি আইসিসের উত্থান ও বিস্তার সম্পর্কে সবার আগেই তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর বিশ্লেষণ প্রায় সব সময়ই নির্ভুল হয়। তিনি তাঁর লেখায় অনেক জায়গায় পশ্চিমা শক্তির নীতিকে দায়ী করেছেন আইসিসের উত্থানের পেছনে, যা তাঁর লেখাকে অনেকটা পক্ষপাতিত্বহীন করে তুলেছে। তবে কিছু কিছু বিষয়ে তিনি খুবই সাবধানতার সঙ্গে এড়িয়ে গিয়েছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্মমভাবে উপেক্ষা করেছেন। ককবার্ন তাঁর বইতে আইসিসের উত্থান নিয়ে অনেক ক্ষুদ্র বিষয়ের বিস্তর বিবরণ দিয়েছেন, যা হয়তো আসল কারণ থেকে পাঠকের দৃষ্টি সরিয়ে আনার প্রয়াস। তিনি আইসিসের বিবরণে ইরাকের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন অথচ তিনি আবু ঘারিবের কথা উল্লেখ করেননি।

আইসিস তাদের অস্তিত্ব ও নৃশংসতার জানান দিতে এক ভিডিও বার্তা ছাড়ে, যাতে দেখা যায়, তারা ২১ জন মিসরীয় খ্রিষ্টানের শিরশ্ছেদ করা হচ্ছে। প্রত্যেকে কমলা রঙের জাম্পস্যুট পরিহিত, পেছনে কয়েদিদের মতো হাত বাঁধা। এমনই কমলা রঙের জাম্পস্যুট পরিহিত, হাত বাঁধা কয়েদিদের ওপর আমেরিকানদের নির্মম অত্যাচারের ছবি দেখা গিয়েছে ২০০৪ সালে। এই আবু ঘারিবের অত্যাচারিত বন্দীদের কথা ভুলে গেলে বা উপেক্ষা করলে আইসিসের উদ্দেশ্য ও

নৃশংসতা সম্পর্কে বোঝা যাবে না। আইসিসের জিহাদি বা জঙ্গি বা যোদ্ধা তাদের যা-ই বলা হোক না কেন, তারা প্রতিশোধ নিতে ব্রত। আইসিসের অনেকেই আবু ঘারিব বা ক্যাম্প বুকা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। বরং বলা যায়, ক্যাম্প বুকায় আমেরিকার চোখের সামনে মানুষ আইসিসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। একই জায়গায় চরমপন্থী ও সাধারণ বন্দীদের রাখা হয়েছিল। এই ক্যাম্পেই বাগদাদি ছিল, যিনি ছাড়া পাওয়ার পর তাঁর ক্যাম্পের সহযোগীদের তাঁর দলে ভেড়ান।[৩] আইসিসের উত্থান নিয়ে তিনি কেবল ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধ উল্লেখ করেছেন। তুরস্ক, জর্ডান ও মার্কিন নীতি বা সাহায্য দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা মুসলিম নিপীড়ন আইএসের উত্থানকে কীভাবে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে, তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি।

ইরাকের দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িকতার কথা বলেছেন অথচ মালিকি ক্ষমতায় আসার পরও ২০১১ সাল পর্যন্ত মার্কিন বাহিনী ইরাকে অবস্থান করেছে এবং নতুন সরকারের শাসনব্যবস্থায় সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপ করেছে, তারপরও এত দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও আইসিসের উত্থান, তার দায়ভার কেবল ইরাকের ওপরই। আইসিসকে সাহায্যের পেছনে সৌদি আরবের অবদানের কথা একভাবে বলা হলেও, তাদের বিরুদ্ধে কেন আমেরিকা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, সেই ব্যাপারে বইটিতে মার্কিন নীতির আলোচনা নেই।

আইএসআইএসের উত্থান সম্পর্কে তাঁর বিশদ বিবরণ প্রশংসনীয়। কীভাবে আইএসআইএস একের পর এক অঞ্চল দখল করে সিরিয়া পর্যন্ত গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তর এলাকা দখল করে নিয়েছে, তা ককবার্নের অনুসন্ধানমূলক এই বই পড়লে স্পষ্ট হবে। তবে এখানে তিনি একটি বড় অংশ একেবারেই বাদ দিয়ে গিয়েছেন। তা হলো আইসিসের আদর্শ। তবে আইসিসের উত্থান সম্পর্কে তাঁর বর্ণনায় কিছুটা মনে হতে পারে যে এটি একটি Home grown বা স্বদেশীয় ব্যাপার, যা আমেরিকার ভুল নীতির ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থানের সুযোগে সৃষ্টি ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোর মদদে বিস্তৃতি লাভ করেছে। আইসিস কেবল একটি দল নয়, আইসিস একটি আদর্শ। আফগানিস্তানের তালেবানদের থেকেও এর ভয়াবহতা বেশি। বিভিন্ন দেশ তাদের নিজেদের স্বার্থে, অভ্যন্তরীণ, আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক কারণে তাদের ব্যবহার করছে। তাদের একটি আন্তর্জাতিক জঙ্গি দল হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা থেকে থাকলেও, তারা কেবল এই পরিচয়ে সন্তুষ্ট নয়। কারণ, তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে তাদের দলে মানুষকে ভেড়াতে হবে, যা তারা তাদের মতাদর্শের প্রচারের মাধ্যমে করে। তাতে বিশ্বজুড়ে তাদের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ছে, যা শক্ত হাতে বন্ধ করার প্রয়োজন আরও অনেক আগেই ছিল। বইটিতে ককবার্ন সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্ককে দায়ী করেছেন জঙ্গিবাদে মদদ দেওয়ার জন্য এবং সে ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ক্ষমতা দখলের কারণ উল্লেখ করেছেন। তবে আমেরিকা

কেন তার এই মিত্র রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না, সেই সত্যের ওপর আলোকপাত নেই। বইটি যেখানে আইএসের উত্থান ও সুন্নি আন্দোলনের কথা বলেছেন, সেখানে ইরাক ও সিরিয়ার বাইরে এই দল বা আদর্শের কোনো উল্লেখ না থাকা আইসিসের ক্ষমতার সরলীকরণ।

তথ্যসূত্র :

২. https://www.versobooks.com/books/1830-the-rise-of-islamic-state

২. ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ *দ্য ইকোনমিস্ট* প্রতিবেদন, Rolling into town: How the rise of Islamic State is changing history of the middle East নামে http://www.economist.com/news/books-and-arts/21644117-how-rise-islamic-state-changing-history-middle-east-rolling-town

৩. https://www.theguardian.com/world/2014/dec/11/-sp-isis-the-inside-story

লে খ ক প রি চি তি

হায়দার আলী খান

যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এবং আঙ্কটাডের সাবেক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা ২০ এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা শতাধিক। হায়দার আলী খান বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক। তাঁর প্রকাশিত রাজনৈতিক-অর্থনীতি বিষয়ক বইয়ের মধ্যে রয়েছে *চায়না'স মার্কেট সোশ্যালিজম অ্যান্ড ন্যাশনাল ইনোভেশন সিস্টেম অ্যাট দ্য ক্রস-রোডস* (২০১০), *রিডিউসিং পোভার্টি: প্যাটার্নস অব পটেনশিয়াল হিউম্যান প্রোগ্রেস* (২০০৮), *পোভার্টি স্ট্র্যাটেজিস ইন এশিয়া: গ্রোথ প্লাস* (২০০৬), *গ্লোবাল মার্কেটস অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস* (২০০৪)।

জেসন হিকেল

লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক। ২০১১ সালে ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়া থেকে নৃতত্ত্বে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৪ সাল থেকে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে গবেষণা করছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় বিশ্বায়ন, ফিন্যান্স, গণতন্ত্র, সংঘাত, ধর্মীয় আচার ইত্যাদি। প্রকাশিত গ্রন্থ *ডেমোক্রেসি অ্যাস ডেথ: দ্য মোর‍্যাল অর্ডার অব অ্যান্টি-লিবারাল পলিটিকস ইন সাউথ আফ্রিকা* (ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ২০১৫)।

বদরুল আলম খান

বদরুল আলম খান দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকতার পর বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনিতে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাংলাদেশ সমাজ, শ্রেণি, ধর্ম ও বিশ্বায়ন। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে *পুঁজিবাদের সমাজতত্ত্ব* (সম্পাদনা), *সমাজতত্ত্ব: সংকট ও সম্ভাবনার দেড়শ বছর, দর্শনের সংকট এবং তৃতীয় বিশ্ব, ধর্ম ও সমাজ বিপ্লব* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *সংঘাতময় বাংলাদেশ: অতীত থেকে বর্তমান* নামক একটি গ্রন্থ ২০১৫ সালে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

আলী রীয়াজ

লেখক ও গবেষক। ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির পলিটিকস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক। ক্লেফিন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লিংকন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিকস ইন সাউথ এশিয়া*

(রুটলেজ, ২০১০); *ফেইথফুল এডুকেশন: মাদ্রাসা ইন সাউথ এশিয়া* (রাটগার্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮); *ইসলামিস্ট মিলিট্যান্সি ইন বাংলাদেশ: আ কমপ্লেক্স ওয়েব* (রুটলেজ, ২০০৮); *ইসলাম অ্যান্ড আইডেন্টিটি পলিটিকস অ্যামাং ব্রিটিশ বাংলাদেশিজ: আ লিপ অব ফেইথ* (ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৩), *হাউ ডিড উই অ্যারাইভ হিয়ার* (প্রথমা, ২০১৫) *বাংলাদেশ: আ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি সিনস ইন্ডিপেন্ডেন্স* (আই. বি. টরিস, ২০১৬)।

মতিউর রহমান

সাংবাদিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর। সম্পাদক ছিলেন সাপ্তাহিক *একতা* ও *ভোরের কাগজ*-এর। বর্তমানে *প্রথম আলোর* সম্পাদক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: *কার রাজনীতি কীসের রাজনীতি* (২০০৪), *ইতিহাসের সত্য সন্ধানে: বিশিষ্টজনদের মুখোমুখি* (২০০৪), *শহীদ নূর হোসেন* (২০১৩), *মুক্ত গণতন্ত্র রুদ্ধ রাজনীতি* (২০১৪), *খাপড়া ওয়ার্ড হত্যাকাণ্ড ১৯৫০* (২০১৫), *আকাশভরা সূর্যতারা: কবিতা-গান-শিল্পের ঝরনাধারায়* (২০১৪) ইত্যাদি। ফিলিপাইনের ম্যানিলা থেকে 'সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সৃজনশীল যোগাযোগ'-এ ২০০৫ সালে পেয়েছেন র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার।

জাকির হোসেন রাজু

চলচ্চিত্র গবেষক ও শিক্ষক। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)-এর মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের অধ্যাপক। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ-এর পরিচালক। বর্তমানে বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরামের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার লা ট্রব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলচ্চিত্র অধ্যয়নে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স ও বাংলাদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরিবোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকাশিত বই: *বাংলাদেশ সিনেমা অ্যান্ড ন্যাশনাল আইডেন্টিটি: ইন সার্চ অব দ্য মডার্ন?* (রুটলেজ, লন্ডন: ২০১৫)।

আইরিন খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন। তিনি ডাড বৃত্তি নিয়ে জার্মানি থেকে উন্নয়ন ও শাসন বিষয়ে স্নাতকোত্তর করেছেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ ও বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটে গবেষণার কাজ করেছেন। বর্তমানে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকাজের সাথে যুক্ত আছেন। তাঁর আগ্রহের বিষয় নিরাপত্তা, ইসলামি চরমপন্থা, রাজনৈতিক ইসলাম, ভূরাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তার* গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন:

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন: ৮১৮০০৮১